সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলামী অর্থনীতি

ISLAMIC ECONOMICS

শতাব্দী প্রকাশনী

معاشیاتِ اسلام

مصنف

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

مرتب

خورشید احمد

ইসলামী অর্থনীতি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

সংকলন

প্রফেসর ড. খুরশিদ আহমদ

অনুবাদ

আব্বাস আলী খান

আবদুস শহীদ নাসিম

আবদুল মান্নান তালিব

সম্পাদনায়

অধ্যাপক শরীফ হুসাইন

শতাব্দী প্রকাশনী

ইসলামী অর্থনীতি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ
আব্বাস আলী খান
আবদুস শহীদ নাসিম
আবদুল মান্নান তালিব

ISBN : 984-645-031-4
শ. প্র : ৪০

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন- ৮৩১১২৯২

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৯৪
চতুর্থ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

মূল্য : ১৯০.০০ টাকা মাত্র

ISLAMI ORTHONITI (Islamic Economics) By Sayyed Abul A'la Maudoodi, Compiled by Prof. Dr. Khurshid Ahmad, Translated by Abbas Ali Khan, Abdus Shaheed Naseem & Abdul Mannan Talib, Published by Shotabdi Prokashoni, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone 8311292. First Edition : October 1994, 4th Print February 2009.

Price Tk. 190.00 Only.

যে কয়টি প্রধান প্রধান উপাদান আধুনিক বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার অন্যতম হলো অর্থ। কারো কারো মতে তো অর্থই নিয়ন্ত্রক শক্তি। তাই অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞরা প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং করছেন। গড়ে তুলেছেন বহু অর্থনৈতিক মতবাদ। একটার পর একটা মতবাদ চালু করা হচ্ছে মানব সমাজে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ব্যর্থতার ফলে কার্যকর করা হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাও তার অবাস্তব নীতির ফলে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়ে নিজ ঘরেই আত্মহত্যা করে। এখন চলছে পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতির ছড়াছড়ি। আমাদের চোখের সামনে আছে ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক মতবাদ। এভাবে একটার পর একটা মতবাদ আসছে আর পরীক্ষা চলছে। কোনোটিই মানুষের দুর্ভোগ কমাতে পারেনি, দিতে পারেনি মুক্তি।

আসলে মানব মস্তিষ্ক প্রসূত কোনো মতবাদই মানুষকে মুক্তি দিতে পারেনা। মানুষের সার্বিক মুক্তি, কল্যাণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে একমাত্র খোদায়ী বিধান, তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। আর এ জীবন ব্যবস্থার নাম হলো ইসলাম। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। রাজনীতি, অর্থনীতিসহ মানব জীবনের সকল বিভাগকে পরিচালিত করবার সঠিক নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। তাই ইসলামী অর্থনীতিই অর্থনৈতিক মুক্তিও উন্নয়নের একমাত্র চাবিকাঠি।

আধুনিক বিশ্বের সেরা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) মানব জীবনের প্রায় সকল বিভাগের ওপর ইসলামের নির্দেশনা উপস্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থটি ইসলামী অর্থনীতির ওপর তাঁর এক অনবদ্য গ্রন্থ। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডঃ খুরশীদ আহমদ গ্রন্থকারের ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক রচনাবলী থেকে চয়ন করে সুনির্বাচিত লেখার এ সংকলনটি তৈরী করেছেন। এর প্রথম অংশে ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি

উপস্থাপন করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশে চিত্রিত হয়েছে ইসলামী অর্থব্যবস্থার রূপরেখা। গ্রন্থটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের দারুণ কাজে লাগবে এবং অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের পাথেয় হবে বলে আশা করি।

গ্রন্থটি ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় প্রকাশিত হলো। এ সহযোগিতার জন্য ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে মুবারকবাদ জানাই। মহান আল্লাহ এ গ্রন্থটি দ্বারা আমাদের জাতিকে উপকৃত করুন। আমীন।

ঢাকা — **আবদুস শহীদ নাসিম**
১.৯.১৯৯৪ — **পরিচালক**
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

কে কতটুকু অনুবাদ করেছেন

আবদুস শহীদ নাসিম

১৭....৯৪ পৃষ্ঠা

১২৫....১৭৩ পৃষ্ঠা

২২৯....২৫১ পৃষ্ঠা

২৭৫....২৮৪ পৃষ্ঠা

২৯৯....৩১৪ পৃষ্ঠা

আবদুল মান্নান তালিব

৯৫....১২৪ পৃষ্ঠা

১৭৪....২২৮ পৃষ্ঠা

২৫২....২৭৪ পৃষ্ঠা

৩১৫....৩২৮ পৃষ্ঠা

আব্বাস আলী খান

২৮৫....২৯৮ পৃষ্ঠা

গ্রন্থকারের কথা

এ গ্রন্থটি আমার সেসব রচনা, প্রবন্ধ ও নিবন্ধের সংকলন যেগুলি আমি বিগত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর কালে বিভিন্ন সুযোগ ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি ও বিধিমালার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং আধুনিক মানুষের জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সম্পর্কে লিখে এসেছি। লেখাগুলো যথাসময়ে প্রকাশও হয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে এ লেখাগুলোকে একত্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছি। এ প্রয়োজন এজন্যে অনুভব করেছি যে, এর ফলে একদিকে সাধারণ পাঠকদের সামনে ইসলামী অর্থনীতির পূর্ণাংগ রূপরেখা এসে যাবে, অপরদিকে ইসলাম ও অর্থনীতি বিষয়ক ছাত্রদের জন্যেও এটি একটি পাঠ্য এবং সহায়ক গ্রন্থের কাজ দেবে। কিন্তু বহুমুখী ব্যস্ততার কারণে আজ পর্যন্ত এ কাজে হাত দেয়ার সুযোগ পাইনি। আমি প্রফেসর খুরশীদ আহমদের কাছে কৃতজ্ঞ, তিনি কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিক মনোযোগের সাথে সেই লেখাগুলোর সমন্বয়ে এমন একটি চমৎকার গ্রন্থ সংকলন করেছেন যে, আমার মনে হয় আমি নিজেও এর চেয়ে সুন্দরভাবে গ্রন্থখানি সংকলন করতে পারতামনা।

সংকলনের পর গোটা গ্রন্থটির উপর আমি নজর বুলিয়ে দিয়েছি, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনও করেছি। আমি আশা করি, খুরশীদ সাহেব যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ পরিশ্রম করেছেন, সেক্ষেত্রে গ্রন্থটি অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে।

লাহোর — **আবুল আ'লা**

১৪ যিলহজ্জ ১৩৮৮ হিঃ

৩ মার্চ ১৯৬৯ ইং

বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র বিরাজ করছে চরম অশান্তি ও অস্থিরতা। এই অস্থিরতার পেছনে যেসব শক্তির হাত রয়েছে এবং যেসব কারণে এ অশান্তির আগুন দিন দিন কেবল বেড়েই চলেছে, সেসবের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণসমূহের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। অবশ্য অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের এ ভূমিকা থাকার কারণ এ নয় যে, মানব জীবনে অর্থনৈতিক উপকরণসমূহের সিদ্ধান্তকর কোনো মর্যাদা রয়েছে; বরঞ্চ তা এ কারণে যে, মানুষ অর্থনৈতিক কারণকে সেই মর্যাদা দিয়ে বসেছে, প্রকৃতিগতভাবে যে মর্যাদা তার নেই। তাই বিকৃতির কার্যকারণ অন্বেষণ এবং তার প্রতিকারের চেষ্টা সাধনা পরিস্থিতিকে আরো খারাপ ও জটিল করে চলেছে। প্রথম দিকে মানুষের ধারণা ছিল, জীবিকার উপায় উপকরণের স্বল্পতাই মূল সমস্যা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই যাবতীয় বিকৃতি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু উৎপাদন যখন শতগুণ বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাজারগুণ বৃদ্ধি পেলো, তখনো সমস্যা ও বিকৃতি একই রকম থেকে গেলো। এরপর মানুষ উৎপাদনের অর্থনীতি (Economics of Production) থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বন্টনের অর্থনীতি (Economics of distribution) এর দিকে মনোযোগ দিলো এবং নিজেদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনা সেদিকেই নিবদ্ধ করলো। কিন্তু শত বছর যাবত সম্পদ বন্টন ও পুনর্বন্টনের (Redistribution of wealth) এর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এখনো বিশ্ব ঠিক ঐ জায়গাতেই অবস্থান করছে, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা (Scarcity) ব্যষ্টিক অর্থনীতির (Micro Economics) জন্ম দেয়। কিন্তু সর্বনাশা ব্যবসাচক্র (Trade cycle) এবং মন্দা এই ব্যবস্থার বাস্তব কার্যকারিতার প্রক্রিয়াকে ধরাশায়ী করে দিয়েছে। এর ফলে সৃষ্ট নতুন অবস্থা সামষ্টিক অর্থনীতির (Macro Economics) পথ সুগম করে দেয়। কিন্তু এ নতুন ব্যবস্থায় সম্পদের যে প্রাচুর্য (Affluence of wealth) দেখা দিয়েছে এবং তা নিজের সাথে যে সমস্যা বয়ে এনেছে, তার কারণে এ প্রাচুর্য স্বয়ং মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অর্থনীতির ছাত্ররা পুনরায় একটি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছে। এ হচ্ছে একটি দুষ্টচক্র (Vicious circle) যার মধ্যে মানুষ বৃথা ঘুরপাক খাচ্ছে এবং প্রতিটি আবর্তনে যার অবস্থা হলো এ প্রবাদ বাক্যের মত ঃ

> "রশির জট খুলে চলেছি দিবানিশি
> আগা পাছার নেইকো খোঁজ!"

আজ আমরা মানব জাতিকে তাদের ধ্যান ধারণা ও মৌলিক দৃষ্টিভংগি পুনঃপরীক্ষা নিরীক্ষা ও পুনর্বিবেচনা করার জন্যে আহবান জানাচ্ছি। চলার পথে

উদ্ভূত জটিলতার কারণে আসল ক্ষতি ও অনিষ্ট সৃষ্টি হয়নি; বরঞ্চ অনিষ্ট ও ধ্বংসের মূল কারণ নিহিত রয়েছে সেই দৃষ্টিভংগি ও লক্ষ্যের মধ্যে যাকে সামনে রেখে যাত্রা শুরু করা হয়েছে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান ও কর্মপ্রক্রিয়ার সূচনাতেই রয়েছে ভ্রান্তি। তাই সূচনাবিন্দুই পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে। মানুষ নিজের সঠিক পরিচয় ও প্রকৃত মর্যাদাকে উপেক্ষা করে তার চিন্তা দর্শনের ইমারত নির্মাণ করতে যাওয়ার কারণেই এই চরম ব্যর্থতার গ্লানি বইয়ে চলেছে।

আমাদের হাতের এই গ্রন্থটি মূলত অর্থনীতি বিজ্ঞানের (Economic science) গ্রন্থ নয়। বরঞ্চ, এতে অর্থনৈতিক দর্শনের (Economic philosophy) রাজপথ প্রদর্শিত হয়েছে। এতে সেই মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচনা করা হয়েছে, অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা সাধারণত যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা না করেই সামনে অগ্রসর হন। এসব মৌলিক বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা থাকার কারণে সামনে অগ্রসর হতে গিয়ে প্রতিটি কদমে তারা হোঁচট খাচ্ছেন, ধাক্কা খাচ্ছেন। গবেষক ও পথ প্রদর্শকদের উচিত এ দিকনির্দেশনা অনুসরণ করা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি ময়দানে এর বাস্তবায়ন করা। এতে লক্ষ্য অর্জন সহজতর হবে। অর্থনৈতিক চিন্তা দর্শনের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন, তার সূচনাবিন্দু হিসেবে এগুলোকে গ্রহণ করা উচিত। এ হিসেবে এ গ্রন্থটিকে আমরা অর্থনৈতিক দিকদর্শনের এক প্রশস্ত রাজপথ আখ্যা দিতে পারি।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একালের সর্বাধিক খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ। বিগত চল্লিশ বছরে তিনি ইসলামী সমাজ দর্শন ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে কমবেশী কথা বলেছেন। তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে আধুনিক কালের সমস্যাবলী ও জটিলতাকে সামনে রেখে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় কোনো প্রকার কমবেশী না করে হুবহু তা তুলে ধরেছেন। আসল সিদ্ধান্ত তো ভবিষ্যতই করবে, তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শ্রদ্ধেয় মাওলানার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো, তিনি ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ দার্শনিক ও বাস্তব জীবন ব্যবস্থা এবং দীন ও দুনিয়ার কল্যাণধর্মী এক বিশ্বজনীন সংস্কার আন্দোলন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, বিগত চল্লিশ বছরের অবিরাম চেষ্টা সাধনার দ্বারা তিনি স্বীয় বিরোধীদের কাছ থেকে পর্যন্ত এ স্বীকৃতি আদায় করেছেন যে, জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্যে ইসলাম তার নিজস্ব দৃষ্টিভংগির আলোকে মৌলিক পথ নির্দেশনা দান করেছে। আর মুসলমান ব্যক্তি হিসেবে এবং জাতিগতভাবে কেবল তখনই ইসলামের দাবী পূর্ণ করতে পারে, যখন সে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এসব পথনির্দেশের পূর্ণ অনুসরণ করবে।

এটা স্বাভাবিক কথা, যে মহান ব্যক্তিত্ব এই বিরাট কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, তিনি কেমন করে অর্থনৈতিক সমস্যার বিষয়ে নীরব থাকতে পারেন? তাইতো দেখি, মাওলানা তাঁর তরজমানুল কুরআন পত্রিকা প্রকাশনার প্রথম বছরই [১৯৩৩ ইং] "সুদ" ও "জন্ম নিয়ন্ত্রণের" বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেছেন। এযাবত অর্থনীতি

বিষয়ে তাঁর গবেষণা, লেখা ও কথা বলা অব্যাহত রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে এ পর্যন্ত তাঁর চারটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো হলো, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ, ভূমির মালিকানা বিধান এবং ইসলাম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ। এ ছাড়াও এ বিষয়ে মাওলানার বহু প্রবন্ধ, পুস্তিকা এবং বক্তৃতা রয়েছে, যা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই চারটি গ্রন্থের স্বতন্ত্র গুরুত্বতো অবশ্যই আছে এবং এগুলো ইনশাল্লাহ নিজ নিজ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে যাবে। কিন্তু অর্থনীতি সংক্রান্ত মাওলানার সকল লেখা সামনে রেখে একটি পূর্ণাংগ গ্রন্থ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা আমি দীর্ঘদিন থেকে অনুভব করে আসছিলাম। এমন একটি গ্রন্থ, যাতে সকল মৌলিক অর্থনৈতিক বিষয়ে একই সাথে মাওলানার দৃষ্টিভংগিও জানা যাবে এবং অর্থনীতির ছাত্ররা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকও এক নজরে দেখতে পাবে। ফুল যতো সুন্দরই হোক আর তা বাগানময় যতো হাসিই ফুটাক, সেগুলো ফুলদানীতে সাজাবার মত একটি পুষ্পগুচ্ছে কেবল তখনই পরিণত হতে পারে, যখন মালি বাগান থেকে বেছে বেছে নির্বাচিত ফুলের সমন্বয়ে একটি গুচ্ছ তৈরী করবে।

এ কাজের প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন থেকেই উপলব্ধি করছিলাম। একটি রূপরেখাও তৈরী করে রেখেছিলাম। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এতোদিন এ কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে করাচী বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার্স ক্লাশের জন্যে 'ইসলামী অর্থনীতির' একটি পত্র (Paper) সিলেবাসভুক্ত করেছে। তাছাড়া 'দানশগাহে পাঞ্জাব'ও মাস্টার্স-এ ইসলামী অর্থনীতি পড়ানো আরম্ভ করেছে। এ পদক্ষেপ নিতে দেরী হয়ে গেছে অনেক। কিন্তু এটি একটি সাহসী পদক্ষেপ। শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা দেশ বিভাগের পরপরই যদি এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, তবে হয়তো একটি শাস্ত্র হিসেবে ইসলামী অর্থনীতির উপর এতো দিনে অনেক মূল্যবান গ্রন্থাবলী রচিত হয়ে যেতো। যা হোক, এ পদক্ষেপকে আমরা আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। এ পদক্ষেপই আমাকে ত্বরিত এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর শ্রদ্ধেয় মাওলানার সকল গুরুত্বপূর্ণ রচনা একত্র সংকলন করে এ গ্রন্থ তৈরী করেছি, যাতে এক নজরে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণাংগ রূপরেখা পাওয়া সম্ভব হয়।

গ্রন্থটিকে দুই অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে স্থান পেয়েছে ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন সংক্রান্ত রচনাবলী। এসব রচনায় বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া এতে অর্থনীতি বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভংগিও তুলে ধরা হয়েছে পূর্ণাংগরূপে। বিস্তারিত বিশ্লেষণের সাথে সাথে পেশ করা হয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ প্রদর্শিত অপরিহার্য নীতিমালা। এ খণ্ডটি আমাদের ভবিষ্যত কর্মীদের জন্যে মাইল ফলকের কাজ করবে। এখন প্রয়োজন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের এগিয়ে আসা; প্রয়োজন এসব আদর্শ ও নীতিমালার আলোকে অর্থনীতির ভাষায় গবেষণা ও আলোচনা করা। এ

রচনাগুলোর মর্যাদা আলোর মিনারের মতো। কিন্তু এ আলো স্বয়ং পথিক নয়; পথিকদের পথ-প্রদর্শক মাত্র। এ নির্দেশনার আলোকে অর্থনীতির ছাত্রদের সেই পথের সন্ধান করে নিতে হবে যার দিকে তা নির্দেশনা দান করছে। এটি একটি প্রদীপ। এ থেকে হাজারো নতুন প্রদীপ জ্বালাতে হবে। সুগম করতে হবে অন্যদের জন্যে চলার ও অনুসরণ করার পথ। শ্রদ্ধেয় মাওলানা পথ চিহ্নিত করেছেন। এখন মুসলিম অর্থনীতিবিদদের দায়িত্ব সম্মুখে অগ্রসর হওয়া এবং যুগোপযোগী পথ তৈরী করা।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় খন্ডে স্থান পেয়েছে শ্রদ্ধেয় মাওলানার সেইসব রচনা, একদিকে যেগুলোর সম্পর্ক অর্থনৈতিক দর্শনের প্রয়োগের (Application) সাথে। এখানে এ প্রসংগে ইসলামী অর্থব্যবস্থার কেবল কয়েকটি দিক সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে এতে কয়েকটি আলোচনা এমনও আছে, যেগুলো আমাদের সামনে অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চিন্তা ও গবেষণার পথ উন্মুক্ত করতে সহায়ক হবে। এ প্রবন্ধগুলো একদিকে কয়েকটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিষ্কার নির্দেশনা দান করছে; যেমন, ভূমির মালিকানা, সুদ, যাকাত এবং সামাজিক সুবিচার। অপরদিকে এ প্রবন্ধগুলো অর্থনীতির ছাত্রদের অংগুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ইসলামের মৌলিক ধ্যান ধারণা এবং এর মৌলিক অর্থনৈতিক নীতিমালার আলোকে বিশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসা ও সমস্যার অধ্যয়ন কিভাবে করতে হয়। এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তথাকথিত প্রগতিশীল ভাঁড় ও অপরের অন্ধ অনুসারীদের মোকাবিলায় প্রকৃত সৃষ্টিধর্মী ও ইজতিহাদী রীতি কী? এটা চিন্তার স্বাধীনতার এক বিরাট কদাকার ধারণা যে, স্বাধীনতা ও ইজতিহাদ হলো স্বধর্মের শিক্ষাকে পরিবর্তন করা এবং পাশ্চাত্যের প্রতিটি ধ্যান ধারণার অন্ধ অনুকরণ করার নাম। এটা 'চিন্তার স্বাধীনতা' নয়, 'মানসিক দাসত্ব'। চিন্তার প্রকৃত স্বাধীনতা হলো, আমরা নিরপেক্ষ মন এবং সমালোচনার দৃষ্টি নিয়ে সকল আধুনিক মতবাদ অধ্যয়ন করবো এবং "যা সঠিক তা গ্রহণ কর, যা ভ্রান্ত তা পরিত্যাগ কর"—এই নীতির অনুসরণ করবো। আমরা আমাদের মন মানসিকতার দুয়ার এমনভাবে বন্ধ করে দেবোনা যে, কোনো কল্যাণকর জ্ঞান থেকে উপকৃত হবোনা। আবার নিজেদের মন মানসিকতার উপর অন্যদের প্রভাবও এতোটা গ্রহণ করবোনা যে, দেখার সময় তাদের চোখে দেখবো, চিন্তার সময় তাদের মন দিয়ে চিন্তা করবো এবং বলার সময় তাদের মুখ দিয়ে বলবো।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশ মূলত এ ধরনের বিনির্মাণ ও সৃষ্টিধর্মী দৃষ্টিভংগির মুখপত্র। অর্থনীতির ছাত্ররা এ থেকে জানতে পারবে যে, বিশেষ বিশেষ ধরনের বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে কি পদ্ধতিতে চিন্তা-গবেষণা করতে হয়। এ খণ্ডটি মূলত একটি আদর্শ নমুনা। ভবিষ্যতে যারা এ ময়দানে কাজ করবেন, তাঁদের অসংখ্য নতুন নতুন বিষয়ে কাজ করতে হবে। আমার বিশ্বাস তাঁদের চলার পথে এ সংকলনটি পথপ্রদর্শকের কাজ দেবে। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় মাওলানা মওদূদী একজন অর্থনীতি

বিশেষজ্ঞ [Economist] নন। কিন্তু তাঁর স্থান এর চেয়েও অনেক উর্ধ্বে। কোনো একটি নির্দিষ্ট শাস্ত্রের মানদন্ডে তিনি বিচার্য নন। তিনি এমন একজন চিন্তাবিদ যিনি ধর্মতত্ত্ব (Theology) থেকে শুরু করে প্রায় সকল সমাজ বিজ্ঞানের (Social Sciences) ময়দানে কেবল সিদ্ধান্তকর কথাই বলেননি, বরঞ্চ সেইসাথে ইসলামী দৃষ্টিভংগির আলোকে সেগুলোর কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর (Central Core) নবনির্মাণ কাজের নীল নকশাও এঁকে দিয়েছেন। তাঁর অর্থনীতি বিষয়ক রচনাবলীর এ সংকলনটি অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই কাজই আঞ্জাম দিয়েছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ের উপর কাজ করা সেইসব মনীষীদের দায়িত্ব যাঁরা ইসলামের প্রতি অটুট বিশ্বাস রাখেন, সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভংগি পোষণ করেন এবং যারা অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রায়োগিক দক্ষতার (Technical Competence) অধিকারী। আমাদের মতে এ গ্রন্থটিতে সাধারণ পাঠকদের জন্যেও অনেক মূল্যবান উপকরণ রয়েছে; আর অর্থনীতির ছাত্র এবং আগামী দিনের ইসলামী অর্থনীতিবিদদের জন্যে রয়েছে দিকনির্দেশনা। আমার বিশ্বাস, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থটির সংকলন সংক্রান্ত একটি কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন বোধ করছি। তা হলো, এতে শ্রদ্ধেয় মাওলানার প্রবন্ধ এবং বক্তৃতা ছাড়াও তাফহীমুল কুরআন থেকে সেইসব অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেগুলোর বিষয়বস্তু অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত। একইভাবে রাসায়েল মাসায়েল-এর সেইসব প্রশ্নের জবাবও এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যেগুলোকে আমাদের আলোচনা পরম্পরার সাথে সম্বন্ধযুক্ত মনে করেছি। এছাড়া 'ভূমির মালিকানা বিধান' এবং 'সুদ' গ্রন্থ থেকে প্রাসংগিক আলোচনাসমূহ গ্রহণ করে তা সংক্ষিপ্ত আকারে সংযোজন করেছি। কিন্তু এ গ্রন্থে সেসব বিষয়ের সূচী বিন্যাস করেছি আমাদের প্রয়োজনে। মনে রাখতে হবে এ গ্রন্থে সংকলিত অংশগুলো মূল গ্রন্থসমূহের বিকল্প (Substitute) হতে পারেনা। অবশ্য এ গ্রন্থে সংকলিত হয়ে একটি সীমা পর্যন্ত সেগুলো আমাদের প্রয়োজন পূরণ করছে। বিস্তারিত জানার জন্য আমরা সম্মানিত পাঠকদের মূল গ্রন্থ পাঠ করার অনুরোধ করবো।

এ গ্রন্থের উপকরণসমূহ নেয়া হয়েছে বিভিন্ন স্থান থেকে। এগুলো লেখা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। লেখার সময় গ্রন্থকারের সামনে ছিলো বিভিন্ন ধরনের পাঠক। এই সবগুলো লেখাকে একত্রিত করা এবং সেগুলোকে প্রাসংগিকভাবে বিন্যস্ত করা বড় কঠিন কাজ। আমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি যাতে বক্তব্যের প্রাসংগিকতা ছিন্ন না হয়। তা সত্ত্বেও সম্মানিত পাঠকদের নিকট আমার নিবেদন, তাঁরা যেন গ্রন্থটি পাঠের সময় সংকলকের সেইসব সীমাবদ্ধতাকে সামনে রাখেন, এ ধরনের কাজে অপরিহার্যভাবে যেগুলোর সম্মুখীন হতে হয়। এ ধরনের সংকলনে পুনরাবৃত্তি

এড়ানো সম্ভব নয়। তবে আমি আশা করি এ গ্রন্থে যেসব বিষয়ে পুনরাবৃত্তি এসেছে তা প্রয়োজনীয় এবং সেগুলো আলোচ্য বিষয় অনুধাবনে কাজে লাগবে। গ্রন্থের প্রথম অংশে এরূপ পুনরাবৃত্তি একটু বেশী। আর সেখানে এমনটি হওয়া জরুরীও ছিলো। ইনশাল্লাহ এ পুনরাবৃত্তি উপকারেই আসবে।

পরিশেষে একটি ব্যক্তিগত কৈফিয়ত পেশ করছি। এ গ্রন্থ সংকলনের বেশীরভাগ কাজ ১৯৬৮ ইসায়ী সালের আগস্ট মাসের মধ্যেই সম্পন্ন করেছিলাম। কেবল কয়েক সপ্তাহের কাজই বাকী ছিলো। এরি মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে আমাকে ইংল্যাণ্ডে যেতে হয়। আকাশ ভ্রমণের সমস্যাবলীর মধ্যে একটি সমস্যা হলো, মানুষ তার প্রয়োজনের সব জিনিস সাথে নিতে পারেনা। আমি আশা করছিলাম, আমার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবো এবং কাজটি সম্পন্ন করতে পারবো। কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি। পাণ্ডুলিপি হাতে এসে পৌছে ডিসেম্বর মাসে। তাছাড়া এখানে আসার পর তিন চার মাস অন্য কাজের চাপে এতোটা ব্যস্ত ছিলাম যে, গ্রন্থটি সম্পন্ন করতে আরো বিলম্ব হলো।

২ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ ঈসায়ী
১৪ যুলকা'দা ১৩৮৮ হিজরী

খুরশীদ আহমদ
লিস্টার, ইংল্যাণ্ড

সবকথার গোড়ার কথা[১]

মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সুবিচার ও সততার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে ইসলাম কতিপয় মূলনীতি ও সীমা চৌহদ্দি নির্ধারণ করে দিয়েছে। সম্পদের উৎপাদন, ব্যবহার ও বিনিয়োগের গোটা ব্যবস্থা এই সীমারেখার মধ্যে আবর্তিত হতে হবে। অবশ্য উৎপাদন ও বিনিয়োগ বিপণনের পন্থা পদ্ধতি কিরূপ হবে সে ব্যাপারে ইসলামের কোনো বক্তব্য নেই। কারণ সময় ও সভ্যতার উত্থান পতনের সাথে সাথে এসব পন্থা পদ্ধতি নির্ণিত ও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। বস্তুত, মানুষের অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এগুলো নির্ধারিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ইসলামের দাবী শুধু এতটুকু যে, সকল যুগ ও পরিবেশে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী যে রূপই ধারণ করুক না কেন, তাতে ইসলামের নির্দিষ্ট নীতিমালা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং এর নির্ধারিত সীমারেখা অবশ্যি অনুবর্তন করতে হবে।

ইসলামের বিঘোষিত দৃষ্টিভংগি হলো, এ বিশ্বজগৎ এবং এর যাবতীয় সম্পদ মহান আল্লাহ গোটা মানব জাতির কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তাই পৃথিবীর বুক থেকে স্বীয় জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করার অধিকার প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান অংশীদার। কোনো মানুষকে তার জন্মগত এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারেনা। এক্ষেত্রে একজন অন্যজনের উপর অগ্রাধিকারও পেতে পারেনা। কোনো ব্যক্তি, বংশ, জাতি বা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের উপর এমন কোনো বিধিনিষেধও আরোপ করা যেতে পারেনা যার ফলে তারা জীবিকার উপকরণের মধ্য থেকে কোনো কোনো উপকরণ ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে অথবা কোনো বিশেষ পেশা গ্রহণের দরজা তাদের জন্যে বন্ধ থাকবে। একইভাবে আইনত এমন কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করাও বৈধ হতে পারেনা যার কারণে জীবিকার উপকরণসমূহ বিশেষ কোনো শ্রেণী, বংশ, জাতি বা পরিবারের একচেটিয়া ইজারায় পরিণত হয়ে যাবে। আল্লাহর সৃষ্ট এই বিশ্বে তাঁরই দেয়া জীবিকার উপকরণসমূহের মধ্য থেকে নিজের অংশ লাভের চেষ্টা করায় প্রতিটি মানুষের অধিকার সমান। এ অধিকার লাভের সুযোগ সবার জন্যে সমভাবে উন্মুক্ত থাকতে হবে।

আল্লাহ্‌র দেয়া যেসব সম্পদ উৎপাদন করা কিংবা কার্যোপযোগী বানানোর ক্ষেত্রে কারো শ্রম বা যোগ্যতার বিনিয়োগ করতে হয়না তা সকল মানুষের জন্যে সাধারণভাবে বৈধ। নিজের প্রয়োজন অনুপাতে তা থেকে উপকৃত হবার অধিকার প্রতিটি মানুষের

---

১. ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ রেডিও পাকিস্তান [লাহোর] ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিষয়ে গ্রন্থকারের যে কথিকা প্রচার করেছিল, বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে এখানে সেটিকে 'সব কথার গোড়ার কথা' শিরোনামে সংকলন করা হলো।—সংকলক।

রয়েছে। নদী নালা ও সমুদ্রের পানি, বনের কাঠ, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় উদগত ও লালিত গাছের ফল ফসল, স্বজাত ঘাস ও চারা, বায়ু, পানি, বিজন বনের পশু, যমীনের উপর ভেসে উঠা খনিজ পদার্থ ইত্যাদি ধরনের সম্পদের উপর কারো একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। এগুলোর উপর এমন কোনো বিধিনিষেধও আরোপ করা যেতে পারেনা যার ফলে আল্লাহ্র বান্দারা কিছু ব্যয় করা ছাড়াই তা থেকে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে বাধাগ্রস্ত হবে। তবে হ্যাঁ, যারা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এসব সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার করতে চাইবে, তাদের উপর করারোপ করা যেতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের কল্যাণের জন্যে যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো অনুৎপাদনশীল ও পতিত ফেলে রাখা উচিত নয়। 'হয় নিজে সেগুলো দ্বারা লাভবান হও, অথবা অন্যরা যাতে উপকৃত হতে পারে সেজন্যে ছেড়ে দাও।' এই মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামী শরীয়ত ফয়সালা দিয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি সরকার প্রদত্ত জমি তিন বছরের বেশী পতিত ফেলে রাখতে পারবেনা। যদি সে নিজে সে জমিতে খামার বা নির্মাণ কাজ না করে, কিংবা অন্য কোনো কাজে তা ব্যবহার না করে, তবে তিন বছর অতিক্রান্ত হবার পর তা পরিত্যক্ত ভূমি বলে গণ্য হবে এবং অপর কেউ তা কাজে লাগালে তাকে সেখান থেকে উৎখাত করা যাবে না। জমি তিন বছর পতিত ফেলে রাখলে সরকার সে জমি ফেরত নিয়ে নেবার অধিকার লাভ করবে এবং অপর কাউকে তা ব্যবহার করার জন্যে প্রদান করতে পারবে।

কেউ যদি সরাসরি প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে কোনো জিনিস সংগ্রহ বা আহরণ করে এবং নিজের শ্রম ও যোগ্যতা খাটিয়ে একে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে, তবে সে-ই হবে সে জিনিসের মালিক। যেমন, যে পতিত জমির উপর এখনো কারো মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কেউ যদি তা অধিগ্রহণ করে এবং কোনো লাভজনক কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে, তবে তাকে সে জমি থেকে বেদখল করা যেতে পারেনা। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী পৃথিবীতে স্বত্বাধিকারের সূচনা হয়েছে নিম্নরূপে ঃ প্রথমে যখন পৃথিবীতে মানুষের বসবাস আরম্ভ হয়, তখন সকল জিনিস সকল মানুষের জন্যে সমানভাবে বৈধ ছিলো। অতঃপর যে ব্যক্তি যে বৈধ জিনিস নিজের মালিকানায় গ্রহণ করে কোনো না কোনো প্রক্রিয়ায় তাকে ব্যবহার উপযোগী করে নিয়েছে, সে-ই হয়েছে সে সম্পদের মালিক। অর্থাৎ সে জিনিসের ব্যবহার কেবল তার নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং অপরকে ব্যবহার করতে দেয়ার ক্ষেত্রে সে বিনিময় গ্রহণ করবার অধিকার লাভ করেছে। এ হলো মানুষের গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক ভিত্তি। এ ভিত্তি এর নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকা অপরিহার্য।

শরীয়তসম্মত বৈধ পন্থায় পৃথিবীতে যে স্বত্বাধিকার অর্জিত হয়, তা অবশ্যই সম্মানযোগ্য। এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলে তা কেবল এতটুকু থাকতে পারে যে, মালিকানা অর্জন আইনগতভাবে বিশুদ্ধ হয়েছে কিনা! আইনগতভাবে যেসব মালিকানা অবৈধ, সেগুলো অবশ্যি খতম করতে হবে। কিন্তু শরীয়তসম্মত বৈধ মালিকানা হরণ করার অধিকার কোনো সরকার বা আইন পরিষদের নেই। এমনকি, কোনো মালিকের

শরীয়তসম্মত অধিকারে কমবেশী করবার অধিকারও কাউকে দেয়া হয়নি। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের নামে এমন কোনো ব্যবস্থা কায়েম করা যেতে পারেনা, যা জনগণের শরীয়ত প্রদত্ত অধিকারকে পদদলিত করে। সমষ্টির কল্যাণে ব্যক্তির মালিকানার উপর স্বয়ং শরীয়ত্ যে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, তাতে হ্রাস করা যতো বড় অন্যায় সংযোজন করাও ঠিক ততো বড় যুল্‌ম। ব্যক্তির শরীয়ত প্রদত্ত অধিকার সংরক্ষণ করা এবং তা থেকে শরীয়ত নির্ধারিত সামষ্টিক অধিকার আদায় করা ইসলামী সরকারের অন্যতম কর্তব্য।

আল্লাহ্ তা'আলা তার দান ও অনুগ্রহসমূহ বন্টনের ক্ষেত্রে সাম্যনীতি গ্রহণ করেননি। বরঞ্চ নিজের মহাপ্রজ্ঞার ভিত্তিতে কিছু মানুষকে অপর কিছু মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সৌন্দর্য, সুন্দর কণ্ঠস্বর, সুস্থতা, দৈহিক শক্তি, মেধা, জন্মগত পরিবেশ এবং অনুরূপ অপরাপর জিনিস সব মানুষকে সমভাবে প্রদান করা হয়নি। অনুরূপভাবে জীবিকার ব্যাপারেও এই একই কথা প্রযোজ্য। মানুষের মধ্যে জীবিকার তারতম্য হওয়া আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রকৃতিরই দাবী। সুতরাং মানুষের মধ্যে কৃত্রিম অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে যতো কর্মকৌশলই গ্রহণ করা হোকনা কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে, লক্ষ্য ও মূলনীতির দিক থেকে তা সবই ভ্রান্ত। ইসলাম যে সাম্যের সমর্থক, তা জীবিকার ক্ষেত্রে নয় বরঞ্চ জীবিকা লাভের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার সাম্য। ইসলাম চায়, সমাজে এমন কোনো আইনগত ও প্রথাগত প্রতিবন্ধকতা অবশিষ্ট না থাকুক, যার কারণে কোনো ব্যক্তি নিজের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ উপার্জনের চেষ্টা সাধনার পথে বাধার সম্মুখীন হবে। অপরদিকে কোনো শ্রেণী, বংশ বা পরিবারের জন্মগত সৌভাগ্যকে আইনের দ্বারা স্থায়ী করার মতো বৈষম্যমূলক নীতিও ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ দুটি পন্থা মানুষে মানুষে স্বাভাবিক প্রকৃতিগত বৈষম্যের স্থলে মানব সমাজে একটি জবরদস্তিমূলক কৃত্রিম বৈষম্যের সৃষ্টি করে। তাই ইসলাম এসব প্রথা ও আইনকে নির্মূল করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এমন একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে যেখানে প্রতিটি মানুষের জন্যে জীবিকা উপার্জনের সুযোগ সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। কিন্তু যারা জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে চেষ্টা করার মাধ্যম এবং ফলাফল লাভের ব্যাপারে সব মানুষকে জবরদস্তিমূলক একই সমতলে নিয়ে আসতে চায়, ইসলাম তাদের সাথে একমত নয়। কেননা, তারা প্রাকৃতিক অসাম্যকে কৃত্রিম সাম্যে রূপান্তরিত করার অসাধ্য সাধন করতে চায়। বস্তুত প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ব্যবস্থা তো কেবল সেটাই হতে পারে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে, ঠিক সেই স্থান এবং পরিবেশ থেকে যাত্রা শুরু করবে, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করেছেন। যে মটরগাড়ী নিয়ে জন্ম নিয়েছে, সে মটরগাড়ী নিয়ে যাত্রা শুরু করবে, যে কেবল দুই পা নিয়ে এসেছে সে পদদলে চলতে আরম্ভ করবে, আর যে খোড়া হয়ে জন্ম নিয়েছে তাকে খোড়া অবস্থায়ই যাত্রা শুরু করতে দিতে হবে। সমাজে এমন আইন ও প্রথা কোনো অবস্থাতেই চালু হওয়া এবং চালু থাকা উচিত নয়, যার ফলে মটরগাড়ী নিয়ে জন্ম নেয়া ব্যক্তি অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কেবল আইন ও প্রথার বলে চিরদিনই মটরগাড়ীর মালিক থাকবে এবং পংগু হয়ে জন্ম নেয়া লোকেরা আইন প্রথার বাধা

ডিঙ্গিয়ে কোনোদিনই মটর গাড়ীর মালিক হতে পারবেনা। অপরপক্ষে সমাজে এমন ব্যবস্থা থাকাও কিছুতেই সমীচীন নয় যে, সকল মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে একই স্থান এবং পরিবেশ থেকে যাত্রা শুরু করতে হবে এবং সমগ্র পথে সকলকে একই সাথে গ্রথিত থাকতে হবে। বরঞ্চ সমাজের আইন ও প্রথাগত ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত এবং সাধারণভাবে এই সম্ভাবনা উন্মুক্ত থাকা আবশ্যক যাতে, কোন ব্যক্তি পংগু অবস্থায় যাত্রা শুরু করা সত্ত্বেও যদি মটর গাড়ী লাভ করার মত শ্রম, যোগ্যতা প্রতিভা তার থাকে তাহলে অবশ্যই যেন সে মটরগাড়ীর মালিক হতে পারে। অপরদিকে কেউ মটরগাড়ী দিয়ে যাত্রা শুরু করেও যদি নিজের অযোগ্যতার কারণে মটরগাড়ী হারিয়ে ফেলে, তবে তার সে অযোগ্যতার ফলও তার পাওয়া উচিত।

ইসলাম কেবল এতোটুকুই চায়না যে, সমাজ জীবনে কেবল অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত এবং অবাধ থাকবে; বরঞ্চ সেইসাথে এটাও চায় যে, এ ময়দানে প্রতিযোগীগণ পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠুর ও নির্দয় হবার পরিবর্তে সহমর্মী ও সহযোগী হবে। ইসলাম একদিকে নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে অক্ষম ও পিছে পড়ে থাকা মানুষের আশ্রয় প্রদানের মানসিকতা সৃষ্টি করতে চায়; অপরদিকে সমাজে এমন একটি শক্তিশালী সংস্থা গড়ে তুলতে চায় যে অক্ষম ও অসহায় লোকদের সাহায্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। যেসব লোকের জীবিকা উপার্জনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা থাকবে না, তারা এই সংস্থা থেকে নিজেদের অংশ পাবে; যারা দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়বে, এই সংস্থা তাদের উঠিয়ে এনে আবার চলার যোগ্য করে দেবে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্যে যাদের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হবে, এই সংস্থা থেকে তারা সাহায্য সহযোগিতা লাভ করবে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম আইনগতভাবে দেশের গোটা সঞ্চিত সম্পদ থেকে বার্ষিক ২.৫% ভাগ এবং গোটা বাণিজ্যিক পুঁজি থেকে বার্ষিক ২.৫% ভাগ যাকাত সংগ্রহ করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। সমস্ত উশরী জমির উৎপন্ন ফসল থেকে ১০% ভাগ কিংবা ৫% ভাগ উশর এবং কোনো কোনো খনিজ সম্পদের উৎপাদন থেকে ২০% ভাগ যাকাত উসুল করতে বলেছে। এছাড়া গৃহপালিত পশুর উপরও বার্ষিক যাকাত আদায় করতে বলেছে। এই গোটা সম্পদ সামগ্রী ইসলাম গরীব, এতীম, বৃদ্ধ, অক্ষম, উপার্জনহীন, রোগী এবং সব ধরনের অভাবী ও দরিদ্রের সাহায্যার্থে ব্যবহার করতে বলেছে। এটা এমন একটা সামাজিক বীমা, যার বর্তমানে ইসলামী সমাজে কোনো ব্যক্তি জীবন যাপনের অপরিহার্য সামগ্রী থেকে কখনো বঞ্চিত থাকতে পারেনা। কোনো শ্রমজীবী মানুষকে অভুক্ত থাকার ভয়ে কারখানা মালিক বা জমিদারের যেকোনো অন্যায় শর্ত মেনে নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হতে হবেনা। আর উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নামার জন্যে ন্যূনতম যে শক্তি সামর্থ্য থাকা অপরিহার্য, কোনো ব্যক্তির অবস্থাই তার চেয়ে নীচে নেমে যাবেনা।

ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এমন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে, আর সামাজিক স্বার্থের জন্যেও তার স্বাধীনতা কোন

ক্ষতির কারণ না হয়; বরং অবশ্যি কল্যাণবহ হয়। ইসলাম এমন কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামো সমর্থন করেনা, যা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা ও স্বাধীনতাকে বিলীন করে দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কোনো দেশের সমুদয় উৎপাদনের উপকরণকে জাতীয়করণ করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো, দেশের সবগুলো মানুষকে সামাজিক স্বার্থের কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ করা। এমতাবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব ও উন্নতি অত্যন্ত জটিল বরং অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে যেমন রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা প্রয়োজন তেমনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতারও বড় বেশী দরকার। আমরা যদি ব্যক্তিত্বের মূলোৎপাটন করতে না চাই, তাহলে আমাদের সামাজিক জীবনে প্রতিটি মানুষের জন্যে এ সুযোগ অবশ্যি বর্তমান রাখতে হবে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকা উপার্জন করে নিজের মন মানসিকতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে এবং নিজের মানসিক ও নৈতিক তথা সমুদয় যোগ্যতাকে নিজের ঝোঁকপ্রবণতা অনুযায়ী বিকশিত করতে পারে। পরের মুষ্টিবদ্ধে রেশনের খাদ্য যতো প্রচুরই হোকনা কেন, তা মানুষের জন্যে তৃপ্তিদায়ক হতে পারেনা। কেননা, তাতে মনের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে ক্ষতি হয়, কেবল মেদবহুল দেহ তা পূরণ করতে পারে না।

ইসলাম এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেনা; অনুরূপভাবে এমন সমাজ ব্যবস্থাকেও ইসলাম সমর্থন করেনা, যা ব্যক্তিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাগামহীন স্বাধীনতা প্রদান করে এবং নিজের অবাধ কামনা বাসনা ও স্বার্থের জন্যে সমাজকে যথেচ্ছ ক্ষতিগ্রস্ত করার সুযোগ করে দেয়। এ দুটি প্রান্তিক ব্যবস্থার মাঝখানে ইসলাম যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে তা হলো— প্রথমত, সমাজের স্বার্থে ব্যক্তির উপর কিছু দায় দায়িত্ব এবং সীমারেখা আরোপ করা হবে। অতঃপর তার নিজের কর্মক্ষেত্রে তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে। ইসলাম নির্দেশিত এ সীমারেখা এবং দায় দায়িত্বের বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই; এখানে কেবল একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করা হচ্ছে।

প্রথমত জীবিকা উপার্জনের বিষয়টিই আলোচনা করা যাক। এক্ষেত্রে ইসলাম যতোটা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বৈধ অবৈধের পার্থক্য করেছে, বিশ্বের অন্য কোনো ব্যবস্থা তা করেনি। ইসলাম বেছে বেছে উপার্জনের সেই সকল উপায় উপকরণ বা মাধ্যমকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, যেগুলোর দ্বারা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বা সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজকে নৈতিক ও বস্তুগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে স্বীয় স্বার্থ হাসিল করার সুযোগ পায়। মদ এবং মাদকদ্রব্য তৈরী ও বিক্রয় করা, বেশ্যাবৃত্তি, গান বাজনা ও নৃত্যগীতের পেশা, জুয়া, প্রতিজ্ঞাপত্র [এক প্রকার জুয়া], লটারী, সুদ; অনুমান, প্রতারণা এবং এমন ব্যবসা যাতে এক পক্ষের লাভ নিশ্চিত এবং অপর পক্ষের লাভ অনিশ্চিত; মূল্যবৃদ্ধির লক্ষ্যে মজুতদারী এবং অনুরূপ অন্যান্য কায়কারবার যা সমাজের জন্যে অনিষ্টকর,

ইসলামী আইনে তা সবই দ্ব্যর্থহীনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বস্তুত ইসলামের অর্থনৈতিক আইনকানুন পর্যালোচনা করলে উপার্জনের অবৈধ পন্থাপদ্ধতির এক বিরাট তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকার মধ্যে এমন পন্থাপদ্ধতিও আছে যেগুলো প্রয়োগ করে বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষ কোটিপতি হচ্ছে; কিন্তু ইসলাম এসব পন্থাপদ্ধতিকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম কেবল সেইসব পন্থায়ই মানুষকে উপার্জনের স্বাধীনতা প্রদান করেছে, যেগুলোর মাধ্যমে সে অন্য লোকদের প্রকৃত ও কল্যাণকর কোনো সেবা করে সুবিচারের সাথে পারিশ্রমিক লাভ করতে পারে।

ইসলাম বৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদের উপর ব্যক্তির স্বত্বাধিকার স্বীকার করে। কিন্তু এ অধিকারও নিয়ন্ত্রণহীন নয়। এক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তিকে তার বৈধ উপার্জন বৈধ উপায়ে ও বৈধ পথে ব্যয় করতে বাধ্য করে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম এমন কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, যার ফলে ব্যক্তি সাদাসিধে ও পূত-পবিত্র জীবনযাপন অবশ্যি করতে পারবে কিন্তু বিলাসিতার জন্যে অর্থ উড়াবার সুযোগ তার থাকবে না। জাঁকজমক প্রদর্শন করে এতোটা সীমাতিক্রম করারও সুযোগ পাবেনা, যার ফলে অন্যদের উপর তার প্রভুত্বের চাকা জেঁকে বসতে পারে। অপব্যয়ের অনেকগুলো খাতকে তো ইসলামী আইন সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। আর কোনো কোনো খাতকে যদিও সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেনি, কিন্তু বাজে ও অন্যায় ব্যয় থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্যে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা ইসলামী রাষ্ট্রকে দেয়া হয়েছে।

বৈধ ও যুক্তিসংগত আয়-ব্যয়ের পর ব্যক্তির হাতে যে অর্থসম্পদ উদ্বৃত্ত থাকবে, তা সে সঞ্চয়ও করতে পারে এবং অধিক আয় উপার্জনের কাজে বিনিয়োগও করতে পারে। কিন্তু এ দুটি অধিকারের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সঞ্চয় করার ক্ষেত্রে তাকে নিসাবের অতিরিক্ত সম্পদের জন্যে বার্ষিক শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত প্রদান করতে হবে; আর বিনিয়োগ করতে চাইলে কেবল বৈধ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বৈধ বিনিয়োগ সরাসরি নিজেও করতে পারে; আবার ইচ্ছা করলে অপরকে নিজের পুঁজি টাকা, জমি, যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি আকারে প্রদান করে লাভ লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসাও করতে পারে। এ উভয় পন্থায়ই বৈধ। এইসব সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে কেউ যদি কোটিপতিও হয় তাতে ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তির কিছু নেই। বরঞ্চ এটা তার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হবে। তবে সমাজের স্বার্থে ইসলাম এরূপ ক্ষেত্রে দুটি শর্ত আরোপ করেছে; একটি হলো, উক্ত কোটিপতিকে তার ব্যবসার যাবতীয় সম্পদের যাকাত এবং কৃষি উৎপাদনের উশর প্রদান করতে হবে। আর দ্বিতীয়টি হলো, সে তার ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প কারখানা এবং ক্ষেত খামারে যেসব লোকের সাথে অংশীদারিত্বের কিংবা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কর্মসম্পাদন করবে, তাদের সকলের সাথে অবশ্যি সুবিচারমূলক আচরণ করতে হবে। সে স্বয়ং যদি এ সুবিচার না করে, তবে ইসলামী রাষ্ট্র তাকে

সুবিচারের জন্যে বাধ্য করবে।

এসব বৈধ সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে ব্যক্তি যে সম্পদের মালিক হবে, ইসলাম তাও দীর্ঘদিন ধরে জমা করে রাখার অনুমতি দেয়নি; বরঞ্চ উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় তা বন্টন করে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। এক্ষেত্রে ইসলামী আইনের লক্ষ্য বিশ্বের অন্য সকল আইনের চেয়ে ভিন্নতর। অন্যান্য আইন চেষ্টা করে একবার যে সম্পদ অর্জিত হয়েছে, তা যেনো পুরুষানুক্রমে চিরদিন বহাল থাকে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যক্তি সারাজীবনে যে সম্পদ সঞ্চয় করেছে, তার মৃত্যুর সাথে সাথে তা তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দিতে হয়। নিকটাত্মীয় না থাকলে অংশ অনুপাতে দূরের আত্মীয়রা তার উত্তরাধিকারী হবে। আর দূরের কোনো আত্মীয়ও যদি না থাকে তাহলে গোটা মুসলিম সমাজ তার উত্তরাধিকার লাভ করবে। এই আইন বিরাট বিরাট সঞ্চিত পুঁজি এবং জমিদারীকে বেশীদিন টিকে থাকতে দেয়না। উল্লিখিত সকল বিধিনিষেধ সত্ত্বেও কারো সম্পদের আধিক্যের কারণে যদি সমাজে কোনো বিকৃতি সৃষ্টি হয়ও, তবে এই শেষ আঘাতই তা নির্মূল করে দেবে।

প্রথম খণ্ড

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন

এ খণ্ডে আছে

প্রথম অধ্যায়

মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার ইসলামী সমাধান[১]

আধুনিককালে দেশ ও জাতি এবং সামষ্টিকভাবে গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সম্ভবত এর আগে এতোটা স্পষ্টভাবে এর উপর এতো অধিক গুরুত্ব আর কখনো দেয়া হয়নি। "স্পষ্টভাবে" শব্দটি এজন্যে ব্যবহার করেছি যে, আসলে মানুষের জীবনে তার জীবিকা যে পর্যায়ের গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে, প্রতিটি যুগেই ব্যক্তি, সমাজ, জাতি, দেশ এবং সমগ্র মানুষ এর প্রতি সে অনুযায়ী গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। কিন্তু বর্তমানকালে অর্থনৈতিক সমস্যার উপর যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা অতীতের সকল গুরুত্বকে ছাড়িয়ে গেছে। যে জিনিস এ গুরুত্বকে 'স্পষ্টতা' ও 'স্বাতন্ত্র্য' দান করেছে, তা হলো, আজকাল অর্থনীতি রীতিমতো একটি বিরাট শাস্ত্র হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। এর উপর বড় বড় গ্রন্থ রচিত হয়েছে। চমকপ্রদ অসংখ্য পরিভাষা সৃষ্টি হয়েছে; অর্থনীতির বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অগণিত জাঁকজমকপূর্ণ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান। আবার এর সাথে সাথে মানব জীবনের অপরিহার্য সামগ্রীর উৎপাদন, সংগ্রহ, সরবরাহ ও উপার্জনের পন্থাপদ্ধতিও হয়ে উঠেছে জটিল থেকে জটিলতর। এসব কারণে আজ বিশ্বে অর্থনৈতিক সমস্যার উপর যে ব্যাপক আলোচনা, বিতর্ক, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ চলছে, তার তুলনায় মানব জীবনের অন্যান্য সকল সমস্যা যেন ম্লান হয়ে পড়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, যে বিষয়ের প্রতি গোটা বিশ্বের দৃষ্টি এভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তার সহজ সুষ্ঠু সমাধান হওয়ার পরিবর্তে দিন দিন যেন আরো অধিক জটিল ও ধূম্রজালে পরিণত হচ্ছে। অর্থনীতি-বিজ্ঞানের জটিল জটিল পরিভাষা আর অর্থনীতিবিদদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ, গবেষণাপ্রসূত কথাবার্তা এ বিষয়ে জনগণকে রীতিমতো শংকিত ও আতংকিত করে তুলেছে। সাধারণ মানুষ এসব পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ও বিতর্ক শুনে নিজেদের অর্থনৈতিক সমস্যার ভয়াবহতায় ভীত এবং তা সমাধানের সম্ভাবনা সম্পর্কে চরমভাবে নিরাশ হয়ে পড়েছে। কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসকের মুখে তার রোগের জটিল ল্যাটিন নাম শুনে যেমন ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং তার রোগমুক্তি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যায়, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে একালের মানুষের অবস্থাও ঠিক তাই হয়েছে।

---

১. গ্রন্থকার এ নিবন্ধটি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সমিতির' আমন্ত্রণে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রেচী হলে ১৯৪১ সালের ৩০ অক্টোবর তারিখে পাঠ করেন।

অথচ অর্থনীতির এসব পরিভাষা ও শাস্ত্রীয় বিতর্কের ধূম্রজাল অপসারণ করে বিষয়টিকে সাদাসিধে ও স্বাভাবিকভাবে দেখলে অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত রূপ সহজেই উপলব্ধি করা যায় এবং এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্বে আজ পর্যন্ত যেসব উপায় পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর সার্থকতা ও ব্যর্থতার দিকও অনায়াসেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাছাড়া এ সমস্যা সমাধানের সঠিক ও স্বাভাবিক পদ্ধতি কোনটি তা বুঝতেও তেমন কষ্ট হয় না।

খণ্ডিত বিষয়পূজার বিপর্যয়

পূর্বেই বলেছি যে, পরিভাষা এবং শাস্ত্রীয় জটিলতার ভোজবাজি অর্থনৈতিক সমস্যাকে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দুরূহ করে তুলেছে। এ সমস্যা আরো অধিক জটিল হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক সমস্যাকে মানব জীবনের অন্যান্য সমস্যা থেকে পৃথক করে একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখার ফলে। বস্তুত মানব জীবনের অসংখ্য সমস্যার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা হচ্ছে একটি। কিন্তু সামগ্রিক জীবন থেকে অর্থনৈতিক সমস্যাকে পৃথক করে সম্পূর্ণ আলাদা একটি সমস্যা হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। ধীরে ধীরে এর স্বাতন্ত্র্য এমন পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক সমস্যাকেই মানব জীবনের একমাত্র সমস্যা মনে করা হচ্ছে। প্রথমোক্ত ভুল থেকে এটি অনেক বড় ভ্রান্তি। এর কারণেই এ সমস্যার গাঁট খোলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো সহজে বোধগম্য হতে পারে। কোনো হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ যদি মানবদেহের সামগ্রিক কাঠামো থেকে হৃৎপিন্ডকে আলাদা করে দেখতে শুরু করে এবং সেই কাঠামোর মধ্যে হৃদপিণ্ডের যে গুরুত্ব তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হৃৎপিণ্ডকে নেহায়েত হৃৎপিন্ড হিসেবে বিচার করে এবং শেষ পর্যন্ত যদি সে হৃৎপিণ্ডকেই গোটা মানব দেহ বলে বিবেচনা করতে থাকে তাহলে কিরূপ মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হবে তা সহজেই অনুমেয়। এবার ভেবে দেখুন, মানব স্বাস্থ্যের গোটা সমস্যাকে যদি হৃৎপিণ্ডের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ্য করার চেষ্টা করা হয়, তবে এ সমস্যা কতোটা জটিল ও সমাধান অযোগ্য হয়ে পড়ে এবং বেচারা রোগীর জীবনই বা কতোটা বিপদসংকুল হয়ে পড়ে। এ দৃষ্টান্ত সামনে রেখে ভেবে দেখুন, যদি অর্থনৈতিক সমস্যাকে মানুষের অন্যসব সমস্যা থেকে বের করে এনে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দেখা হয়, অতঃপর একে মানুষের একমাত্র সমস্যা বলে ধরা হয় এবং কেবল এর মাধ্যমেই জীবনের অন্যসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়, তাহলে এ থেকে বিভ্রান্তি আর হতাশা ছাড়া মানুষ আর কি পেতে পারে।

আধুনিক কালের অন্যান্য অনিষ্টের মধ্যে বিশেষজ্ঞ (Specialists) তৈরীর অনিষ্ট একটি বড় অনিষ্ট। এর ফলে জীবন এবং এর সমস্যাবলীর উপর সামগ্রিক দৃষ্টি দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ছে। মানুষ এখন জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতি-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি গোটা জগতের জটিলতা ও সমস্যাবলী কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মাধ্যমেই সমাধান করতে চায়; যার মগজে মনোবিজ্ঞান চেপে বসেছে, সে শুধু মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা ও

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই একটি পূর্ণ জীবনদর্শন রচনার প্রয়াস পায়; যার দৃষ্টি যৌনতত্ত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হয়েছে, সে মনে করে গোটা মানব জীবন কেবল যৌনতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। এমনকি, মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র সম্পর্কে বিশ্বাসও নাকি এ পথেই সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে যারা অর্থনীতি শাস্ত্রের গহীনে নিমগ্ন হয়েছে তারা মানুষের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করতে চায় যে, জীবনের আসল ও মূল সমস্যা হলো অর্থনৈতিক সমস্যা; অন্যসব সমস্যা এ মূল সমস্যারই শাখা প্রশাখা মাত্র। অথচ, সত্য কথা হলো এসব সমস্যা হলো একটি পূর্ণাংগ এককের বিভিন্ন অংশ মাত্র। সেই পূর্ণাংগ এককের মধ্যে এসব সমস্যার প্রত্যেকটিরই একটি নির্দিষ্ট অবস্থান রয়েছে। আর সেই অবস্থানের ভিত্তিতেই প্রতিটি সমস্যারই নির্দিষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। মানুষ একটি দেহের অধিকারী। আর এ দেহটি চলছে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে। এ হিসেবে মানুষ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, কিন্তু মানুষ কেবল দেহ মাত্রই নয়; তাই শুধু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দ্বারা মানুষের সকল সমস্যার সমাধান করা যেতে পারেনা। মানুষ একটি প্রাণবিশিষ্ট সত্তা। তাই সে জৈবিক নিয়মের অধীন। এদিক থেকে মানুষ জীববিজ্ঞানেরও (Biology) বিষয়বস্তু। কিন্তু মানুষ কেবল একটি জীবই নয়। সুতরাং কেবল জীববিজ্ঞান বা প্রাণীবিজ্ঞান (Zoology) থেকে মানব জীবনের পূর্ণাংগ আইনবিধান গ্রহণ করা যেতে পারেনা। বেঁচে থাকার জন্যে মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন। এ হিসেবে অর্থনীতি মানব জীবনের একটি বড় অংশকে পরিবেষ্টন করে আছে। কিন্তু মানুষ কেবল পানাহার গ্রহণকারী, পোশাক পরিধানকারী এবং বাসস্থান নির্মাণকারী পশু নয়। তাই শুধুমাত্র অর্থনীতির উপর মানব জীবনদর্শনের ভিত রচনা করা যায় না। মানুষকে তার জাতি রক্ষার জন্যে বংশবৃদ্ধি করতে হয়। তাই তার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড যৌন প্রবৃত্তি। এ হিসেবে মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের সাথে যৌন বিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু তাই বলে গোটা মানুষটি কেবল একটি বংশবৃদ্ধির যন্ত্র নয়; তাই শুধুমাত্র যৌন বিষয়ক চশমা দিয়ে তাকে দেখা সংগত হতে পারেনা। মানুষের একটি মন আছে। এতে অনুভূতি ও চেতনা শক্তি এবং আবেগ, আকাংখা ও লোভলালসা বর্তমান । এ হিসেবে মনোবিজ্ঞান মানুষের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু মানুষের আপাদমস্তক কেবল মন আর মন নয়। তাই শুধু মনোবিজ্ঞান দিয়ে তার জীবনের স্কীম তৈরী করা যেতে পারেনা। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তার প্রকৃতিই তাকে অন্য মানুষের সাথে মিলে মিশে জীবন যাপন করতে বাধ্য করে। এ হিসেবে মানব জীবনের একটি বড় অংশ সমাজ বিজ্ঞানের সাথে জড়িত। কিন্তু মানুষ নিছক একটি সামাজিক জীব মাত্রই নয়। তাই কেবল সমাজ বিজ্ঞানীরা তার জীবন ব্যবস্থা রচনা করতে পারেনা। মানুষ একটি বুদ্ধিমান জীব। তার মধ্যে অনুভূতির উর্ধ্বে বিবেক বুদ্ধির দাবীও রয়েছে। সে বিবেক বুদ্ধিগত প্রশান্তিও চায়। এ হিসেবে যুক্তিবিদ্যা তার একটি বিশেষ দাবী পূরণ করে। কিন্তু মানুষের গোটা সত্তা কেবল বুদ্ধিবিবেক নয়। তাই কেবল তর্কশাস্ত্র দিয়ে তার জীবনের কর্মসূচী তৈরী করা যেতে পারেনা। মানুষ একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তাও বটে। তাই অনুভূতি ও যুক্তির উর্ধ্বে ভালমন্দ ও ন্যায় অন্যায়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়ার আকাংখা তার মধ্যে বর্তমান। এ হিসেবে মানব জীবনের একটি অংশ

জুড়ে রয়েছে নীতিবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মতত্ত্ব। কিন্তু মানুষ কেবল নীতিবোধ ও আধ্যাত্মিকতা সর্বস্ব জীব নয়। তাই শুধুমাত্র নীতিবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যা দিয়ে তার জীবন ব্যবস্থা রচিত হতে পারেনা।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, মানুষ একই সাথে এ সবগুলো বিষয়ের সমন্বয়। এ সবগুলো বিষয় তার মধ্যে যথাস্থানে বর্তমান রয়েছে; এছাড়া মানব জীবনের আরো একটি বড় দিক রয়েছে; তা হলো গোটা বিশ্ব জগতের সামগ্রিক ব্যবস্থার সে একটি অংশও। তাই তার জীবন ব্যবস্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, গোটা জগতের সামগ্রিক ব্যবস্থায় তার অবস্থান কোথায় এবং এর একটি অংশ হিসেবে তার কি ধরনের কাজ করা উচিত? তাছাড়া নিজ উদ্দেশ্য লক্ষ্য নির্ণয় করাও তার জন্যে অপরিহার্য। আর সে হিসেবে কি কাজ তার করা উচিত, সে সিদ্ধান্তও তাকে গ্রহণ করতে হবে। শেষোক্ত দুটি প্রশ্ন মানব জীবনের মৌলিক প্রশ্ন। এগুলোর ভিত্তিতেই রচিত হয় জীবনদর্শন। অতপর মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিশ্বের সকল জ্ঞান বিজ্ঞান সেই জীবনদর্শনের অধীনেই নিজ নিজ পরিসরভুক্ত তথ্য ও জ্ঞান আহরণ করে এবং কমবেশী এ সবগুলোর সমন্বয়েই রচিত হয় মানব জীবনের কর্মসূচী। অতপর এর ভিত্তিতেই পরিচালিত হয় মানব জীবনের গোটা কাঠামো।

আপনি যদি আপনার জীবনের কোনো একটি সমস্যাকে বুঝতে চান, তবে দূরবীন লাগিয়ে কেবল সে সমস্যার মধ্যে নিজের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা যে কোনো সঠিক পন্থা নয়, সে কথাটা এতোক্ষণে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়েছে। এতে আরো স্পষ্ট হয়েছে যে, সমস্যাটির সাথে জড়িত জীবনের সেই নির্দিষ্ট বিভাগের প্রতি অন্ধ প্রবণতা নিয়ে গোটা জীবনসমস্যার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও সঠিক কাজ নয়; বরং সে নির্দিষ্ট সমস্যাটিকে জীবনসমস্যার সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে তার অবস্থানের প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার মাধ্যমেই তার সঠিক সমাধান উপলব্ধি করা যেতে পারে। বস্তুত বিচার বিশ্লেষণের এটাই নির্ভুল পন্থা। একইভাবে আপনি যদি জীবনের ভারসাম্যের মধ্যে কোনো বিকৃতি দেখতে পান এবং তা শোধরাতে চান, তবে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ, কোনো একটি সমস্যাকে সমগ্র জীবনসমস্যা ধরে নিয়ে একে কেন্দ্র করে জীবনের গোটা কারখানাকে ঘুরাতে থাকলে যে বিপদ সৃষ্টি হবে তার চেয়ে বড় বিপদ আর কিছু হতে পারেনা। এরূপ পদক্ষেপের মাধ্যমে তো আপনি গোটা ভারসাম্যকে বিনষ্টই করে দেবেন। সংশোধনের সঠিক পন্থা হলো, আপনাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগি নিয়ে পূর্ণাংগ জীবন কাঠামোকে এর মৌলিক দর্শনসহ প্রাসংগিক বিষয়াদি পর্যন্ত সবকিছু দৃষ্টিতে আনতে হবে এবং বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে কোথায় বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছে আর তার ধরনই বা কি?

মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা বুঝা এবং যথার্থভাবে তা সমাধানের ক্ষেত্রে যে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে তার বড় কারণ হলো, কিছু লোক সমস্যাটিকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখছে। আবার কিছু লোক এর গুরুত্বের প্রতি এতোটা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে যে,

তারা এটাকেই মানব জীবনের একমাত্র সমস্যা বলে ধরে নিয়েছে। আবার অন্য কিছু লোকের বাড়াবাড়ি চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। তারা জীবনের মূল দর্শন, নৈতিকতা ও সমাজের গোটা কাঠামোকে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অথচ অর্থনীতিকে যদি মানব জীবনের মূলভিত্তি মনে করা হয়, তাহলে তো মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য আর একটি গরুর জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকেনা। একটি গরু এর চূড়ান্ত চেষ্টা সাধনা নিয়োজিত করে সবুজ শ্যামল ঘাস খেয়ে সুখী শক্তিমান জীবন এবং জগতের চারণভূমিতে স্বাধীন পশুর মর্যাদা লাভ করার জন্যে। মানুষও যদি কেবল অর্থনীতি সর্বস্ব হয়ে পড়ে তাহলে এই পশুটির সাথে তার আর কোনো পার্থক্য থাকেনা।

অনুরূপভাবে নীতিবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং অন্যান্য সব বিষয় ও শাস্ত্রের মাঝে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণকে প্রভাবশালী করার দ্বারা সাংঘাতিক বিপর্যয় ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হতে বাধ্য। কারণ, মানব জীবনের এসকল বিভাগের ভিত্তি তো অর্থনীতি নয়। সবকিছুকে যদি অর্থনীতির ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়, সেক্ষেত্রে নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা প্রবৃত্তিপূজা ও বস্তুপূজায় রূপান্তরিত হবে, যুক্তিবিদ্যা অন্নবিদ্যায়, সমাজ বিজ্ঞানের সমগ্র স্তর সামাজিক তত্ত্ব ও তথ্য বিচারের পরিবর্তে ব্যবসায়িক কার্যধারায় এবং মনোবিজ্ঞান মানসিকতা অধ্যয়নের পরিবর্তে মানুষকে নিছক অর্থনৈতিক জীব হিসাবে বিশ্লেষণ করার শাস্ত্রে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় মানবতার প্রতি এর চেয়ে বড় অবিচার আর হতে পারেনা।

অর্থনৈতিক সমস্যা আসলে কি?

আমরা যদি পরিভাষাগত এবং শাস্ত্রীয় জটিলতার ধূম্রজালকে একপাশে রেখে একেবারে সহজ, সরল ও সাধারণভাবে দেখি তাহলে সহজেই মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত রূপ বুঝতে পারি। সমাজের বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির ধারা অব্যাহত রেখে কিভাবে সকল মানুষের অপরিহার্য জীবন সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়; কিভাবে সমাজের প্রতিটি মানুষকে তার সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী উন্নত করা যায় এবং কিভাবে তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে যোগ্যতার চরম শিখরে পৌঁছার সুযোগ করে দেয়া যায়, আসলে তা-ই হলো মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার মূলকথা।

সুপ্রাচীন কালে মানুষের জীবিকার বিষয়টি ছিলো পশুপাখির জীবিকার মতোই সহজ ও জটিলতামুক্ত। আল্লাহ্‌র এই যমীনে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সীমাসংখ্যাহীন জীবন সামগ্রী। প্রতিটি সৃষ্টির জন্যে যা প্রয়োজন তার তুলনায় জীবিকার সরবরাহ ছিল অঢেল ও অগাধ। প্রত্যেকেই স্বীয় জীবিকার অন্বেষণে বের হতো আর পৃথিবীর ভাণ্ডার থেকে তা সংগ্রহ করে নিত। এজন্যে কাউকেও মূল্য পরিশোধ করতে হতো না। এক সৃষ্টির জীবিকা অপর সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধও ছিল না। প্রাচীনতম কালে মানুষের অবস্থাও প্রায় এরকমই ছিলো। সে সময়ে মানুষ বেরিয়ে পড়তো আর প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করে নিতো নিজের প্রয়োজনীয় জীবিকা। এসব রুজি ছিল ফল পাকড়া এবং শিকার

করা পশুপাখি। সে সময়ে মানুষ প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে ঢেকে নিতো নিজেদের শরীর। পৃথিবীর বুকে যেখানেই সুযোগ সুবিধা দেখতো, সেখানেই মাথা গোঁজার জন্যে জায়গা বানিয়ে নিতো।

কিন্তু এ অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকার জন্যে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে এমন সৃজনশীল প্রতিভা ও আকাংখা অন্তর্নিহিত করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষ ব্যষ্টিক ও স্বতন্ত্র জীবন যাপন রীতি পরিত্যাগ করে সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের প্রক্রিয়া অবলম্বন এবং নিজের কর্মকৌশলের মাধ্যমে প্রকৃতির সরবরাহকৃত উপকরণ ব্যবহার করে নিজেদের জীবন উপকরণকে আরো উন্নত করার প্রয়াস পেয়েছে। নারীপুরুষের মাঝে স্থায়ী সম্পর্কের প্রকৃতিগত আকাংখা, মানবশিশুর দীর্ঘ সময় ধরে মা বাবার প্রতিপালনের মুখাপেক্ষী হওয়া, নিজ সন্তান-সন্ততি ও বংশের প্রতি মানুষের গভীর আকর্ষণ এবং রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের প্রতি মহব্বত ভালবাসা এসব প্রবণতা মানব প্রকৃতিতে এমনভাবে নিহিত রাখা হয়েছে যাতে মানুষ সমাবদ্ধ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। একইরূপে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত উপকরণে তুষ্ট না হয়ে কৃষিকাজের মাধ্যমে নিজের খাদ্য উৎপাদন, পত্রপল্লব দিয়ে দেহ আবৃত করার পরিবর্তে নিজের জন্যে শিল্পসম্মত পোশাক তৈরী, গুহায় থাকার উপর সন্তুষ্ট না থেকে ঘরবাড়ী বানানো এবং নিজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে দৈহিক যন্ত্রপাতির উপর তুষ্ট না হয়ে লোহা, পাথর, কাঠ, ইত্যাদির সাহায্যে যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা ইত্যাদি সবই প্রকৃতি মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত করে দিয়েছে। এরই অপরিহার্য ফল স্বরূপ মানুষ ধীরে ধীরে সমাজবদ্ধ হয়েছে। এটা মানুষের কোনো অপরাধ নয়; বরঞ্চ এই ছিলো মানব প্রকৃতির দাবি এবং সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা।

সামাজিক জীবনে প্রবেশের সাথে সাথে মানুষের জন্যে কিছু বিষয় অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। সে বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

এক

ধীরে ধীরে মানুষের জীবনোপকরণের চাহিদা বেড়ে গেল। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের যাবতীয় চাহিদা নিজেই পূরণ করতে অসমর্থ হয়ে পড়লো। ফলে একজনের কিছু চাহিদা অন্যদের সাথে এবং অন্যদের কিছু চাহিদা তার সাথে সম্পর্কিত হলো এবং মানুষ পরস্পরের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লো।

দুই

জীবন যাপনের অপরিহার্য সামগ্রীর বিনিময় (Exchange) রীতি চালু করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে বিনিময়ের একটি মাধ্যম (Medium of Exchange) নির্দিষ্ট হলো।

তিন

প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী তৈরী করার জন্যে যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হলো এবং চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে মানুষ নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার এবং তা থেকে উপকৃত হতে লাগলো।

চার

এসবের সাথে সাথে মানুষ এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাইলো যে, নিজের শ্রমের মাধ্যমে সে যেসব জিনিস লাভ করেছে, যেসব যন্ত্রপাতি দিয়ে সে কাজ করছে, যে জমিতে সে ঘর বানিয়েছে এবং যেখানে সে নিজের পেশাগত কাজ করছে, সেসবকিছুই যেনো তার অধিকারে থাকে এবং তার মৃত্যুর পর ঐসব লোকেরাই যেনো এসবের স্বত্বাধিকারী হয়, যারা অন্যদের তুলনায় তার অধিকতর নিকটবর্তী।

এভাবে বিভিন্ন পেশার জন্ম হয়, ক্রয়বিক্রয় ও দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ রীতি চালু হয়, মূল্য নিরূপণের মানদন্ড হিসেবে মুদ্রার প্রচলন হয়, আন্তর্জাতিক আদান প্রদান এবং আমদানী রপ্তানীর সুযোগ সৃষ্টি হয়, নতুন নতুন উৎপাদন উপকরণ (Means of Production) আবিষ্কৃত হয় এবং স্বত্বাধিকার ও উত্তরাধিকার রীতি চালু হয়। এসবই ছিলো স্বাভাবিক এবং প্রকৃতির দাবী এবং এগুলোর মধ্যে কোনোটিই গুনাহ্‌র কাজ ছিলনা যে, এখন তার জন্যে তওবা করতে হবে।

এছাড়া মানব সমাজের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোও অপরিহার্য হয়ে পড়ে ঃ

[১] মানুষের শক্তি সামর্থ্য এবং যোগ্যতা প্রতিভার ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ যে পার্থক্য রেখে দিয়েছেন, তার ফলশ্রুতিতে কিছু মানুষ তার প্রকৃত চাহিদার চেয়ে অধিক উপার্জনে সক্ষম হওয়া, কিছু লোক চাহিদা মেটানোর মতো উপার্জন করা এবং আর কিছু লোক নিজেদের চাহিদা পূরণ করার মতো উপার্জন করতে না পারা স্বাভাবিক ছিল।

[২] উত্তরাধিকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ সম্পত্তির কারণে কিছু লোকের জীবনের সূচনাই অগাধ উপায় উপকরণের মধ্যে হওয়া, কিছু লোক স্বল্প উপায় উপকরণ নিয়ে যাত্রা শুরু করা এবং আর কিছু লোক সহায় সম্বলহীন অবস্থায় নিঃসম্বল হয়ে জীবন যুদ্ধে নামাও অপরিহার্য ছিল।

[৩] প্রাকৃতিক কার্যকারণেই প্রতিটি জনবসতিতে এমন কিছু লোকও বর্তমান থাকা স্বাভাবিক ছিল যারা জীবিকা উপার্জনের কাজে অংশগ্রহণে অযোগ্য এবং বিনিময়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী সংগ্রহ করতেও অক্ষম। যেমন শিশু, বৃদ্ধ, রোগী, অক্ষম প্রভৃতি।

[৪] এছাড়া প্রত্যেক সমাজে এমন কিছু লোক থাকা স্বাভাবিক ছিল যারা সেবা গ্রহণ করবে, আর কিছু লোক থাকবে যারা সেবা প্রদান করবে। এভাবেই সৃষ্টি হবে স্বাধীন শিল্প কারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য; চালু হবে অপরের চাকুরী করা এবং শ্রম বিনিময়ের প্রথা।

মানব সমাজে এসবই ঘটেছে স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক কার্যকারণে। এসব অবস্থা সংগঠিত হবার কারণে এমন কোনো অন্যায় বা অপরাধ হয়নি যে, এখন সেগুলোকে উচ্ছেদের চিন্তা করতে হবে। সামাজিক বিপর্যয় ও বিকৃতির অন্যান্য কারণ থেকে যেসব

অনিষ্ট সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়ে বহুলোক ঘাবড়ে যায়। ফলে কখনো ব্যক্তি মালিকানাকে, কখনো অর্থকড়িকে, কখনো যন্ত্রপাতিকে, কখনো মানুষের মধ্যে বিরাজমান স্বাভাবিক অসাম্যকে এবং কখনোবা সমাজকেই দায়ী করা হয়। কিন্তু আসলে এটা ভ্রান্ত মূল্যায়ন এবং রোগ ও ওষুধ নিরূপণের ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। মানব প্রকৃতির দাবী অনুসারে যে সামাজিক বিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে সমাজ কাঠামো যে রূপ পরিগ্রহ করে, তা প্রতিহত করার চেষ্টা করা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। এরূপ চেষ্টায় সাফল্যের তুলনায় ধ্বংস ও অনিষ্টের আশংকাই অধিক। কিভাবে সামাজিক উন্নয়ন প্রতিহত করা যায়, কিংবা কিভাবে স্বাভাবিক রূপ কাঠামোকে পাল্টানো যায়—মানুষের আসল অর্থনৈতিক সমস্যা এটা নয়। বরঞ্চ তার আসল অর্থনৈতিক সমস্যা হলো, সমাজের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারাকে অক্ষুণ্ন রেখে সামাজিক যুল্‌ম অবিচার কিভাবে প্রতিহত করা যায়। 'প্রতিটি সৃষ্টি তার জীবিকা লাভ করুক'—প্রকৃতির এই উদ্দেশ্য কিভাবে পূর্ণ করা যায় এবং কিভাবেই বা সেইসব প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়, যেগুলোর কারণে কেবল উপায় উপকরণ নেই বলে অসংখ্য মানুষের শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা প্রতিভা বিনষ্ট হয়ে যায়; মূলত এগুলো হচ্ছে মানুষের সত্যিকার অর্থনৈতিক সমস্যা।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আসল কারণ

এবার আমরা দেখবো, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সত্যিকার কারণ কি আর এই বিকৃতি ও বিপর্যয়ের ধরনই বা কি?

মূলত, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সূচনা হয় স্বার্থপরতার ক্ষেত্রে বেপরোয়া সীমালংঘন থেকে। অতপর অন্যান্য নৈতিক অসাধুতা এবং ভ্রান্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাহায্যে এ বিকৃতি-বিপর্যয় আরো বৃদ্ধি এবং প্রসার লাভ করে। এমনকি, তা গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে জীবনের অন্যান্য বিভাগেও তার বিষাক্ত ছোবল সম্প্রসারিত করে থাকে। আমি একটু আগেই বলেছি, ব্যক্তিমালিকানা এবং কিছু লোকের তুলনায় অপর কিছু লোকের আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়া মূলত প্রকৃতিরই দাবী এবং অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা মূলত কোনো প্রকার অনিষ্টের কারণ নয়। মানুষের সকল নৈতিক গুণবৈশিষ্ট্য যদি সুসামঞ্জস্যের সাথে কাজ করার সুযোগ পায় আর বাইরেও যদি ইনসাফ ও সুবিচার ভিত্তিক একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে এ দুটি জিনিস থেকে কোনো প্রকার অনিষ্ট সৃষ্টি হতে পারেনা। কিন্তু স্বাভাবিক কারণে যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল তাদের স্বার্থপরতা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি, অনিষ্ট চিন্তা, কার্পণ্য, লোভ লালসা, দুর্নীতি এবং প্রবৃত্তিপূজার ফলে এগুলোকে অনিষ্ট সৃষ্টির কারণ বানিয়ে দিয়েছে। শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিয়ে বুঝিয়েছে যে, প্রকৃত প্রয়োজনের চেয়ে অধিক যেসব অর্থসামগ্রী তোমাদের হাতে আসে এবং যেগুলো তোমাদের মালিকানাভুক্ত হয়, সেগুলো ব্যয়-বিনিয়োগের সঠিক এবং যুক্তিসংগত খাত হলো দুটি ঃ এক, সেগুলো নিজের আরাম আয়েশ, বিলাসিতা, আনন্দ স্ফূর্তি এবং সুখ স্বাচ্ছন্দের কাজে ব্যয় করবে। আর দ্বিতীয় হলো, আরো অধিক অর্থসামগ্রীর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে সেগুলোকে

বিনিয়োগ করবে এবং সম্ভব হলে এগুলোর মাধ্যমে মানুষের প্রভু এবং অন্নদাতা হয়ে বসবে।

প্রবৃত্তিপূজা এবং বিলাসিতা

শয়তানের এ পয়লা শিক্ষার পরিণতি এই দাঁড়ালো যে, সম্পদশালীরা সমাজের সেসব লোকের অধিকার মেনে নিতে অস্বীকার করলো যারা বঞ্চিত কিংবা যারা প্রয়োজনের তুলনায় কম সম্পদ লাভ করেছে। তারা এ লোকগুলোকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুরবস্থায় নিক্ষেপ করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করলো না। নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে তারা একথা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলো যে, তাদের আচরণের ফলে সমাজের বহু মানুষ অপরাধের কাজে লিপ্ত হতে পারে, অনেকে নৈতিক অধঃপতনের গহ্বরে নিমজ্জিত হতে পারে এবং শারীরিক দুর্বলতা ও রোগব্যাধির শিকার হতে পারে। ফলে তারা তাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি ও যোগ্যতা প্রতিভা বিকশিত করা এবং সমাজ সভ্যতার উন্নতিতে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। এতে সামষ্টিকভাবে সেই সমাজটিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ধনীগণ নিজেরাও যার অংশ। সমাজের বিত্তশালী সদস্যরা এতোটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরঞ্চ এরা নিজেদের প্রকৃত প্রয়োজনের উপর আরো অসংখ্য প্রয়োজনকে সংযোজন করে নিয়েছে। আর নিজেদের দুষ্ট প্রবৃত্তির মনগড়া এসব উদগ্র কামনা বাসনা পূরণের জন্যে তারা এমন অসংখ্য মানুষকে নিয়োজিত করেছে যাদের যোগ্যতা প্রতিভা সমাজ সভ্যতার কল্যাণময় সেবায় ব্যবহৃত হতে পারতো। জ্বিনা ব্যভিচারকে তারা নিজেদের জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজ বানিয়ে নিয়েছে। আর এ লালসা চরিতার্থ করার জন্য তারা অসংখ্য নারীকে দেহব্যবসা ও রূপ-যৌবনের বিপণি সাজাতে বাধ্য করলো। গানবাজনাকে তারা তাদের অপরিহার্য প্রয়োজনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নিল। এজন্যে তৈরী করা হলো গায়ক গায়িকা, নর্তকী এবং বাদকদের দল; বহু লোককে নিয়োগ করা হলো বাদ্যযন্ত্র তৈরীর কাজে। তাদের আনন্দস্ফূতি ও চিত্ত বিনোদনের জন্য নানা ধরনের ভাঁড়, রসিক, অভিনেতা অভিনেত্রী, গাল্পিক, অংকনশিল্পী, চিত্রশিল্পী এবং অন্যান্য অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় পেশা ও পেশাদারের জন্ম হলো। এসব ধনশালীদের বিলাস চরিতার্থ করার জন্যে অগণিত লোককে ভালো কল্যাণময় কাজের পরিবর্তে বনের পশুপাখি তাড়িয়ে ফেরার কাজে নিযুক্ত করা হয়। তাদের আনন্দস্ফুর্তি ও নেশার প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে অসংখ্য মানব সন্তানকে নিয়োগ করা হয় মদ, কোকেন, আফিম এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য তৈরী ও সরবরাহের কাজে। মোটকথা, এভাবে শয়তানের এসব সাথীরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে সমাজের একটি বিরাট অংশকে শুধুমাত্র নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক ধ্বংসের গহ্বরে নিমজ্জিত করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরঞ্চ আরো অগ্রসর হয়ে সমাজের আরেকটি বড় অংশকে সঠিক ও কল্যাণময় কাজ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে অর্থহীন, অপমানকর ও ক্ষতিকর কাজে নিযুক্ত করেছিল। সমাজের গতিকে এর সঠিক ও ন্যায়সংগত পথ থেকে বিচ্যুত করে এমন পথে পরিচালিত করলো, যা মানবতাকে নিয়ে যায় ধ্বংসের অতল গহ্বরে। সম্পদশালীদের যুল্ম, অবিচার ও

ধ্বংসাত্মক কার্যধারার এখানেই শেষ নয়। তারা কেবল মানবীয় মূলধনকে [Human Capital] অপচয় ও ধ্বংস করেছে তাই নয়। বরং সেইসাথে তারা বস্তুগত মূলধনকেও ভ্রান্ত পথে বিনিয়োগ ও ব্যয় ব্যবহার করেছে। নিজেদের প্রয়োজনে তারা বড় বড় প্রাসাদ, অন্দরমহল, গুলবাগিচা, প্রমোদকুঞ্জ, নৃত্যশালা, নাট্যশালা, প্রেক্ষাগার এমনকি মরার পর সমাধির জন্যও তারা বিরাট ভূমিখন্ডের উপর জাঁকজমকপূর্ণ সমাধিসৌধ নির্মাণ করে নিল। এভাবে আল্লাহ্‌র অসংখ্য বান্দার বাসস্থান ও জীবিকার জন্যে যে জমি ও দ্রব্যসামগ্রী কাজে লাগতে পারতো, তা মাত্র গুটিকয়েক বিলাসী ব্যক্তির পৃথিবীতে জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থান ও বিদায়ের ব্যবস্থা করার জন্যে ব্যয় করা হলো। দামী দামী অলংকার, মনোরম পোশাক, উঁচুদরের সাজসজ্জা, সৌন্দর্য ও বিলাসিতার সামগ্রী, জাঁকালো মডেলের যানবাহন এবং আরো অনেক জানা অজানা বাহারী সামগ্রীর জন্য তারা অঢেল সম্পদ ব্যয় করলো। এমনকি, এসব যালিমরা জানালা দরজায় দামী দামী পর্দা ঝুলালো, ঘরের দেয়ালগুলোতে বহু টাকা ব্যয় করে ছবি ও চিত্র এঁকে নিলো, ঘরের মেঝেতে বিছিয়ে দিলো হাজার হাজার টাকা মূল্যের কার্পেট ও গালিচা। তারা তাদের কুকুরগুলোকে পর্যন্ত মখমলের পোশাক আর সোনার শিকল পরিয়ে দিলো। এভাবে বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী এবং অসংখ্য মানুষের শ্রম ও সময় যা দুঃস্থ মানুষের দেহাচ্ছাদন ও ক্ষুধা নিবৃত্ত করার কাজে লাগতে পারতো, তা মাত্র গুটিকয়েক বিলাসী ব্যক্তি ও প্রবৃত্তির দাসানুদাসের লালসা চরিতার্থ করার জন্যে নিঃশেষ হয়ে গেলো।

বস্তুপূজা

এযাবত যে মারাত্মক চিত্র তুলে ধরলাম, এসবই হলো শয়তানী নেতৃত্বের মাত্র একটি দিকের পরিণতি। শয়তানী নেতৃত্বের অন্য দিকটির পরিণতি এর চেয়েও ভয়াবহ। প্রকৃত প্রয়োজনের অধিক যে সম্পদ ও উপায় উপকরণ কোনো ব্যক্তির হস্তগত হয়েছে, সেগুলোকে 'জমিয়ে রাখবে এবং আরও সম্পদ অর্জনের কাজে বিনিয়োগ করবে' এই নীতি একেবারেই ভ্রান্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ পৃথিবীতে যেসব উপায় উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তা সৃষ্টিজগৎ ও মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে তোমার হাতে যদি কিছু অধিক অর্থসম্পদ এসে গিয়ে থাকে, তবে জেনে রেখো এটা অপরের অংশই তোমার হাতে এসেছে। তুমি কেন তা জমিয়ে জমিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ছো? তোমার চারপাশে তাকাও, দেখবে যারা তাদের জীবিকা সংগ্রহ করতে অক্ষম, কিংবা যারা তাদের জীবিকা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে, অথবা যারা নিজেদের প্রকৃত প্রয়োজনের চেয়ে কম পেয়েছে, মনে করবে এরাই হলো সেইসব লোক যাদের জীবিকার অংশ তোমার হাতে এসে গেছে। তারা তা আহরণ করতে পারেনি; সুতরাং তুমি নিজেই তা তাদের পৌঁছে দিও। এটাই হচ্ছে সঠিক কর্মনীতি। এর পরিবর্তে তুমি যদি সে সম্পদকে আরো অধিক সম্পদ লাভের কাজে ব্যবহার কর তবে তা হবে এক চরম ভ্রান্তি। কেননা এগুলোর সাহায্যে তুমি আরো যতো সম্পদই সংগ্রহ করবে, তাতো তোমার প্রয়োজনের

চাইতে আরো অনেক বেশীই হবে। সুতরাং সম্পদের পর সম্পদ লাভ করে সেগুলোর মাধ্যমে তোমার বিকৃত লোভ লালসা আর কামনা বাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া কল্যাণকর আর কি হতে পারে! তুমি তোমার সময়, শ্রম এবং যোগ্যতার যতোটা অংশ প্রয়োজনীয় জীবিকা লাভের কাজে ব্যয় কর, মূলত ততোটুকুই কেবল এগুলোর সঠিক ও যুক্তিসংগত প্রয়োগ। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ লাভের জন্যে সেগুলোকে কাজে লাগালে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তুমি একটি অর্থনৈতিক পশু, বরং অর্থ উপার্জনের একটি মেশিন ছাড়া আর কিছু নও। অথচ তোমার সময়, শ্রম এবং মানসিক ও দৈহিক যোগ্যতা অর্থ উপার্জনের কাজে প্রয়োগ করা ছাড়াও আরো অনেক মহান ও উত্তম প্রয়োগক্ষেত্র রয়েছে। সুতরাং বিবেক বুদ্ধি ও স্বভাব প্রকৃতির দিক থেকে এ নীতি একেবারেই ভ্রান্ত, যা শয়তান তার শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছে। তাছাড়া এই নীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্যে যে কর্মপন্থা তৈরী করা হয়েছে সেটা এতোই অভিশপ্ত এবং এর পরিণাম ফল এতোই ভয়াবহ যে, তা কল্পনা করাও কষ্টকর।

প্রয়োজনের অধিক অর্থসম্পদকে আরো অধিক অর্থসম্পদ কবজা করার কাজে দুইভাবে বিনিয়োগ করা যায় ঃ

এক. সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা;

দুই. ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্প কারখানায় বিনিয়োগ করা।

ধরনগতদিক থেকে উভয় পদ্ধতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য অবশ্যি আছে। কিন্তু উভয় পদ্ধতির সমন্বিত কর্মের অনিবার্য পরিণতিতে সমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

একটি শ্রেণী হলো তারা, যারা নিজেদের প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী অর্থসম্পদের মালিক হয় এবং সে সম্পদকে আরো বেশী সম্পদ আহরণের কাজে অর্থাৎ সম্পদের পাহাড় গড়ার কাজে বিনিয়োগ করে। এ শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যায় কম হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীটি হলো তারা, যারা নিজেদের প্রকৃত প্রয়োজনের সমান বা তার চেয়ে কম অর্থসম্পদের অধিকারী হয়, কিংবা একেবারে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এই শ্রেণীটি সংখ্যায় প্রথমোক্ত শ্রেণীর তুলনায় অনেক বেশী হয়।

উভয় শ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী, পরস্পর বিরোধী এবং সাংঘর্ষিক। শুধু তাই নয়, বরং উভয় শ্রেণীর মাঝে সম্পর্ক হয়ে থাকে সংঘাতময়, দ্বন্দ্বমুখর এবং প্রতিবাদী। এভাবেই প্রকৃতি মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যে সুস্থ ও সম্মতিপূর্ণ বিনিময় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তা সংঘাত ও শত্রুতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার [Antagonistic Compitition] উপর ভিত্তিশীল হয়ে পড়ে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক [ANTAGONISTIC COMPETITION] অর্থব্যবস্থা

অতঃপর এ সংঘাতময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতোই বাড়তে থাকে, ততোই ধনীক শ্রেণীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে এবং দরিদ্র শ্রেণীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রকৃতিই এমন যে, এতে বিত্তশালীরা তাদের সম্পদের জোরে কম বিত্তের মালিকদের কাছ থেকে সম্পদ চুষে নেয় এবং তাদেরকে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের দলে ঠেলে দেয়। এভাবে দিন দিন বিশ্বের অর্থসম্পদ স্বল্প থেকে স্বল্পতর সংখ্যক লোকের হাতে কুক্ষিগত হতে থাকে এবং অধিক থেকে অধিক লোক দিন দিন নিঃস্ব ও দরিদ্র হয়ে যায় কিংবা ধনীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

প্রথমদিকে এ সংঘাতের সূচনা হয় স্বল্প পরিসরে। অতঃপর এর পরিধি বাড়তে বাড়তে দেশ হতে দেশে এবং জাতি হতে জাতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি ক্রমে গোটা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলে। এ প্রক্রিয়া এখানেই শেষ হয় না; এর পরও 'আরও চাই আরও চাই' বলে যেন চিৎকার করতে থাকে। যে প্রক্রিয়ায় এ বৈষম্য সংঘটিত হয়, তা হলো, কোনো একটি দেশের কিছুলোকের হাতে যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসম্পদ থাকে তখন তারা উদ্বৃত্ত অর্থসম্পদকে লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করে এবং এই অর্থ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কাজে ব্যয় হতে থাকে। এখন তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজি লাভসমেত উঠে আসাটা নির্ভর করে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সে দেশের ভেতরে বিক্রয় হওয়ার উপর। কিন্তু বাস্তবে এমনটি সর্বদা হয়না এবং মূলত তা হতে পারেও না। কারণ যাদের হাতে প্রয়োজনের চেয়ে কম সম্পদ রয়েছে তাদের ক্রয়ক্ষমতা তো ক্ষীণই হয়ে থাকে। তাই প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা সরকারী জিনিস ক্রয় করতে পারে না। অপরদিকে যাদের কাছে অতিরিক্ত সম্পদ থাকে তারা তাদের আয়ের একটি বিরাট অংশ অধিক মুনাফা অর্জন করার কাজে বিনিয়োগ করে। তাই তারা নিজেদের সাকুল্য মূলধন পণ্য ক্রয়ের জন্যে ব্যয় করেনা। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর একটি বিরাট অংশ অনিবার্যভাবে অবিক্রিত থেকে যায়। অন্য কথায় এর অর্থ হলো, ধনীদের বিনিয়োগকৃত অর্থের একটি অংশ অনাদায়ী থেকে যায়। এই অর্থ দেশের শিল্পের [INDUSTRY] নিকট ঋণ হিসেবে পাওনা থাকে। এ হচ্ছে একটি মাত্র আবর্তনের অবস্থা। এভাবে যতোবারই পুঁজি আবর্তিত হয় ততোবারই পুঁজিপতিরা তাদের লব্ধ আয়ের একটি অংশ আবার লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করবে এবং প্রত্যেক আবর্তনেই অনাদায়ী অর্থের পরিমাণও বাড়তে থাকবে। এভাবে দেশীয় শিল্পের কাছে এ ধরনের ঋণ দ্বিগুণ, চারগুণ, হাজারগুণ বৃদ্ধি পায় যা স্বয়ং সেই রাষ্ট্রের পক্ষেও কখনো আদায় করা সম্ভব হয়না। এ প্রক্রিয়ায় একেকটি দেশ দেউলিয়াত্বের চরম বিপদে নিপতিত হয়। এ অবস্থা থেকে বাঁচার একটিই মাত্র উপায় থাকে। তা হলো, দেশের মধ্যে অবিক্রিত থেকে যাওয়া সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী বহির্বিশ্বে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ এমন দেশের সন্ধান করা যার ঘাড়ে নিজের দেউলিয়াত্ব চাপিয়ে দেয়া যায়।

এভাবেই এ সংঘাতময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ময়দানে পদার্পণ করে। একথা স্পষ্ট যে, কেবল একটি মাত্র দেশই শয়তানী অর্থনীতি অনুসারে

পরিচালিত হয়না, বরঞ্চ বিশ্বের অসংখ্য দেশে এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রত্যেক দেশই নিজেকে দেউলিয়াপনা থেকে বাঁচানোর জন্যে, অন্য কথায় নিজের দেউলিয়াত্ব অপর কোনো দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জন্যে বাধ্য হয়ে পড়েছে। এভাবেই আরম্ভ হয় আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কয়েকটি রূপ ধারণ করে।

প্রথমত, প্রত্যেক দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে নিজের দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্যে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। প্রত্যেকেই স্বল্পতম ব্যয়ে অধিক পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা করে। তাই শ্রমিক কর্মচারীদের অত্যন্ত কম পারিশ্রমিক দেয়া হয়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক কারবারে সাধারণ জনগণ এতোটা কম আয় লাভ করে, যা দিয়ে তাদের প্রকৃত প্রয়োজনও পূরণ হয়না।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক দেশ নিজের পরিসীমা ও নিজ প্রভাব বলয়ের অধীন দেশসমূহে অপর দেশের পণ্য-সামগ্রী আমদানীর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। নিজের আয়ত্তাধীন সব ধরনের কাঁচামালের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, যাতে অপর কোনো দেশ তা হস্তগত করতে না পারে। এর ফলে শুরু হয় আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বসংঘাত যার পরিণতিতে বেজে উঠে যুদ্ধের দামামা।

তৃতীয়ত, যেসব দেশ অপর দেশ কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া দেউলিয়াত্বের বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেনা, তাদের উপর অসংখ্য লুটেবার দল হিংস্র স্বাপদের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা সে দেশে কেবল নিজ দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রি করে তাই নয় বরং নিজ দেশে যেসব ধনসম্পদ লাভজনক কাজে খাটানোর সুযোগ নেই, তাও অধিক মুনাফা লুটার উদ্দেশ্যে সেসব দেশে বিনিয়োগ করে। শেষ পর্যন্ত এসব দেশেও সেই একই সমস্যা সৃষ্টি হয়, যা প্রথমত নিজ দেশে অর্থ বিনিয়োগকারী দেশগুলোতে সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ যে পরিমাণ অর্থ তারা এসব দেশে বিনিয়োগ করে তা পুরোটা উদ্ধার হয়ে আসেনা। আবার এ বিনিয়োগ থেকে যে পরিমাণ আয়ই হাতে আসে তার একটা বড় অংশ তারা অধিকতর লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করে। শেষ পর্যন্ত দেশগুলোর ঘাড়ে ঋণের বোঝা এতোটা বৃদ্ধি পায়, যা গোটা দেশকে নগদ দামে বিক্রি করেও আদায় করা সম্ভব হয় না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এরূপ আবর্তন চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত গোটা বিশ্ব দেউলিয়া হয়ে পড়বে। তখন এই দেউলিয়াত্বের বোঝা চাপিয়ে দেবার মতো কোনো দেশই আর বিশ্বের বুকে অবশিষ্ট থাকবেনা। এমনকি শেষ পর্যন্ত অর্থ বিনিয়োগ এবং উদ্বৃত্ত পণ্য চালানোর জন্যে বুধ, বৃহস্পতি কিংবা মংগলগ্রহে ছুটোছুটি করতে হবে বাজারের সন্ধানে।

আরো কতিপয় ব্যবস্থা

এই সর্বগ্রাসী দ্বন্দ্বসংঘাতে ব্যাংক মালিক, আড়তদার, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ক্ষুদ্র একটি দল গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ এমনভাবে করায়ত্ত করে বসে আছে যে, তাদের মোকাবিলায় সমগ্র বিশ্বের মানবজাতি সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার দৈহিক শ্রম ও মনমস্তিষ্কের যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে স্বাধীনভাবে উপার্জনের কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্‌র এ

রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা জীবনসামগ্রী থেকে নিজের অংশ সংগ্রহ করা তার জন্যে একেবারেই দুষ্কর। ছোট ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক এবং সাধারণ কৃষিজীবীদের পক্ষে পরিশ্রম করে প্রয়োজন মেটানোর মতো উপার্জন করার কোনো সুযোগ-আজ আর অবশিষ্ট নেই। অর্থনৈতিক জগতের এ অধিপতিদের গোলাম, চাকর এবং মজুর হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। ওদিকে শিল্পপতি, পুঁজি-মালিক ও ব্যবসায়ীরা অপেক্ষাকৃত স্বল্প জীবিকার বিনিময়ে মানুষের দৈহিক ও মানসিক সকল শক্তি ও যোগ্যতা প্রতিভা এবং গোটা সময় ক্রয় করে নিচ্ছে। ফলে গোটা মানবজাতি এখন নিছক একটি অর্থনৈতিক পশুতে পরিণত হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক সংগ্রামের চাপে পড়ে নিজের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধন করা, ক্ষুধা নিবারণের চেয়ে উচ্চতর কোনো উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্যারোপ করা এবং জীবিকার সন্ধান ছাড়া অন্য কোন মহত্তর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিকে বিকশিত করা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে, এ শয়তানী ব্যবস্থার দরুন অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত এতোই কঠিন রূপ ধারণ করেছে যে, জীবনের অন্যসব দিক ও বিভাগ একেবারেই মুহ্যমান ও অকেজো হয়ে পড়েছে।

মানুষের আরো দুর্ভাগ্য যে, বিশ্বের নৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং আইন প্রণয়ন নীতিও এই শয়তানী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাবে চরমভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সকল দেশে নীতিশাস্ত্রের শিক্ষকবৃন্দ মিতব্যয়িতা ও ব্যয় সংকোচনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করছেন যা আয় হবে তার পুরোটা ব্যয় করাকে বোকামী এবং নৈতিক ত্রুটি বলে মনে করা হচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, স্বীয় আয়ের কিছু না কিছু অংশ বাঁচিয়ে তা ব্যাংকে জমা রাখতে হবে, কিংবা বীমা পলিসি ক্রয় অথবা কোন কোম্পানীর শেয়ার কিনতে হবে। বস্তুত মানবতার জন্যে যা ধ্বংসকর ও মারাত্মক, নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টিতে তাকেই আজ সত্য ও সৌন্দর্যের মাপকাঠি বানানো হয়েছে।

রাষ্ট্রশক্তির কথা আর কি বলবো? বাস্তবে রাজনীতি ও রাষ্ট্রশক্তি পুরোপুরিই শয়তানী ব্যবস্থার করায়ত্ত হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে যুল্‌ম ও শোষণ থেকে মানবতাকে রক্ষা করাই ছিল রাষ্ট্রশক্তির দায়িত্ব; কিন্তু আজ স্বয়ং রাষ্ট্রশক্তিই যুল্‌ম ও শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। চতুর্দিকে শয়তানের দোসররাই নিরংকুশভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে আছে।

একইভাবে বিশ্বের আইনকানুনও এ শয়তানী ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছে। এসব আইন কার্যত মানুষকে পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী বানিয়ে দিয়েছে। ফলে মানুষ যেভাবে পারে সমাজস্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যথেচ্ছ চেষ্টা করছে। উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈধঅবৈধ বাছবিচার প্রায় তিরোহিত হয়ে গেছে। অন্য লোকের সম্পদ শোষণ ও লুণ্ঠন করা কিংবা অন্যকে ধ্বংস করে নিজে অর্থশালী হবার সকল উপায় পন্থাকে আজ আইনের দৃষ্টিতে বৈধ করা হয়েছে। মদ উৎপাদন এবং মদের ব্যবসা, চরিত্রহীনতার আখড়া তৈরী করা, কামোদ্দীপক ফিল্ম বানানো, অশ্লীল ফিচার ও

প্রবন্ধ লেখা, যৌন উত্তেজনামূলক ছবি প্রকাশ করা, জুয়ার আড্ডা বসানো, সুদী প্রতিষ্ঠান কায়েম করা, জুয়ার নিত্য নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা, মোটকথা মানবতাকে ধ্বংসকারী যা কিছু করা হোক না কেন, এর কোনোটাই আইন বিরোধী নয়। আইন এসব করার শুধু যে অনুমতি দেয় তাই নয়; বরং এসব করার অধিকার সংরক্ষণের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। অতঃপর এসব উপায়ে অর্জিত ধনসম্পদ যখন কারো কাছে জমা হয়, তখন তার মৃত্যুর পরও যাতে উক্ত সম্পদ সেখানেই কুক্ষিগত থাকে, আইন তারও ব্যবস্থা করে দেয়।

এজন্যে আইনে জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার প্রথা [Rule of primogeniture], কোনো কোনো ক্ষেত্রে পালকপুত্র গ্রহণের বিধান এবং যৌথপরিবার প্রথার [Joint family system] ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব আইনের উদ্দেশ্য হলো, ধনভান্ডারের মালিক একটি অজগরের মৃত্যু হলে, আর একটি অজগরকে তার জায়গায় বসিয়ে দেয়া। আর দুর্ভাগ্যবশত সেই অজগর যদি কোনো বাচ্চা রেখে না যায়, তবে অন্যের একটি বাচ্চা ধার করে সেখানে বসিয়ে দেয়া হয়, যাতে সঞ্চিত ধনভান্ডার সমাজে ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

এসব কারণে আজ গোটা মানবজাতির জন্যে সৃষ্টি হয়েছে এক বিরাট জটিল ও দুরূহ সমস্যা। আল্লাহর এ দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রীর ব্যবস্থা কিভাবে করা যায়, আর প্রতিটি মানুষের সামর্থ্য, যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুযায়ী উন্নতি লাভ এবং স্বীয় ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার সুযোগ করে দেয়ার উপায়ই বা কি হতে পারে তার ব্যবস্থা করাই আজ মূল বিষয়।

সমাজতন্ত্রের প্রস্তাবিত সমাধান

সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের একটি রূপ পরিকল্পনা পেশ করেছে। সমাজতন্ত্রের মতে অর্থসম্পদ ও উৎপাদনের যাবতীয় উপায় উপকরণ ব্যক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জাতীয় মালিকানায় অর্পণ এবং ব্যক্তিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী বন্টন করার দায়িত্ব সমাজ সংগঠনের উপর ন্যস্ত করাই অর্থনৈতিক সমস্যার যথার্থ সমাধান। বাহ্য দৃষ্টিতে এ সমাধান খুবই যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। কিন্তু এর বাস্তব কার্যকারিতার উপর যতোই গভীর দৃষ্টি ফেলবেন, ততোই এর ত্রুটিসমূহ আপনার কাছে উন্মুক্ত হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত আপনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, যে রোগের চিকিৎসার জন্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, আসলে সেই রোগটির চেয়ে এ ব্যবস্থা অধিক মারাত্মক।

নতুন শ্রেণী

একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট, উৎপাদনের উপায় উপকরণের ব্যবহার এবং উৎপাদিত দ্রবসামগ্রী বন্টনের ব্যবস্থা তত্ত্বগত দিক থেকে [Theoretically] যতোই গোটা সমাজের হাতে ন্যস্ত করার কথা বলা হোকনা কেন, বাস্তবে তা একটি ক্ষুদ্র নির্বাহী সংস্থার [Executive] উপরই একান্তভাবে নির্ভর করতে হবে। প্রথমত এ ক্ষুদ্র

দলটি সমাজের [Community] দ্বারাই নির্বাচিত হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু যাবতীয় অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ যখন তাদের করায়ত্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জীবিকা বন্টন করার কাজ শুরু হবে, তখন অবশ্যই সমাজের প্রতিটি অধিবাসী তাদের মুষ্টিতে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় বন্দী হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় দেশে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করার সাহস পাবেনা। তাদেরকে ক্ষমতার মসনদ থেকে হটাতে পারে, এমন সংগঠিত কোনো শক্তিই তাদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ পাবেনা। কোনো ব্যক্তির উপর থেকে তাদের কৃপাদৃষ্টি উঠে গেলে সেই হতভাগার পক্ষে এই বিশাল পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার মত উপায় উপকরণ পাওয়ার কোনো অধিকারই থাকবে না। কেননা দেশের সমস্ত ধনসম্পদ ও উপায় উপকরণ তো সেই ক্ষুদ্র দলটিরই নিরংকুশ কর্তৃত্বাধীনে আবদ্ধ। তাদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বা তা অমান্য করে ধর্মঘট করার দুঃসাহস দেখানো কোনো শ্রমিক মজুরের পক্ষে সম্ভব হবেনা। কারণ সেখানে কলকারখানা এবং ক্ষেত খামারের মালিক থাকবে একটিই—একাধিক নয়; কাজেই একজনের কারখানায় অসুবিধা হলে আরেক মালিকের কারখানায় গিয়ে চাকুরী করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারেনা। সেখানে সারা দেশের কলকারখানা ও ক্ষেত খামারের মালিক তো কেবল সেই একটি মাত্র ক্ষুদ্র দল। সে আবার রাষ্ট্র-ক্ষমতারও মালিক। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার জনসমর্থন লাভের সম্ভাবনা থাকবেনা। এভাবে এই অর্থনৈতিক রূপ পরিকল্পনাটির চূড়ান্ত পরিণতি এই দাঁড়াবে যে, সকল ছোট বড় পুঁজিপতি, সকল কলকারখানার মালিক এবং সকল ক্ষেত খামারের অধিকারীদের খতম করে একমাত্র বড় পুঁজিপতি, একমাত্র বৃহৎ কারখানা মালিক ও একমাত্র বিরাট জমিদার সারা দেশের উপর একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে জেঁকে বসবে। বস্তুত এ বিরাট শক্তিধর দলটি একইসাথে 'জার' ও 'কাইজারের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা

এরূপ শক্তি ও প্রভুত্ব এবং এ ধরনের নিরংকুশ কর্তৃত্ব এমন এক জিনিস, যার নেশায় মত্ত হয়ে মানুষ শোষক, অত্যাচারী ও নিপীড়ক না হয়ে পারে না। বিশেষ করে এ ধরনের কর্তৃত্বের অধিকারীরা যদি আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর সম্মুখে একদিন নিজেদের কার্যকলাপের জবাবদিহী করার ধারণায় বিশ্বাসী না হয়, তাহলে তাদের নিপীড়নের আর কোনো সীমা পরিসীমাই থাকে না। তা সত্ত্বেও যদি ধরে নেয়া হয় যে, এরূপ সর্বময় ক্ষমতা করায়ত্ত করার পর এই ক্ষুদ্র দলটি সীমালংঘন করবেনা এবং সুবিচারের সাথেই যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে, তথাপিও এ ধরনের একটি ব্যবস্থার অধীনে ব্যক্তির পক্ষে তার ব্যক্তিত্বকে সর্বাংগীন বিকশিত করার কোনো সুযোগ থাকতে পারেনা। ব্যক্তিত্বকে উন্নতি ও ক্রমবিকাশ দান করার জন্যে মানুষের প্রয়োজন স্বাধীনতা। প্রয়োজন কিছু উপায় উপকরণের অধিকারী হওয়ার যাতে সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা মাফিক তার ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারে এবং সেগুলোকে নিজের ঝোঁক প্রবণতা অনুযায়ী কাজে লাগিয়ে নিজের সুপ্ত যোগ্যতা ও প্রতিভাকে বিকশিত করে

তুলতে পারে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর কোনো সম্ভাবনা নেই। সেখানে উপায় উপকরণ ব্যক্তির আয়ত্তে থাকেনা, থাকে সমাজের নির্বাহী সংস্থার হাতে। আর সেই নির্বাহী সংস্থা সমাজস্বার্থের যে ধারণা পোষণ করে সে অনুযায়ীই সেসব উপায় উপকরণকে ব্যবহার এবং প্রয়োগ করে। ব্যক্তি যদি সেই উপায় উপকরণের দ্বারা উপকৃত হতে চায়, তবে তাকে সেই সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ীই কাজ করতে হবে; শুধু তাই নয়, বরঞ্চ তাদের প্রস্তাবিত সামাজিক স্বার্থে কাজ করার উপযোগীরূপে গড়ে তোলার জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাদের হাতে সোপর্দ করতে হবে, যাতে করে তারা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে গড়ে তুলতে পারে। এ ব্যবস্থা কার্যত সমাজের সকল মানুষকে মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির হাতে এমনভাবে সমর্পণ করে দেয়, যেনো মানুষগুলো নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি সমাজের মানুষগুলোকে নিজেদের নীল নকশার ছাঁচে এমনভাবে ঢেলে সাজায় যেমনভাবে চর্মকার চামড়া কেটে জুতো তৈরী করে এবং কর্মকার লোহা গলিয়ে লৌহসামগ্রী তৈরী করে থাকে।

ব্যক্তিত্বের বলি

মানব সমাজ ও সভ্যতার জন্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অত্যন্ত মারাত্মক। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এ ব্যবস্থার অধীনে প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী সুবিচারের সাথেই বন্টন করা হবে, তবু এর উপকারিতা এর ক্ষতির তুলনায় একেবারেই নগণ্য। মানুষ বিভিন্নমুখী শক্তিসামর্থ্য ও যোগ্যতা প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে; সেগুলো পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়া এবং সম্মিলিত সমাজ জীবনে সে অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করার মধ্যেই সমাজ সভ্যতার সর্বাংগীন উন্নতি নির্ভরশীল। কিন্তু এসব সুযোগ সুবিধা লাভ করা এমন ব্যবস্থার অধীনে কখনো সম্ভব হতে পারেনা, যেখানে মানুষকে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঁচামালের মত ঢেলে কাটছাঁট করে গড়ে তোলা হয়। কতিপয় ব্যক্তি, তা তারা যতোই যোগ্য এবং সদিচ্ছাসম্পন্ন হোকনা কেন, কোনো অবস্থাতেই তাদের জ্ঞান ও দৃষ্টি এতোটা সর্বব্যাপী হতে পারেনা যে, লক্ষ কোটি মানুষের জন্মগত যোগ্যতা প্রতিভা এবং তাদের স্বভাবগত ঝোঁক প্রবণতার সঠিক পরিমাপ করা এবং সেগুলোকে বিকশিত করে তোলার যথার্থ পন্থা নির্ণয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। এটা একেবারেই অসম্ভব। এক্ষেত্রে তারা নিছক বিজ্ঞানের দিক থেকেও ভুল করতে পারে। আর সমাজের স্বার্থ এবং সামাজিক প্রয়োজন সম্পর্কে তাদের মানসিকতায় মানব-পরিকল্পনার যে পোকা কিলবিল করছে সেদিক থেকেও তারা তাদের অধীনস্থ গোটা ভূখন্ডের মানুষকে তাদের সেই ছাঁচেই ঢেলে সাজাতে চাইবে। এতে সমাজের যাবতীয় বৈচিত্র সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে এক প্রাণহীন সাদৃশ্য রূপান্তরিত হবে। এর ফলে বন্ধ হয়ে যাবে সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি ও ক্রমবিকাশ আর আরম্ভ হবে এক ধরনের সম্পূর্ণ কৃত্রিম স্থবিরতা। এতে মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা প্রতিভাসমূহ থেৎলে যাবে। অবশেষে দেখা দেবে এক মারাত্মক সামাজিক ও নৈতিক অধপতন। মানুষ তো আর বাগানের ঘাস কিংবা গুল্মলতা নয় যে, একজন মালি

তাকে কাটছাঁট করে সাজিয়ে রাখবে, আর মালির পরিকল্পনা অনুযায়ীই সে বড় হবে কিংবা ছোট হবে! প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র ক্রমোন্নতি লাভ করে তার নিজস্ব স্বাভাবিক গতিতে। এই স্বাভাবিক গতিকে হরণ করে অপর কেউ তাকে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী চালাতে চাইলে তা ক্রমোন্নতি লাভ করতে পারেনা। বরঞ্চ এমতাবস্থায় সে হয় বিদ্রোহ করবে আর না হয় শুষ্ক মৃতপ্রায় হয়ে থাকবে।

সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক সমস্যাকে মানব জীবনের মূল সমস্যা ধরে নিয়ে গোটা মানব জীবনকে ঘানির গরুর মতো এর চারপাশে ঘুরাতে চায়। মূলত এটাই সমাজতন্ত্রের মৌলিক ভ্রান্তি। জীবনের কোনো একটি সমস্যার ক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্রের দৃষ্টি স্বচ্ছ ও বাস্তবধর্মী নয়। বরঞ্চ সমাজতন্ত্র জীবনের সকল সমস্যাকে কেবল অর্থনীতির রংগীন চশমা দিয়েই দেখে থাকে। ধর্ম, নৈতিকতা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান মোটকথা নিজের পরিসীমার মধ্যে প্রতিটি দিক ও বিভাগকে সংকীর্ণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখা হয়। এই একরোখা ও একদেশদর্শী গোঁড়ামীপূর্ণ দৃষ্টিভংগির কারণেই সমাজতন্ত্রের আওতায় মানব জীবনের গোটা ভারসাম্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

ফ্যাসিবাদের সমাধান

সুতরাং পরিষ্কার হলো যে, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার কোনো সঠিক স্বাভাবিক সমাধান নয়। বরঞ্চ এ এক অস্বাভাবিক কৃত্রিম সমাধান। এর প্রতিকূলে আরেকটি সমাধান পেশ করেছে ফ্যাসিবাদ এবং জাতীয় সমাজতন্ত্র। এ মতবাদের দৃষ্টিতে জীবিকার উপকরণসমূহের উপর ব্যক্তির মালিকানা বহাল থাকবে তবে সমাজস্বার্থের খাতিরে তা রাষ্ট্রের মজবুত নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বাস্তবে এ ব্যবস্থার ফলাফল সমাজতন্ত্রের ফলাফল থেকে মোটেই ভিন্ন কিছু নয়। এ মতবাদও সমাজতন্ত্রের মতোই ব্যক্তিকে সমাজস্বার্থের কাছে বিলীন করে দেয় আর তা ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশের কোনো সুযোগই অবশিষ্ট রাখেনা। তাছাড়া যে রাষ্ট্র ব্যক্তি মালিকানা ও অধিকারকে নিজ অধিকারে কুক্ষিগত করে রাখে সেতো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতোই নিপীড়ক, অত্যাচারী ও বল প্রয়োগকারী হতে বাধ্য। একটি দেশের সকল ধনসম্পদ, ব্যবসা বাণিজ্য ও যাবতীয় উপায় উপকরণ নিজ কর্তৃত্বের অধীনে করায়ত্ত করে রাখা এবং নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল মানুষকে কাজ করতে বাধ্য করার জন্যে প্রয়োজন নিরংকুশ ক্ষমতা ও শক্তির। আর যে রাষ্ট্র এরূপ নিরংকুশ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হয়, তার হাতে দেশের সমগ্র অধিবাসীর সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়া এবং শাসকদের গোলামে পরিণত হওয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিত ব্যাপার।

ইসলামের সমাধান

এবার আমি আপনাদের সামনে অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলাম যে সমাধান দিয়েছে তা পেশ করতে চাই।

ইসলামের মূলনীতি

ইসলাম মানব জীবনের সকল সমস্যার ক্ষেত্রে তিনটি নীতি গ্রহণ করেছে। এক. ইসলাম মানব জীবনের স্বাভাবিক নিয়মনীতিগুলোকে যথাযথভাবে অক্ষুণ্ন রাখতে চায় এবং যেখানেই স্বাভাবিক পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটে, সেখানেই ইসলাম তার মোড় ঘুরিয়ে স্বাভাবিক পথের উপর এনে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

দুই. ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ ব্যবস্থায় কেবল বাহ্যিকভাবে কিছু নিয়ম বিধি চালু করে দেয়াই যথেষ্ট নয়। বরঞ্চ ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে নৈতিক চরিত্র গঠন ও মন মানসিকতার সংশোধনের উপর। কারণ এভাবেই মানব প্রবৃত্তির যাবতীয় খারাপ ও মন্দ ভাবধারার শিকড় কেটে দেয়া সম্ভব। বস্তুত এটি ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতি। ইসলামের সমাজ সংশোধন ও সংস্কার প্রচেষ্টার ভিত্তি এর উপরই প্রতিষ্ঠিত।

তিন. ইসলামের তৃতীয় মূলনীতি হলো, রাষ্ট্রীয় শক্তি ও আইনের প্রয়োগ কেবলমাত্র সর্বশেষ ও নিরুপায় মুহূর্তেই করা যাবে, তার পূর্বে নয়। ইসলামী শরীয়তের গোটা ব্যবস্থার মধ্যেই এই মূলনীতিটির নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

শয়তানের কুচক্রে পড়ে মানুষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করেছে সেগুলোর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ইসলাম কেবলমাত্র নৈতিক সংশোধনের এবং যতোটা সম্ভব রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও আইন প্রয়োগ না করার প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। 'জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা সাধনায় মানুষ স্বাধীন থাকবে'; 'স্বীয় শ্রম-মেহনতের মাধ্যমে মানুষ যা উপার্জন করবে তার উপর তার স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে' এবং 'মানুষের মধ্যে তাদের যোগ্যতা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে পার্থক্য ও তারতম্য করা হবে' প্রভৃতি দৃষ্টিভংগিকে ইসলাম ততোক্ষণ পর্যন্ত স্বীকৃতি প্রদান করে, যতোক্ষণ এগুলো স্বাভাবিকতার মধ্যে অবস্থান করবে। তাছাড়া ইসলাম এগুলোর উপর এমনসব বিধি নিষেধও আরোপ করে, যা সেগুলোকে স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করা এবং নিপীড়ন ও অবিচারের হাতিয়ারে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখে।

সম্পদ উপার্জন নীতি

প্রথমে জীবিকা বা সম্পদ উপার্জনের প্রশ্নটিই ধরা যাক। ইসলাম মানুষের এই স্বাভাবিক অধিকারকে স্বীকার করে যে, সে নিজের স্বভাব প্রকৃতির ঝোঁক প্রবণতা এবং সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী নিজেই নিজের জীবন সামগ্রীর সন্ধান করবে। কিন্তু ইসলাম মানুষকে তার জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্র বিনষ্টকারী কিংবা সমাজ ব্যবস্থা বিকৃতকারী কোনো উপায় পন্থা অবলম্বন করার অধিকার দেয়নি। ইসলাম জীবিকা উপার্জনের উপায় পন্থার ক্ষেত্রে হালাল হারামের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ইসলাম বেছে বেছে প্রতিটি ক্ষতিকর উপায় পন্থাকে হারাম করেছে। ইসলামী বিধান মতে মদ

এবং যাবতীয় মাদকদ্রব্য কেবল হারাম নয়, বরঞ্চ এগুলোর উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং সংরক্ষণও নিষিদ্ধ। যিনা ব্যভিচার, নাচগান এবং এ ধরনের অন্যান্য উপায় পন্থাকেও অর্থোপার্জনের বৈধ পন্থা বলে ইসলাম স্বীকার করেনা। উপার্জনের এমনসব উপায় পন্থাকেও ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে, যেগুলোতে একজনের লাভ বা স্বার্থসিদ্ধি নির্ভর করে অন্যদের কিংবা সমাজের ক্ষতি ও স্বার্থহানির উপর। ঘুষ, চুরি, জুয়া, ঠকবাজি ও প্রতারণামূলক ব্যবসা, মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মওজুদ করে রাখা, উপার্জনের উপায় উপকরণের উপর এক বা কতিপয় ব্যক্তির একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করা যাতে অন্যদের উপার্জনের চেষ্টা সাধনার পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে প্রভৃতি ধরনের উপায় পন্থা ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাছাড়া ইসলাম বেছে বেছে সেসব ব্যবসায় বাণিজ্য ও কায়কারবারকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, যেগুলো ধরনগত দিক থেকেই বিবাদ [Litigation] সৃষ্টিকারী, কিংবা যেগুলোর লাভ লোকসান নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে ভাগ্য বা ঘটনাচক্রের উপর অথবা যেগুলোতে উভয় পক্ষের স্বার্থ ও অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধিবিধান অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে যেসব পন্থায় মানুষ লক্ষপতি কোটিপতি হচ্ছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ পন্থাই এমন, যেগুলোর উপর ইসলাম কঠোর আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। ইসলাম উপার্জনের যেসব উপায় পন্থা বৈধ ঘোষণা করে, সেগুলোর পরিসীমার মধ্যে অবস্থান করে কাজ করলে সীমাহীন সম্পদ গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব।

ইসলামের স্বত্বাধিকার নীতি

কোনো ব্যক্তি বৈধ উপায়ে যে ধন সম্পদ উপার্জন করে তার উপর ইসলাম ব্যক্তির স্বত্বাধিকার অবশ্যই স্বীকার করে; কিন্তু উপার্জিত ধনসম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেয় নাই। বরঞ্চ তার উপর বিভিন্নভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। একথা সবারই জানা যে, উপার্জিত ধন সম্পদ ব্যবহার করার তিনটিই মাত্র পন্থা আছে। সেগুলো হলো ঃ

এক. খরচ বা ব্যয় করা,

দুই. লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করা এবং

তিন. মওজুদ করা।

সম্পদ ব্যবহারের এই তিনটি পন্থার উপর ইসলাম যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছে এবার আমি সংক্ষেপে সেগুলো তুলে ধরছি ঃ

১. ইসলামের ব্যয়নীতি

ব্যয়ের যেসব পন্থা পদ্ধতি নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত করে কিংবা যেগুলোর দ্বারা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইসলামে তা সবই নিষিদ্ধ। কেউ জুয়া খেলে নিজের অর্থ সম্পদ উড়াতে পারেনা। মদ্যপান ও ব্যভিচার করার অনুমতি ইসলামে নেই। গান, বাদ্য, নৃত্য এবং বাজে আনন্দ বিহার প্রভৃতিতে কেউ নিজের অর্থকড়ি খরচ করতে পারে না। কোন পুরুষ রেশমের পোশাক এবং সোনার অলংকার ব্যবহার করতে

পারবেনা। চিত্র এঁকে ঘরের দেয়াল সজ্জিত করতে পারবেনা। মোটকথা, ইসলাম ব্যয়ের এমনসব দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ তার প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার কাজে অর্থ ব্যয় করে।

অন্যদিকে ইসলাম অর্থ ব্যয়ের সেইসব পন্থা পদ্ধতিকে বৈধ রেখেছে, যার দ্বারা মানুষ মধ্যম ধরনের পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে পারে। এভাবে ব্যয় করার পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে ইসলাম তা পুণ্য ও সৎকাজে, জনকল্যাণের কাজে এবং সেইসব লোকদের সাহায্যার্থে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে যারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার মতো জীবিকা অর্জনে অসমর্থ। ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বোত্তম কর্মনীতি হলো, মানুষ হালাল পথে যা কিছু উপার্জন করবে, তা তার বৈধ ও যুক্তিসংগত প্রয়োজন পূরণার্থে ব্যয় করবে। এরপরও যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে তা অভাবগ্রস্তদের দান করবে যাতে তারা তাদের অপরিহার্য প্রয়োজনে তা খরচ করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যকে ইসলাম মহত্তম চরিত্রের মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করেছে এবং একটি মহান আদর্শ হিসেবে এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে। সমাজে যখনই ইসলামী নৈতিকতা বিজয়ী হবে, তখন সমাজ জীবনে সেইসব লোকদেরই সর্বাধিক সম্মানের চোখে দেখা হবে যারা ন্যায় পথে এবং সৎপথে তা ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যারা অর্থসম্পদ সঞ্চয় ও মওজুদ করে পুঞ্জিভূত করে রাখার চেষ্টা করে, কিংবা উপার্জিত সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশকে আরও সম্পদ লাভের কাজে খাটায়—সমাজে তাদের কোনো মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হবে না।

২. অর্থপূজার মূলোচ্ছেদ

কেবল নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে এবং সমাজের নৈতিক প্রভাব ও অনুশাসনের দ্বারা অস্বাভাবিক লোভ ও লালসাগ্রস্ত লোকদের অপরাধ প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব নাও হতে পারে। এতোসবের পরও সমাজে এমন লোক অবশিষ্ট থাকতে পারে যারা নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসম্পদকে আরো অধিক অর্থোপার্জনের কাজে বিনিয়োগ করতে প্রয়াস পাবে। তাই ইসলাম মানুষের এ প্রবণতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং প্রয়োজনের অধিক অর্থসম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতিপয় আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

উদ্বৃত্ত অর্থসম্পদ সুদের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করাকে ইসলামী আইনে অকাট্যভাবে হারাম করে দেয়া হয়েছে। আপনি যদি কাউকেও নিজের অর্থসম্পদ ঋণ প্রদান করে থাকেন তাহলে, ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ব্যয় করুক অথবা জীবিকা উপার্জনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করুক, সর্বাবস্থায়ই আপনি কেবল আপনার মূল অর্থ ফেরত পাবারই অধিকার রাখেন, মূলের চেয়ে বেশী নয়। এমনিভাবে ইসলাম যুলুম ও শোষণমূলক পুঁজিবাদী কর্মনীতির ভিত্তিমূল চূর্ণ করে দিয়েছে এবং সেই বড় হাতিয়ারটিকে সম্পূর্ণ ভোতা করে দিয়েছে যার মাধ্যমে পুঁজির মালিক শুধু তার পুজি খাটিয়ে সমাজের সমস্ত অর্থসম্পদ শুষে নিয়ে নিজের করায়ত্ত করার সুযোগ পায়।

কিন্তু উদ্বৃত্ত অর্থসম্পদকে নিজের ব্যবসা, শিল্প, কারিগরী কিংবা অন্যান্য কায়কারবারে বিনিয়োগ করা, অথবা অন্যদের কারবারে লাভ লোকসান অংশীদারিত্বের

ভিত্তিতে খাটানোর প্রক্রিয়াকে ইসলাম বৈধ ঘোষণা করেছে। আর এ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনাতিরিক্ত যে সম্পদ লোকদের হাতে জমা হবে, তার মন্দ প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ করার জন্যও ইসলাম আরও কিছু ব্যবস্থা প্রদান করেছে।

৩. সম্পদ বন্টন ও জননিরাপত্তা

ইসলাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসম্পদ সঞ্চয় ও মওজুদ করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলামের দাবী হলো, তোমার কাছে যা কিছু অর্থসম্পদ আছে, তা হয় নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় কর, না হয় কোনো বৈধ কারবারে বিনিয়োগ কর, অথবা অন্যদের দান করে দাও, যাতে তারা তা দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে পারে। ইসলাম চায় এভাবে সমস্ত অর্থসম্পদ সমাজের মধ্যে অবিরাম আবর্তিত হতে থাকুক। কিন্তু যারা এ কাজ করবেনা, বরঞ্চ অর্থসম্পদ জমা করতে থাকবে, তাদেরকে প্রতিবছর আইন অনুযায়ী সঞ্চিত অর্থ থেকে বার্ষিক ২.৫% ভাগ হারে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এ অর্থ সেইসব লোকের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হবে, যারা জীবিকা উপার্জনের সংগ্রামে অংশ নেবার যোগ্য নয়, কিংবা অংশ নেয়ার পরও নিজের প্রয়োজন মেটাবার মতো উপার্জন থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। ইসলামী পরিভাষায় এ ব্যবস্থার নাম হলো যাকাত। ইসলাম যাকাত আদায় ও বন্টনের যে ব্যবস্থা দিয়েছে তা হলো, যাকাত আদায় করে জনগণের যৌথ কোষাগারে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বায়তুল মালে জমা করা হবে। কোষাগার সেই সমস্ত লোকের প্রয়োজন পূরণের যিম্মাদার হবে, যারাই সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে। মূলতঃ যাকাত সামাজিক বীমার সর্বোত্তম ব্যবস্থা। সামাজিক সাহায্য সহযোগিতার সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার অভাবে যেসব অনিষ্ট ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, বায়তুল মালের ব্যবস্থা সেগুলোর মূলোচ্ছেদ করে দেয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে জিনিস মানুষকে সম্পদ সঞ্চয় এবং লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করতে বাধ্য করে এবং যার ফলে জীবনবীমা প্রভৃতি প্রয়োজন দেখা দেয়, তা হলো সেখানে প্রতিটি মানুষের জীবন কেবল নিজের উপায় উপাদানের উপরই নির্ভরশীল। সে ব্যবস্থায় কিছু সঞ্চয় না করলে বৃদ্ধ অবস্থায় না খেয়ে মরতে হয়। সন্তান সন্ততির জন্যে কিছু না রেখে গেলে তারা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করেও এক টুকরা রুটি জুটাতে পারেনা। কিছু সঞ্চয় না রেখে রোগাক্রান্ত হলে বিনা চিকিৎসায় মরতে হয়। এ ব্যবস্থায় যদি সঞ্চয় না থাকে আর হঠাৎ যদি ঘর পুড়ে যায়, ব্যবসা লাটে উঠে, কিংবা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় নিপতিত হয়, তাহলে আশ্রয় বা সাহায্য পাওয়া বা নির্ভর করার কোনো আশাই থাকে না।

একইভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষ পুঁজিপতিদের ক্রীতদাসে পরিণত হতে বাধ্য হয় এবং শ্রমিকরা পুঁজিপতিদের আরোপিত যাবতীয় অন্যায় শর্ত মেনে নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়, এর কারণও এটাই যে, পুঁজিপতি শ্রমের বিনিময়ে যে মজুরী দেয় তা মেনে না নিলে শ্রমিকদের বিবস্ত্র থাকতে হবে আর অনাহারে ধুকে ধুকে মরতে হবে। পুঁজিপতির 'দান' থেকে মুখ ফিরালে শ্রমিকের জন্যে দু'বেলার অন্ন জুটানো সম্ভব হবে না।

আধুনিককালে মানব জাতির ঘাড়ে চেপে বসে আছে পুঁজিবাদের আরো এক দুষ্ট অভিশাপ। একদিকে দারিদ্র্য আর ক্ষুধার জ্বালায় ধুকে ধুকে মরছে লক্ষ কোটি দরিদ্র অনাহারী মানুষ, আর অপরদিকে জমির অঢেল উৎপন্ন ফসল আর কারখানার উৎপাদিত বিপুল পণ্যসামগ্রীর ভাণ্ডার স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু দরিদ্র লোকদের পক্ষে তা ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না, ক্রয় করার ক্ষমতা তাদের নেই। এমনকি লক্ষ লক্ষ মন গম সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, অথচ অনাহারী মানুষের ভাগ্যে একমুঠো খাবার জুটছেনা। এ অভিশাপের প্রধান কারণ এই যে, সাহায্যের মুখাপেক্ষী মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছাবার মতো কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নেই। যদি এই দরিদ্র লোকদের মধ্যে ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি করা হতো, তবে শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষিসহ সকল ক্ষেত্রে মানুষের দক্ষতা ও নৈপুণ্য আরো অধিক বিকশিত হতো।

ইসলাম যাকাত এবং বায়তুলমালের মাধ্যমে এ ধরনের সকল অনিষ্টের মূলোচ্ছেদ করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল প্রতিটি মুহূর্ত একজন সাহায্যকারী বন্ধুর মতো প্রত্যেক মানুষের পাশে অবস্থান করে। ভবিষ্যতের চিন্তায় চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। প্রয়োজন হলে যে কোনো লোক বায়তুল মালে গিয়ে নিজের অধিকার আদায় করে নিতে পারে। এ অবস্থায় ব্যাংক ডিপোজিট এবং বীমা পলিসির আর কি প্রয়োজন থাকতে পারে? হতে পারে আপনি শিশুসন্তান রেখে ইহকাল ত্যাগ করছেন। কিন্তু দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আপনি নিশ্চিন্তে পরপারে পাড়ি জমান। আপনার পরে আপনার সন্তানদের সকল দায়িত্ব বহন করবে বায়তুলমাল। রোগগ্রস্ততা, বৃদ্ধাবস্থা, আসমানী এবং যমীনী বিপদ, মোটকথা, সর্বাবস্থায় বায়তুলমাল আপনার সার্বক্ষণিক সাহায্যকারী, যার উপর নির্দ্বিধায় নির্ভর করতে পারেন। পুঁজিপতির যে কোনো অন্যায় শর্ত মেনে নিয়ে আপনাকে তার কাজ করতে বাধ্য হতে হবে না। বায়তুলমালের বর্তমানে আপনার ক্ষুধার্ত থাকা, বিবস্ত্র থাকা এবং নিরুপায় হবার কোনো ভয় নাই। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল এমন ব্যক্তিকেই প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী ক্রয় করার যোগ্য বানিয়ে দেয়, যারা অর্থ উপার্জনের সম্পূর্ণ অযোগ্য, কিংবা প্রয়োজনের চেয়ে কম উপার্জন করে থাকে। এভাবেই পণ্য উৎপাদন ও বন্টনের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই কোনো দেশের দেউলিয়াত্বকে অন্যদেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্যে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ানো এবং অবশেষে গ্রহলোক পর্যন্ত দৌড়াবার কোনো প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকবেনা।

কিছু কিছু ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে পড়া অর্থসম্পদ সমাজে ছড়িয়ে দেবার জন্যে ইসলাম যাকাত ছাড়াও অন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছে, তা হলো উত্তরাধিকার আইন। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য আইনের প্রবণতা হলো, কোন ব্যক্তি সারাজীবন ধরে যতো অর্থসম্পদ পুঞ্জিভূত করেছে, তার মৃত্যুর পরও তাকে একইভাবে পুঞ্জিভূত রাখা। পক্ষান্তরে ইসলাম, কোনো ব্যক্তি সারাজীবন গুণে গুণে যে অর্থসম্পদ পুঞ্জিভূত করেছে, তার মৃত্যুর পর তা অন্যদের মধ্যে বিলি বন্টন করে দেয়ার নীতি গ্রহণ করেছে। ইসলামী আইনে পুত্র কন্যা, বাবা মা, স্ত্রী, ভাইবোন—এরা সবাই এক ব্যক্তির

উত্তরাধিকার এবং তার রেখে যাওয়া সম্পদ একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম বিধি অনুযায়ী এদের মধ্যে বন্টিত হওয়া জরুরী। কোনো নিকটাত্মীয় বর্তমান না থাকলে দূর আত্মীয়ের সন্ধান করা হবে এবং সম্পদ তাদের মধ্যে বিলি বন্টন করা হবে। নিকটের বা দূরের কোনো আত্মীয় যদি বর্তমান না থাকে তবে পালকপুত্র গ্রহণ করে তাকে সম্পদের একচ্ছত্র মালিক বানিয়ে দেবার অধিকার ইসলাম কাউকে প্রদান করে না। কেউ যদি কাছের বা দূরের কোনো আত্মীয় না রেখে মারা যায়, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজই তার সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী। তার পুঞ্জিভূত করে রেখে যাওয়া সমস্ত অর্থসম্পদ জাতীয় কোষাগার বায়তুলমালে জমা করা হবে। এভাবে কোনো ব্যক্তি যদি বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থসম্পদও পুঞ্জিভূত করে, তার মৃত্যুর পর দুই তিন পুরুষ সময়কালের মধ্যেই তা বহু ছোট ছোট ভাগে খন্ড বিখন্ড ও বিভক্ত হয়ে সমাজে ছড়িয়ে পড়বে। এমনি করে সম্পদের প্রতিটি পুঞ্জিভূত ভাণ্ডার ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত ও বিকেন্দ্রীভূত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে ঘরে ঘরে।

ভাববার বিষয়

অর্থব্যবস্থার অতি ক্ষুদ্র একটি চিত্র এখানে আমি উপস্থাপন করলাম। এর উপর আপনারা চিন্তাভাবনা করে দেখুন। শয়তানের ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে ব্যক্তিমালিকানায় যেসব অনিষ্ট দেখা দেয় ইসলামী অর্থব্যবস্থা কি তা সবই বিদূরিত করে দেয়না? তাহলে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, কিংবা ফ্যাসিবাদী অর্থনীতি, কিংবা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করে অর্থব্যবস্থার এমন কৃত্রিম প্রক্রিয়া অবলম্বন করার কোনো প্রয়োজন আছে কি? বিশেষ করে যেসব ব্যবস্থা কোনো একটি অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম তো নয়ই, বরঞ্চ তদস্থলে সৃষ্টি করে আরো অসংখ্য বিপর্যয়। এখানে আমি পুরো ইসলামী অর্থব্যবস্থার কথা আলোচনা করিনি। ভূমি ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক বিরোধের [Trade Disputes] মীমাংসা এবং শিল্প ও কৃষির জন্যে ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী পুঁজি সংগ্রহ সরবরাহের যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে এবং যার পূর্ণ অবকাশ ইসলামে রয়েছে তার পূর্ণাংগ রূপরেখা এ স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ইসলাম যেভাবে আমদানী রফতানী শুল্ক এবং দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়িক পণ্যের চলাচলের উপর শুল্কের কড়াকড়ি শিথিল করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অবাধ চলাচল ও বিনিময়ের পথ উন্মুক্ত করেছে, সে বিষয়েও আমি এ নিবন্ধে আলোচনা করতে পারিনি। এগুলোর চেয়ে একটি বড় বিষয় এখানে বলার সুযোগ পাইনি। তা হলো রাষ্ট্র পরিচালনা, সিভিল সার্ভিস এবং সামরিক খাতে যথাসম্ভব ব্যয় সংকোচন করে এবং আদালতের স্ট্যাম্প ডিউটি প্রথার মূলোচ্ছেদ করে ইসলাম সমাজের ঘাড় থেকে বিরাট অর্থনৈতিক বোঝা হালকা করে দিয়েছে। করলব্ধ আয়কে মাথাভারী প্রশাসনিক খাতে ব্যয় করার পরিবর্তে সমাজের কল্যাণ ও সুখ শান্তির কাজে ব্যয় করার বিরাট সুযোগ ইসলাম করে দিয়েছে। এগুলোর ফলে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানব সমাজের জন্যে পরিণত হয় এক বিরাট রহমত ও আশীর্বাদে। অন্ধ বিদ্বেষ পরিহার করে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অজ্ঞতাপূর্ণ সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি এবং পৃথিবীব্যাপী

প্রতিষ্ঠিত ইসলাম বিরোধী শাসন ব্যবস্থার তীব্র প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যদি স্বাধীন বিবেক বিবেচনার দৃষ্টিতে ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে অধ্যয়ন করা হয়, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস একজন বিবেকবান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকেও এমন পাওয়া যাবেনা, যিনি মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্যে এ ব্যবস্থাকে অধিকতর উপকারী, বিশুদ্ধ ও যুক্তিসংগত বলে স্বীকার করবেন না। কিন্তু কারো মন মগজে যদি এরূপ কোনো ভ্রান্তধারণা জন্ম নেয় যে, ইসলামের গোটা বিশ্বাসগত, নৈতিক চরিত্রগত এবং সমাজ ব্যবস্থাগত কাঠামোর মধ্য থেকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে সাফল্যের সাথে পরিচালনা করা যেতে পারে, তবে আমি নিবেদন করবো, দয়া করে এই ভ্রান্ত ধারণা মনমগজ থেকে ধুয়ে মুছে বের করে ফেলুন। ইসলামের অর্থনীতি এর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, আইন ও বিচার বিভাগীয় এবং সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এসবগুলোর ভিত্তি ইসলামের নৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নৈতিক ব্যবস্থাও আবার স্বয়ংক্রিয় নয়। বরঞ্চ তা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এক সর্বজ্ঞানী সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর সম্মুখে জবাবদিহী করার দৃঢ় বিশ্বাসের উপর । মৃত্যুর পর আখিরাতে আল্লাহর আদালতে পার্থিব জীবনের সমস্ত কার্যকলাপ বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হবে এবং এই বিচার অনুযায়ী শাস্তি অথবা পুরস্কার লাভের উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। স্বীকার করে নিতে হবে মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নৈতিক ও আইনগত যে বিধি ব্যবস্থা পৌঁছে দিয়েছেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার একটি অংশ, তা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহরই হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই আকীদা বিশ্বাস, নৈতিক ব্যবস্থা এবং পূর্ণাংগ জীবন যাপন পদ্ধতিকে হুবহু গ্রহণ না করলে শুধুমাত্র ইসলামের অর্থব্যবস্থা তার সঠিক স্পিরিট অনুযায়ী একদিনও চলতে পারবেনা এবং তা দ্বারা সত্যিকার কোনো কল্যাণ লাভ করা সম্ভব হবেনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআনের অর্থনৈতিক নির্দেশনা

১. মৌলিক তত্ত্ব

মানুষের জীবিকা ও অর্থনীতি সম্পর্কে একেবারে প্রাথমিক ও মৌলিক কথা হলো যে, মহান আল্লাহই মানুষের জীবিকা ও অর্থনীতির সমুদয় উপায় উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সেগুলোকে এমনভাবে এবং এমন প্রাকৃতিক বিধানের উপর সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে সেগুলো মানুষের জন্যে উপকারী ও কল্যাণবহ হয়েছে। তিনিই মানুষকে এসব থেকে ফায়দা লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সেগুলো ব্যয় ব্যবহার করার ক্ষমতা দান করেছেন। এই প্রকৃত সত্যকথা ও মৌলিক তত্ত্বকে আল কুরআন অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে বারবার উল্লেখ করেছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ٥ (الملك : ١٥)

"তিনিই যমীনকে তোমাদের জন্যে বাধ্যগত ও বশীভূত করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা এর প্রশস্ততার উপর চলাচল কর এবং আহার কর তাঁর প্রদত্ত জীবিকা থেকে। আর (জেনে রেখো) তোমাদের পুনরায় জীবিত হয়ে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।" [আল মুলক ঃ ১৫]

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهَارًا ۚ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ـ (الرّعد : ٣)

"আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন, তাতে পাহাড় বানিয়েছেন আর প্রবাহিত করে দিয়েছেন সমুদ্র ও নদ নদী। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন সব ধরনের ফল ফলাদি দুই দুই প্রকার।" [আর রা'দ ঃ ৩]

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ـ (البقرة : ٢٩)

"তিনি তোমাদের জন্যে সেই সবই সৃষ্টি করেছেন, যা পৃথিবীতে রয়েছে।"
[আল বাকারা ঃ ২৯]

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ وَسَخَّرَ لَكُمُ

الْاَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۔ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۔

"তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী, আর আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন পানি। অতপর এরই সাহায্যে তোমাদের জীবিকার জন্যে সৃষ্টি করেছেন নানারকম ফলফলাদি। নৌযানকে তিনি তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, যাতে করে তাঁরই নির্দেশে তা সমুদ্রে চলাচল করে। তিনি সমুদ্রকেও তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। তিনি সূর্য-চাঁদকেও তোমাদেরই কল্যাণার্থে একটি নিয়মের অধীনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, সেভাবেই তারা আবর্তিত হচ্ছে। আমি তোমাদের স্বার্থেই রাত দিনকে একটি বিধানের অধীন করে দিয়েছি। আর তোমরা যা কিছু চেয়েছো,[১] তা সবই তোমাদের দিয়েছি। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহরাজি গুণতে চাইলে গুণতে পারবেনা।" [সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩২-৩৪]

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۔ (الاعراف : ١٠)

"আমরা পৃথিবীতে তোমাদের কর্তৃত্ব দান করেছি এবং সেখানেই তোমাদের জন্যে জীবনের উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছি।" [আল আ'রাফ ঃ ১০]

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۔ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۔

"তোমরা কি তোমাদের কৃষি খামারের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখেছো? এই যে তোমরা বীজ বপন কর, তা থেকে [গাছ ও ফসল] তোমরা উৎপাদন কর, নাকি আমি?" [আল ওয়াকিয়া ঃ ৬৩-৬৪]

২. বৈধ অবৈধের সীমা নির্ধারণের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহর

এই মৌলিক তত্ত্বের ভিত্তিতে কুরআন মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত উপায় উপকরণসমূহ উপার্জন ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হবার অধিকার রাখেনা। তাছাড়া নিজের খেয়াল খুশী মতো হালাল হারাম এবং বৈধ অবৈধের সীমা নির্ধারণ করার বৈধ অধিকারও তার নেই। বরঞ্চ তার জন্যে সীমা নির্ধারণ করবার একচ্ছত্র অধিকারী কেবলমাত্র আল্লাহ। আরবের প্রাচীন মাদ্ইয়ান জাতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাগামহীন উপার্জন ও ব্যয় করার দাবীদার ছিলো। তাদের এ দৃষ্টিভংগির জন্যে কুরআনে তাদের তিরস্কার করা হয়েছে ঃ

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ
فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۔ (هود : ٨٧)

---

১. "অর্থাৎ যা কিছুর তোমরা মুখাপেক্ষী এবং বর্তমানে তোমরা যা কিছু চাও। অতীতের চাওয়া না চাওয়াতে কিছু যায় আসেনা।" বায়দাবী, আনোয়ারুত তানযীল ৩য় খণ্ড ১৬১ পৃষ্ঠা। মুস্তফা আলবাবী, মিশর ১৩৩০ হিঃ (১৯১২ ইং)।

"তারা বললো ঃ হে শুয়াইব! তোমার নামায কি তোমাকে এই নির্দেশই দেয় যে, আমাদের পুরুষানুক্রমে পূজা করে আসা মা'বুদদের আমরা পরিত্যাগ করবো, কিংবা আমাদের অর্থসম্পদের বিষয়ে আমরা নিজেদের ইচ্ছেমতো যা কিছু করতে চাই, তা করতে পারবোনা?" [সূরা হুদ ঃ ৮৭]

নিজের খেয়াল খুশীমতো কোনো জিনিসকে হারাম এবং কোনো জিনিসকে হালাল বলাকে কুরআন 'মিথ্যাকথা' বলে ঘোষণা করে ঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ - (النحل: ١١٦)

"আর তোমরা তোমাদের মুখের কথা দিয়ে মিথ্যা হুকুম জারি করোনা যে, এটা হালাল আর ওটা হারাম।"[২] [আন নহল ঃ ১১৬] কুরআন এরূপ নির্দেশ জারি করার অধিকার আল্লাহ এবং [তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে] তাঁর রাসূলের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ঃ

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ (الاعراف: ١٥٧)

"সে [রাসূল] তাদেরকে ভালো ও কল্যাণের নির্দেশ দেয় আর মন্দ ও অকল্যাণ থেকে বিরত রাখে। তাদের জন্যে পবিত্র জিনিসকে হালাল এবং অপবিত্র নোংরা জিনিসকে হারাম করে। আর তাদের উপর থেকে সেসব বোঝা নামিয়ে দেয় যেগুলো তাদের উপর চাপানো ছিলো এবং সেসব বন্ধন খুলে দেয় যেগুলোর দ্বারা তারা বন্দী ছিলো।" [আল আ'রাফ ঃ ১৫৭]

৩. আল্লাহ-নির্ধারিত সীমার ভেতরে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি

কুরআন আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানার অধীনে এবং তাঁর আরোপিত সীমারেখার ভেতরে ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকার করে ঃ

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ - (النساء: ٢٩)

"তোমরা অবৈধ পন্থায় একে অপরের অর্থসম্পদ ভোগ-ভক্ষণ করোনা। তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তোমাদের মাঝে লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্য হতে পারে।" [আন নিসা ঃ ২৯]

---

২. এ আয়াত নিজের খেয়ালখুশী মতো হারাম হালালের ফয়সালা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করছে। [বায়দাবী ৩য় খন্ড ১৯৩ পৃষ্ঠা]।
আল্লামা আলূসী তাঁর বিখ্যাত তাফসীর রুহুল মুয়ানীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ "এ আয়াতের সারকথা হলো, যে জিনিস হালাল বা হারাম হবার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো হুকুমই পৌছেনি, তোমরা সেটাকে হালাল বা হারাম কিছুই বলবেনা। এমনটি করলে তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী বলে গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া আর কিছুই হালাল হারাম নির্ণয়ের মাণদন্ড নয়।"
[রুহুল মুয়ানী ১৪শ খন্ড ২২৬ পৃষ্ঠা মুনীরিয়া মুদ্রণালয়, মিশর, ১৩৪৫ হিঃ]

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا - (البقرة: ٢٧٥)

"আল্লাহ ব্যবসায়কে বৈধ করেছেন আর অবৈধ করে দিয়েছেন সুদকে।" [আল বাকারা ঃ ২৭৫]

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ - (البقرة: ٢٧٩)

"তোমরা যদি সুদ নেয়া থেকে ফিরে আস [তওবা কর] তবে নিজেদের মূলধন ফেরত নেবার অধিকার তোমাদের রয়েছে।" [আল বাকারা ঃ ২৭৯]

اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ - (البقرة: ٢٨٢)

"যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে লেনদেনের [ঋণ দেয়া নেয়ার] ফয়সালা করবে, তখন তার দলিল দস্তাবিজ লিখে নিও।" [আল বাকারা ঃ ২৮২]

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ - (البقرة: ٢٨٣)

"যদি তোমরা ভ্রমণরত থাক আর [ঋণ লেনদেনের দলিল দস্তাবিজ লেখার জন্যে] কোনো লেখক না পাও, তবে সাথে সাথে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় এমন বস্তু বন্ধক রেখে কার্য সম্পাদন কর।" [আল বাকারা ঃ ২৮৩]

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ - (النساء: ٧)

"পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত অর্থসম্পদে পুরুষের অংশ রয়েছে। মহিলাদেরও অংশ রয়েছে পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া অর্থসম্পদে।" [আন নিসা ঃ ৭]

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا - (النور: ٢٧)

"অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে প্রবেশ করোনা।" [আন নূর ঃ ২৭]

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ - (يٰس: ٧١)

"ওরা কি দেখেনা, আমরা তাদের জন্যে নিজের হাতে বানানো জিনিসগুলোর মধ্যে গৃহপালিত পশুও সৃষ্টি করেছি, আর তারা সেগুলোর মালিক হয়েছে?" [সূরা ইয়াসীন : ৭১]

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا - (المائدة: ٣٨)

"পুরুষ চোর এবং নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও।" [আল মায়িদা ঃ ৩৮]

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ - (الانعام: ١٤١)

"ফসল কাটার দিন [জমির উৎপাদন থেকে] আল্লাহর অধিকার পরিশোধ কর।" [আল আনআম ঃ ১৪১]

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ـ (التوبة : ١٠٣)

"হে নবী! তাদের অর্থসম্পদ থেকে যাকাত আদায় কর।" [আত তওবা ঃ ১০৩]

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ .... وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ـ (النساء : ٢)

"আর এতীমদের অর্থসম্পদ তাদের হাতে অর্পণ কর। এবং তাদের অর্থসম্পদ নিজের অর্থসম্পদের সাথে মিশ্রণ করে ভক্ষণ করোনা।" [আন নিসা ঃ ২]

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ـ (النساء : ٢٤)

"এই [নিষেধ করা মহিলাদের] ছাড়া আর যতো মেয়ে মানুষ রয়েছে, তাদেরকে নিজেদের অর্থসম্পদের বিনিময়ে হাসিল করা তোমাদের জন্যে বৈধ করে দেয়া হয়েছে, যদি তোমরা তাদেরকে বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিত কর এবং অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন না কর।" [আন নিসা ঃ ২৪]

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ـ (النساء : ٤)

"আর সন্তুষ্টচিত্তে স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর পরিশোধ করে দাও।" [আন নিসা ঃ ৪]

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ـ (النساء : ٢٠)

"[বিয়ের সময়] স্ত্রীকে অঢেল অর্থসম্পদ দিয়ে থাকলেও [তালাক দেয়ার সময়] তা থেকে কিছুই ফেরত নেবেনা।" [আন নিসা ঃ ২০]

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ـ (البقرة : ٢٦١)

"যারা নিজেদের অর্থসম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাদের এই ব্যয়ের উপমা হলো এমন, যেমন একটি বীজ বপন করা হলো এবং তার থেকে বের হলো সাতটি ছড়া।" [আল বাকারা ঃ ২৬১]

تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ـ (الصف : ١١)

"আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের অর্থসম্পদ ও জানপ্রাণ দিয়ে।" [আস সফ ঃ ১১]

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ـ (الذاريٰت : ١٩)

"আর তাদের অর্থসম্পদে অধিকার রয়েছে প্রার্থী [সাহায্যপ্রার্থী] ও বঞ্চিতদের।" [সূরা যারীয়াত ঃ ১৯]

উল্লেখিত নির্দেশ ও উপদেশসমূহের একটিও ব্যক্তিমালিকানাবিহীন অবস্থায় ধারণা

পর্যন্ত করা যেতে পারেনা। কুরআন এমন এক অপরিহার্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পেশ করে, যা সার্বিক পর্যায়ে ব্যক্তির মালিকানাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী [Consumer goods] এবং উৎপাদন মাধ্যম [Means of Production]-এর মধ্যে বিভক্তি টেনে কেবলমাত্র প্রথমোক্তটি পর্যন্ত ব্যক্তিমালিকানাকে সীমিত রাখা এবং শেষোক্তটি পর্যন্ত জাতীয়করণ করার ধারণা করার কোনো সুযোগ এতে নাই। একইভাবে এতে শ্রমের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থসম্পদ [Earned Income] এবং বিনা পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থসম্পদ [Unearned Income]-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়না। যেমন, একথা সবারই জানা যে, কোনো ব্যক্তি বাবা মা, সন্তান সন্ততি, স্বামী বা স্ত্রী কিংবা ভাইবোন থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে অর্থসম্পদ লাভ করে তা তার শ্রমের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ নয়, আর যাকে যাকাত দেয়া হয়, তার জন্যেও তার প্রাপ্ত যাকাতের অর্থ শ্রমের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ নয়। তাছাড়া এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধারণারও নাম গন্ধ পাওয়া যায়না যে, তা কেবল একটি অস্থায়ী সময়কালের জন্যে। আর প্রকৃত উদ্দেশ্য এমন একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়া, যেখানে পৌঁছে ব্যক্তিমালিকানা খতম করে জাতীয় মালিকানা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। এটাই যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য হতো, তবে অবশ্যি কুরআন তা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিতো এবং সে ব্যবস্থা সম্পর্কে উপদেশ ও নির্দেশাবলী প্রদান করতো। আল কুরআনের সূরা আ'রাফের--

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ - "যমীন আল্লাহর" [আয়াত ঃ ১২৮] আয়াত থেকে 'ব্যক্তিগত মালিকানা বাতিল এবং জাতীয় মালিকানা স্বীকৃত'—এরূপ অর্থ উত্থাপন করার কোন অবকাশ নেই। কুরআন তো একথাও বলে ঃ

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ -

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছুই আছে সব আল্লাহ্র।" [আল বাকারা ঃ ২৮৪] এর থেকে এরূপ অর্থ বের করা যেতে পারেনা যে, পৃথিবী ও আকাশের কোনো কিছুতেই ব্যক্তিমালিকানা থাকবেনা এবং টেনে হিঁচড়ে এ অর্থও বের করা যেতে পারেনা যে, সবকিছুই জাতীয় মালিকানায় থাকবে। আল্লাহ্র মালিকানা যদি মানব মালিকানার অস্বীকৃতি হয়ে থাকে, তবে তা অবশ্যি ব্যক্তিমালিকানা এবং জাতীয় মালিকানা উভয়টার জন্যেই অস্বীকৃতিবোধক হতে হবে। সূরা হামীম আস্ সাজদার ঃ

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ - سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ -

"আর তিনি তাতে পূর্ণ চারদিনে প্রার্থীদের প্রত্যেকের প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত করে রেখেছেন" [আয়াত ঃ ১০]। এই আয়াতটি থেকেও এরূপ যুক্তি গ্রহণ করা কিছুতেই সঠিক নয় যে, "কুরআন পৃথিবীর সমুদয় খাদ্য উপকরণকে সকল মানুষের জন্যে সমবন্টন করতে চায়, আর এ সাম্য জাতীয় মালিকানা ছাড়া প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুতরাং জাতীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করাই কুরআনের লক্ষ্য।" আয়াতটির অনুবাদ যদি এমনটি ধরেও নেয়া হয় যে ঃ "আল্লাহ পৃথিবীতে খাদ্য উপকরণসমূহ চারদিনে

একটি পরিমাণ মতো রেখে দিয়েছেন, যা সব প্রার্থীর জন্যে সমান সমান,"[৩]-- সেক্ষেত্রেও "সব প্রার্থী" দ্বারা শুধু মানুষ অর্থ করা সঠিক হতে পারেনা। মানুষ ছাড়া সেইসব প্রাণীও প্রার্থী যাদের জীবকার উপকরণ আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীতেই রেখে দিয়েছেন। এ আয়াতের দৃষ্টিতে সব প্রার্থীর অংশ যদি সমান সমানই হয়, তবে এই সাম্যের অধিকার কেবলমাত্র মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট হবার কোনো দলীল নেই। এমনি করে কুরআনের যেসব আয়াতে দুঃস্থদের জীবিকা পৌঁছানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, সেসব আয়াত দ্বারাও এ যুক্তি গ্রহণ করা যেতে পারেনা যে, এ উদ্দেশ্যে কুরআন জাতীয় মালিকানার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কুরআন যেখানেই এই প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছে, সেখানেই তা পূরণ করার জন্যে একটিই মাত্র প্রক্রিয়ার কথা বলে দিয়েছে। তা হলো, সমাজের সচ্ছল ব্যক্তিরা নিজেদের দরিদ্র আত্মীয় স্বজন, এতীম, মিসকীন এবং অন্যান্য বঞ্চিত ও অসচ্ছল লোকদের জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেরাও ব্যক্তিগতভাবে উদার প্রাণে ব্যয় করবে আর রাষ্ট্রও তাদের অর্থসম্পদ থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ আদায় করে এ কাজে ব্যয় করবে। উল্লেখিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে এই বাস্তব কর্মপন্থা অবলম্বন করা ছাড়া অপর কোনো পন্থা পদ্ধতির ধারণাটুকু পর্যন্ত কুরআনে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

সন্দেহ নেই, কোনো বিশেষ জিনিসকে ব্যক্তিগত পরিচালনার পরিবর্তে জাতীয় পরিচালনায় নেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হলে কুরআনের কোনো নির্দেশ প্রতিবন্ধকও নয়। তবে ব্যক্তিমালিকানার সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি এবং জাতীয় মালিকানার দৃষ্টিভংগিকে একটি দর্শন ও ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা--কুরআন মানুষের জন্যে যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দিয়েছে, তার সাথে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আর কুরআন মানব সমাজের জন্যে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রস্তাব করেছে, তার দৃষ্টিতে কোনো জিনিসকে ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে জাতীয় মালিকানায় নেয়া প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্ত নেয়া কোনো দল বা পার্টির কাজ নয়। বরঞ্চ জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত সদস্যদের একটি মজলিসে শূরাই কেবল এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে পারে।[৪]

---

৩. এরূপ অনুবাদ মোটেও সঠিক নয়। আয়াতটির মূল শব্দগুলো হলো এরূপ ঃ

فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاۤءً لِّلسَّاۤئِلِيْنَ -

আল্লামা যমখশরী, বায়দাবী, রাযী, আলূসী এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণ এখানে سَوَاۤءً শব্দের সম্পর্ক اَيَّام শব্দের সাথে স্থাপন করেছেন এবং অর্থ করেছেন ঃ পূর্ণ চারদিনে আল্লাহ তা'আলা এ কাজ করেছেন। যেসব মুফাসসির سَوَاۤءً শব্দের সম্পর্ক لِلسَّاۤئِلِيْنَ শব্দের সাথে স্থাপন করেছেন তারা এর অর্থ করেছেন ঃ "সব প্রার্থীর জন্যে সরবরাহ করেছেন" অথবা "সব প্রার্থীর প্রার্থনা অনুযায়ী।" অধিক ব্যাখ্যার জন্যে দ্রষ্টব্য ঃ তাফহীমুল কুরআন, সূরা হামীম আস সাজদা, টীকা ঃ ১২।

৪. কুরআনের প্রস্তাবিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিস্তারিত রূপ অবগত হবার জন্যে আমার প্রণীত 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪. অর্থনৈতিক সাম্যের অস্বাভাবিক ধারণা

মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রকৃতির একটি অপরিহার্য দিক হিসেবেই কুরআন এ সত্যকে উপস্থাপন করেছে যে, অন্য সব জিনিসের মতোই মানুষের মাঝে জীবিকা এবং জীবনোপকরণের সমতা অবর্তমান। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার কৃত্রিম অসাম্য নয়, এই প্রাকৃতিক অসাম্য কুরআন মহান আল্লাহর কৌশলগত বিবেচনা এবং তাঁর বন্টন ব্যবস্থার [Dispensation] ফলশ্রুতি বলে আখ্যায়িত করে। তাঁর গোটা স্কীমের মধ্যে কোথাও এমন ধারণার চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না যে, এই অসাম্যকে নির্মূল করে এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর কাম্য, যেখানে সবাই সাম্যের ভিত্তিতে জীবিকার উপায় উপকরণ লাভ করবে। এ ব্যাপারে কুরআনের ভাষণ ঃ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَٰئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ـ (الانعام: ١٦٥)

"তিনি আল্লাহ্‌ই, যিনি পৃথিবীতে তোমাদেরকে খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের তিনি যা কিছুই দিয়েছেন, এভাবে তার মাধ্যমে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করবেন।" [আল আন'আম ঃ ১৬৫]

انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَٰتٍ وَأَكْبَرُ
تَفْضِيلًا ـ (بنى اسرائيل: ٢١)

"চেয়ে দেখো, আমরা কিভাবে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর মর্যাদা দান করেছি। আর পরকাল তো শ্রেণী এবং মর্যাদার পাথর্ক্যের দিক থেকে আরো অনেক বড়।" [বনী ইসরাঈল ঃ ২১]

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ـ (الزخرف: ٣٢)

"ওরা কি তোমার প্রভুর অনুগ্রহ [নবুওয়ত]-কে বন্টন করতে চায়? পার্থিব জীবনে আমরা তাদের মাঝে তাদের জীবিকা বন্টন করে দিয়েছি। তাদের কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর মর্যাদা দান করেছি। এটা এজন্যে করেছি যাতে তাদের কিছু লোক অপর লোকদের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। আর তোমার মনিবের রহমত [অর্থাৎ নবুওয়ত] তো তাদের পুঞ্জিভূত অর্থসম্পদ থেকে উত্তম।"[৫] [সূরা যুখরুফ ঃ ৩২]

---

৫. যে ঘটনার প্রেক্ষিতে কথাটি বলা হয়েছে, তা হলো ঃ মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধবাদীরা বলতো, মক্কা

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ○

"মূলত, তোমার মালিক যার জন্যে ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন, আর যাকে ইচ্ছা মাপাঝোপা দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর দাসদের সব খবর রাখেন এবং তাদের সকল অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখেন।" [বনী ইসরাঈল ঃ ৩০]

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - (الشورى : ١٢)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই মুষ্টিবদ্ধে। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন আর যাকে ইচ্ছা মাপাঝোপা প্রদান করেন। তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানের মালিক।" [আশ্ শূরা ঃ ১২]

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ - (سبا : ٣٩)

"হে নবী, বলে দাও ঃ আমার মনিব তাঁর দাসদের যাকে চান জীবিকা প্রশস্ত করে দেন আর যাকে চান মাপাঝোপা করে দেন।" [আস সাবা ঃ ৩৯]

কুরআন এই প্রাকৃতিক অসাম্যকে ঠাণ্ডা মাথায় মেনে নেয়ার জন্যে মানুষকে উপদেশ দিয়েছে। আল্লাহ অন্যদেরকে যে মর্যাদা ও অনুগ্রহ দান করেছেন, তার জন্যে ঈর্ষান্বিত না হবারও পরামর্শ দিয়েছে ঃ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ○ (النساء : ٣٢)

"তোমাদের একজনের চেয়ে আরেকজনকে আল্লাহ যা কিছু বেশী দিয়েছেন, তোমরা তার জন্যে লোভ করোনা। যা পুরুষেরা উপার্জন করেছে, সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে আর যা নারীরা উপার্জন করেছে, সে অনুযায়ী তাদের অংশ নির্দিষ্ট। আল্লাহ্র কাছে তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্যে প্রার্থনা কর। অবশ্যি আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।" [আন নিসা ঃ ৩২]

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ○ (النحل : ٧١)

"আল্লাহ তোমাদের কিছু লোককে অপর কিছু লোকের তুলনায় অধিক জীবিকা দিয়েছেন। যাদেরকে বেশী দেয়া হয়েছে, তারা তাদেরই এই জীবিকা এই ভয়ে তাদের অধীনস্থ ভৃত্যদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করাতে চায়না যে, এই জীবিকার ক্ষেত্রে তারা

এবং তায়েফের কোনো বড় সরদারকে কেন নবী বানানো হলোনা। আল্লাহর যদি নবী পাঠানোর দরকারই হয়ে থাকে, তবে সেজন্যে মুহাম্মদকে (সা) মনোনীত করার কী কারণ থাকতে পারে?

উভয়ই সমান সমান অংশীদার হয়ে যাবে। তাহলে এরা কি আল্লাহ্র অনুগ্রহই অস্বীকার করছে।" [আন নহল ঃ ৭১]

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ، هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ، (الروم: ٢٨)

"আল্লাহ তোমাদের নিজেদের (অবস্থা) থেকে তোমাদের জন্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তোমাদের মালিকানাধীন ভৃত্যদের মাঝে এমন ভৃত্যও কি আছে যারা--আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার হবে? আর তোমরা কি তাদেরকে সেরকম ভয় করবে, যেমন ভয় কর নিজেদের সমমানের লোকদের? আমরা এভাবেই বুদ্ধি বিবেক রাখে এমন লোকদের জন্যে নিদর্শনসমূহ পরিষ্কার করে বর্ণনা করি।" [আর রূম ঃ ২৮]

শেষোক্ত আয়াত দুটির শব্দাবলী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় এবং যে প্রেক্ষিতে কথা বলা হয়েছে, তা থেকেও একথা স্পষ্ট হয় যে, এখানে অর্থনৈতিক অসাম্যকে নিন্দা করা এবং তা নির্মূল করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার শিক্ষা দেয়া হয়নি। বরঞ্চ প্রকৃত ব্যাপার হলো, মানুষের মধ্যে যে শিরক পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধে দলীল হিসেবেই দৃষ্টান্তগুলো পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, তোমরা যখন আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকার মধ্যেই তোমাদের ভৃত্যদেরকে নিজেদের সমান অংশীদার বানাতে প্রস্তুত নও, তখন আল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা কেমন করে পোষণ কর যে, তাঁর সৃষ্টি তাঁর খোদায়ীতে অংশীদার হতে পারে?[৬]

৫.বৈরাগ্যনীতির পরিবর্তে মধ্যপন্থা এবং বিধিনিষেধ

কুরআন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বারবার এ সত্য বর্ণনা করছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের ভোগ ব্যবহারের জন্যেই পৃথিবীতে তাঁর যাবতীয় নিয়ামত সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছা কখনো এ নয় এবং এমনটি হতে পারেনা যে, মানুষ এসব নিয়ামত পরিত্যাগ করে বৈরাগ্যনীতি অবলম্বন করবে। তবে তিনি যা চান, তা হলো, মানুষ পবিত্র এবং অপবিত্রের মধ্যে পার্থক্য করবে। বৈধ এবং অবৈধ পন্থার মধ্যে পরখ করবে। ভোগ ব্যবহার এবং লাভস্বার্থ কেবল হালাল ও পবিত্র পর্যন্ত সীমিত রাখবে এবং এক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থার সীমা অতিক্রম করবে না।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا - (البقرة: ٢٩)

---

৬. সূরা আন নহলের ৭১ থেকে ৭৬ এবং সূরা আর রূমের ২০ থেকে ৩৫ আয়াত অধ্যয়ন করলে এ কথাগুলো পূর্ণরূপে স্পষ্ট হবে। উভয় আয়াতেই আলোচ্য বিষয় হলো শিরক বাতিল এবং তাওহীদকে সঠিক প্রমাণিত করা। উভয়স্থানের ব্যাখ্যার জন্যে দ্রষ্টব্য তাফহীমুল কুরআন মূল দ্বিতীয় খন্ড ৫৫৪ থেকে ৫৫৮ পৃষ্ঠা এবং মূল তৃতীয় খন্ড ৭৪২ থেকে ৭৫৬ পৃষ্ঠা।

"তিনি সেসবই তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, যা পৃথিবীতে রয়েছে।" [আল বাকারা ঃ ২৯]

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۔ (الاعراف:٣٢)

"হে নবী, ওদের জিজ্ঞেস কর, আল্লাহ্‌র সেসব সৌন্দর্য কে হারাম করেছে, যা তিনি তাঁর বান্দাহ্‌দের জন্যে বের করেছেন আর জীবিকার পবিত্র জিনিস সমূহকে?" [আল আরাফ ঃ ৩২]

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۔ (المائدة: ٨٨)

"আল্লাহ যেসব হালাল ও পবিত্র জীবিকা তোমাদের দিয়েছেন তা থেকে খাও। আর সেই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা কর যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো।" [আল মায়িদা ঃ ৮৮]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۔ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۔ (البقرة : ١٦٨)

"হে মানুষ পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র তা খাও আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। কারণ, সেতো তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু। [আল বাকারা ঃ ১৬৮]

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۔ (الاعراف: ٣١)

"আহার কর। পান কর। সীমালংঘন করোনা। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" [আল আ'রাফ ঃ ৩১]

وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ج (الحديد: ٢٧)

"আর বৈরাগ্য [সংসার ত্যাগ ও বাস্তব জীবন থেকে পলায়ন] নীতি তারা [অর্থাৎ ঈসা ইবনে মরিয়মের (আ) অনুসারীরা] নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে। এটা আমি তাদের প্রতি লিখে দিইনি। আমি তো লিখে দিয়েছিলাম কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসন্ধান। কিন্তু তারা সে কর্তব্য যথার্থভাবে পালন করেনি।" [আল হাদীদ ঃ ২৭]

৬. অর্থসম্পদ উপার্জনে হারাম হালাল বিবেচনা করা

এ উদ্দেশ্যে কুরআন বিধিনিষেধ আরোপ করে বলে দিয়েছে, অর্থসম্পদ শুধুমাত্র বৈধ পন্থায় অর্জন করতে হবে, আর অবৈধ পন্থা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۔ (النساء: ٢٩)

"হে লোকেরা, যারা ঈমান এনেছো! তোমরা নিজেদের মধ্যে অন্যায়ভাবে একে

অপরের সম্পদ ভক্ষণ করোনা। তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তিজারত[৭] করতে পারো। আর নিজেকে নিজে [কিংবা পরস্পরকে] তোমরা হত্যা করোনা। আল্লাহ্ অবশ্যি তোমাদের প্রতি কৃপাময়।" [আন নিসা ঃ ২৯]

৭. অর্থসম্পদ উপার্জনের অবৈধ পন্থা

রাসূলে করীমের (সা) হাদীসে এবং ফকীহ্গণ কর্তৃক ফিকাহ গ্রন্থাবলীতে অর্থোপার্জনের অন্যায় অবৈধ পন্থাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু অন্যায় অবৈধ পন্থার কথা কুরআনেও সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (البقرة : ١٨٨)

[ক] "তোমরা নিজেদের পরস্পরের অর্থসম্পদ অন্যায় অবৈধভাবে ভক্ষণ করোনা। আর জেনে বুঝে অপরাধমূলক পন্থায় অপরের সম্পদের কিছু অংশ ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে তা শাসকদের কাছে উপস্থাপন করোনা।[৮] [আল বাকারা ঃ ১৮৮]

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۝ (البقرة : ٢٨٣)

[খ] "তোমাদের কেউ যদি অপরের উপর আস্থা স্থাপন করে তার দায়িত্বে কোনো আমানত রাখে, তবে যার উপর আস্থা স্থাপন করা হয়েছে, সে যেন আস্থাস্থাপনকারীর আমানত ফেরত দেয় এবং নিজের মনিব আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি থেকে যেন আত্মরক্ষা করে।" [আল বাকারা ঃ ২৮৩]

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۔ (آل عمران : ١٦١)

[গ] "আর যে আত্মসাত [জনগণের অর্থসম্পদের খিয়ানত] করবে, কিয়ামতের দিন সে অবশ্যি এ আত্মসাতসহ হাযির হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেখানে তার কৃতকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিফল প্রদান করা হবে।" [আলে ইমরান ঃ ১৬১]

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا ۔ (المائدة : ٣٨)

---

৭. এখানে কুরআনে -----তিজারত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ আদান প্রদানের ভিত্তিতে দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবা বিনিময় করা [দ্রষ্টব্য ঃ জাস্সাস ঃ আহকামুল কুরআন, ২য় খণ্ড ২১০ পৃষ্ঠা, আলবাহীয়া সংস্করণ মিশর ১৩৪৭ হিজরী। ইবনুল আরবী ঃ আহকামুল কুরআন প্রথম খণ্ড ১৭০ পৃষ্ঠা, আস সায়াদা সংস্করণ মিশর ১৩৩১ হিজরী]
'পারস্পরিক সন্তুষ্টি'র শর্তারোপ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, এই বিনিময়ে কোনো প্রকার দমনপীড়ন, ধোঁকা প্রতারণা কিংবা ছলচাতুরী থাকবেনা, যা অপর পক্ষের গোচরীভূত হলে সে অসন্তুষ্ট হবে।

৮. শাসকদের সামনে উপস্থাপন করা মানে অপরের অর্থসম্পদের মিথ্যা মালিকানা দাবী করে শাসকদের দ্বারস্থ হওয়াও হতে পারে, আবার শাসকদেরকে ঘুষ দিয়ে অন্যদের মালিকানাধীন অর্থসম্পদ অবিচারমূলকভাবে কবজা করে নেয়াও হতে পারে। [আলূসী ঃ রূহুল মুয়ানী, ২য় খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা।]

[ঘ] "চোর পুরুষ এবং চোর নারী উভয়ের হাত কেটে দাও।" [আল মায়িদা ঃ৩৮]

إِنَّمَا جَزَآؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُّقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا...... (المائدة : ٣٣)

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটায়[৯] তাদের দণ্ড হলো তাদের হত্যা করে ফেলা কিংবা শূলে চড়ানো...।" [আল মায়িদা ঃ ৩৩]

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا۔ (النساء : ١٠)

[ঙ] "যারা অন্যায়ভাবে এতীমের অর্থসম্পদ ভক্ষণ করে তারা মূলত নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে। অচিরেই তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" [আন নিসা ঃ ১০]

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝ (المطففين : ١-٣)

[চ] "ধ্বংস সেইসব ঠকবাজদের জন্যে, যারা অপর লোকদের কাছ থেকে গ্রহণ করবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের ওজন বা পরিমাপ করে দেবার সময় কম দিয়ে থাকে।" [আল মুতাফফিফীন ঃ ১-৩]

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔ (النور : ١٩)

[ছ] "যারা চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তাদের জন্যে পৃথিবীর জীবনে এবং পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" [আন নূর ঃ ১৯]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ...... أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۔ (لقمان : ٦)

"এমন কিছু লোকও আছে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্যে মনভুলানো কথা ক্রয় করে আনে..... এমন লোকদের জন্যে অপমানকর শাস্তি রয়েছে।"[১০] [সূরা লুকমান ঃ ৬]

---

৯. অর্থাৎ সেসব লোক, যারা ডাকাতি রাহাজানির মতো অপরাধ করে বেড়ায়।

১০. এখানে মনভুলানো কথা মানে গানবাদ্য, গল্পগুজব ও এমনসব খেলাধূলা যা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। [ইবনে জরীর আত-তাবারী ঃ জামেউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ২১শ খন্ড, ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা, আল আমেরীয়া সংস্করণ, মিশর, ১৩২৮ হিজরী।]

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ

(النور: ٣٣)

[জ] " বৈষয়িক স্বার্থে নিজেদের দাসীদেরকে বেশ্যাবৃত্তির জন্যে বাধ্য করোনা, যখন তারা নিজেরা এরূপ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়।"[১১] [আন নূর ঃ ৩৩]

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَآءَ سَبِيْلًا ۝ (بنی اسرائيل: ٣٢)

"ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা। এ এক চরম অশ্লীলতা আর নোংরা নিকৃষ্ট পথ।" [বনী ইসরাঈল ঃ ৩২]

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ـ (النور: ٢)

"ব্যভিচারী পুরুষ এবং ব্যভিচারী নারী—তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে কশাঘাত কর।"[১২] [আন নূর ঃ ২]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ ـ (المائدة: ٩٠)

[ঝ] "হে মুমিনরা! মদ, জুয়া, আস্তানা ও পাশা এসবই নোংরা শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব পরিত্যাগ কর।"[১৩] [আল মায়িদা ঃ ৯০]

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ـ (البقرة: ٢٧٥)

---

১১. এ আয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য পতিতাবৃত্তির উচ্ছেদ। দাসীর কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, প্রাচীন আরবে দাসীদের দিয়েই পতিতাবৃত্তির [Prostitution] ব্যবসা চালানো হতো। লোকেরা তাদের যুবতী সুন্দরী দাসীদেরকে গলিতে বসিয়ে দিতো এবং তাদের উপার্জন ভক্ষণ করতো। [ইবনে জরীর তাবারী ১৮শ খণ্ড, ৫৫-৫৮, ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা। তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ ৩য় খন্ড ২৮৮-২৮৯ পৃষ্ঠা, মুস্তফা মুহাম্মদ, সংস্করণ মিশর ১৮৪৭ ইং। ইবনে আবদুল বার ঃ আল ইসতিয়াব ঃ ২য় খণ্ড, ৭৬২ পৃষ্ঠা, দায়েরাতুল মা'আরেফ, সংস্করণ হায়দারাবাদ ১৩৩৭ হিজরী।]

১২. জিনাকে অপরাধ বলে ঘোষণা করার সাথে সাথে ইসলাম জিনার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থকেও হারাম করে দিয়েছে। নবী করীম (সা) এ উপার্জনকে নিকৃষ্ট ধরনের উপার্জন বলে আখ্যায়িত করেছেন। দ্রষ্টব্য ঃ বুখারী ঃ ৩৪ অধ্যায় ১১৩ অনুচ্ছেদ, ৩৭ অধ্যায় ২০ অনুচ্ছেদ, ৬৮ অধ্যায় ৫ অনুচ্ছেদ, ৭৬ অধ্যায় ৪৬ অনুচ্ছেদ, ৭৭ অধ্যায় ৯৬ অনুচ্ছেদ। মুসলিম ঃ ২২ অধ্যায় হাদীসের ক্রমিক সংখ্যা ৩৯-৪১। আবু দাউদ ঃ ২২ অধ্যায় ৩৯-৬৩ অনুচ্ছেদ। তিরমিযী ঃ ৯ অধ্যায় ৩৭ অনুচ্ছেদ, ১২ অধ্যায় ৪৬ অনুচ্ছেদ, ২৬ অধ্যায় ২৩ অনুচ্ছেদ। নাসায়ী ঃ ৪২ অধ্যায় ৫ অনুচ্ছেদ, ৪৪ অধ্যায় ৯০ অনুচ্ছেদ। ইবনে মাজাহ ঃ ১২ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ।

১৩. কুরআনে যেসব জিনিস নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, সেগুলোর উৎপাদন এবং ব্যবসাও নিষিদ্ধ। কেননা, কোনো জিনিস নিষিদ্ধ হবার দাবিই হলো, সে জিনিস দ্বারা কোনোভাবেই লাভবান হওয়া যাবেনা। [আল জাস্সাস্ ঃ আহকামুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড ২১২ পৃষ্ঠা।]

[ঞ] "আল্লাহ ব্যবসায়কে বৈধ করেছেন আর সুদকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।"[১৪] [আল বাকারা ঃ ২৭৫]

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٥ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ٥ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۔ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥ (البقرة : ٢٧٨ - ٢٨٠)

"হে লোকেরা, যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহকে ভয় কর আর তোমাদের যে সুদ অনাদায়ী রয়ে গেছে, তা পরিত্যাগ কর যদি তোমরা [সত্যি] মুমিন হয়ে থাকো। আর তা যদি না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ কর। আর এখনো তওবা কর; তবে তোমরা মূলধন ফিরিয়ে নেবার অধিকার লাভ করবে। না তোমরা যুল্ম করবে, আর না তোমাদের প্রতি যুল্ম করা হবে। আর তোমাদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণকারী যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি মাফ করে দাও, তবে এটাই হবে তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।"[১৫] [আল বাকারা ঃ ২৭৮-২৮০]

এভাবে কুরআন অর্থসম্পদ লাভের যেসব উপায় পন্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১. কারো অর্থসম্পদ তার ইচ্ছা ও বিনিময় ছাড়া গ্রহণ করা, কিংবা বিনিময় দিয়ে ও রাজি করিয়ে অথবা বিনিময় ছাড়া রাজি করিয়ে নেয়া। এমনভাবে রাজি করিয়ে নেয়া, যে রাজি করানোর পিছে থাকে দমন পীড়ন এবং চাপ প্রয়োগ।

২. ঘুষ।

৩. জবরদখল, লুণ্ঠন ও আত্মসাত।

৪. খিয়ানত, চাই তা ব্যক্তির অর্থসম্পদ হোক, কিংবা জনগণের অর্থসম্পদ।

---

১৪. এ থেকে বুঝা গেলো, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি মূলধনের উপর যে মুনাফা অর্জন করবে, কিংবা যৌথ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অংশহারে যে মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হবে, তা বৈধ। কিন্তু ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে মূলের চেয়ে কিছু বেশী আদায় করে, তবে তা হারাম। এটাকে আল্লাহ তা'আলা ব্যবসায়িক মুনাফার মতো বৈধ মুনাফা বলে ঘোষণা করেননি।

১৫. আয়াতের শব্দাবলী থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ নির্দেশ ঋণের সাথে সম্পর্কিত। ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে মূলের অধিক কিছু নেয়ার শর্তারোপ করলে তা হবে সুদ। এই জিনিসটি সুদ হবার ক্ষেত্রে পরিমাণের কমবেশী কিংবা কোনো বিশেষ কাজ করার জন্যে গ্রহণ করা দ্বারা কোনো পার্থক্য হয়না। আজকাল যারা সুদ হারাম হওয়াকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নেয়া ঋণের ক্ষেত্রে সীমিত করার চেষ্টা করে আর ব্যবসায়িক ঋণের সুদ এবং ব্যাংকের সুদ বৈধ বলে, তাদের একথার পক্ষে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহর কোথাও কোনো দলীল নেই।

৫. চুরি, ডাকাতি।

৬. এতীমের অর্থসম্পদের বল্গাহীন ভোগ ব্যবহার।

৭. মাপ ও ওজনে কমবেশী করা।

৮. অশ্লীলতা প্রসারকারী উপায় উপকরণের ব্যবসা।

৯. গান বাজনার পেশা।

১০. পতিতাবৃত্তি ও ব্যভিচার।

১১. মদ উৎপাদন, তার ব্যবসা ও পরিবহণ।

১২. জুয়া এবং এমনসব উপায় পন্থা, যেসবের মাধ্যমে কিছু লোকের অর্থ অন্যদের হাতে কেবলমাত্র ভাগ্য বা ঘটনাচক্রের মাধ্যমে চলে যায়।

১৩. মূর্তি তৈরী, মূর্তির ক্রয় বিক্রয় এবং মন্দিরের সেবা।

১৪. ভাগ্য গণনা ও শকুন বিদ্যা প্রভৃতির ব্যবসা।

১৫. সুদ, পরিমাণ বেশী হোক কিংবা কম; ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ নেয়া হয়ে থাকুক কিংবা ব্যবসা, শিল্প বা কৃষি কাজের জন্য ঋণ নেয়া হোক সর্বাবস্থায় সুদ নিষিদ্ধ।

৮. কার্পণ্য ও পুঞ্জিভূত করার উপর নিষেধাজ্ঞা

অর্থসম্পদ লাভের ভ্রান্ত উপায় পন্থা নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে কুরআন বৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থসম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখাকেও তীব্রভাবে নিন্দা করেছে। কুরআন বলছে কার্পণ্য এক জঘন্য মন্দ কাজ ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝ نِ الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ ۝

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝ (الهمزة : ١-٤)

"ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে মানুষের দোষ প্রচার করে এবং গালাগাল করে। যে সম্পদ পুঞ্জিভূত করেছে এবং গুণে গুণে রেখেছে। সে মনে করে তার অর্থসম্পদ চিরদিন তার কাছে থাকবে। কখনো নয়। সে তো চূর্ণবিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে।" [আল হুমাযা ঃ ১-৪]

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - (التوبة : ٣٤)

"সেইসব লোকদের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও, যারা সোনারূপা পুঞ্জিভূত করে রাখে, অথচ তা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করেনা।" [আত-তাওবা ঃ ৩৪]

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ (التغابن : ١٦)

"যারা মনের সংকীর্ণতা [বা মনের কার্পণ্য] থেকে মুক্ত থেকেছে, তারাই সফলকাম হবে।" [আত তাগাবুন ঃ ১৬]

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ (آل عمران : ١٨٠)

"যারা আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করে, তারা যেনো মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে ভাল। না, বরঞ্চ এটা তাদের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ। তারা কৃপণতা ক'রে যা কিছু সঞ্চয় করেছে, কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলার রশি হয়ে দাঁড়াবে।"[১৬] [আলে ইমরান ঃ ১৮০]

৯. অর্থপূজা ও লোভ লালসার নিন্দা

এ প্রসংগে কুরআন আমাদের এ শিক্ষাও দেয় যে, অর্থপূজা, বৈষয়িক অর্থসম্পদের প্রতি আসক্তি এবং প্রাচুর্যের কারণে গর্ব অহংকার মানুষের পথভ্রষ্টতা এবং অবশেষে তার ধ্বংসের অন্যতম বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় ঃ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۙ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ (التكاثر : ١-٣)

"তোমাদেরকে অধিক অধিক অর্থসম্পদ সঞ্চিত করার চিন্তা চরমভাবে নিমগ্ন করে রেখেছে। কবরে পা দেয়া পর্যন্ত এ চিন্তায় তোমরা বিভোর থাক। কখনো নয়, অতি শীঘ্রি তোমরা জানতে পারবে।" [আত তাকাসুর ঃ ১-৩]

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۢ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۚ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ـ (القصص : ٥٨)

"এমন বহু জনপদকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, যার অধিবাসীরা নিজেদের জীবিকার গর্বে অহংকারী হয়ে পড়েছিল। এখন দেখ, তাদের বসতবাটিগুলো বিরান হয়ে পড়ে আছে। তাদের পরে খুব কম লোকই সেখানে বসবাস করেছে। শেষ পর্যন্ত আমিই তাদের উত্তরাধিকারী হয়েছি।" [আল কাসাস ঃ ৫৮]

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝ وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝ (السبا : ٣٤-٣٥)

"আমরা যে জনপদেই কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি, সেখানকার সম্পদশালী লোকেরা বলেছে ঃ তোমরা যে বাণী নিয়ে প্রেরিত হয়েছো আমরা তা মানিনা। তারা

---

১৬. এ কথাটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভংগিতে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টব্য ঃ সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৮, আল হাদীদ ঃ ২৪, আনকাবূত ঃ ৩৪, মায়ারিজ ঃ ২১, মুদ্দাসসির ঃ ৪৫, আল ফাজর ঃ ১৫-২০, আল লাইল ঃ ১১, আল মাউন ঃ ১, ২, ৩, ৭।

আরো বলেছে ঃ আমরা তোমাদের চেয়ে অধিক অর্থসম্পদ ও সন্তান সন্ততির অধিকারী এবং আমরা কখনো শাস্তি ভোগ করবোনা।" [আস সাবা ঃ ৩৪-৩৫]

১০. অপব্যয়ের নিন্দা

কুরআন মজীদ বৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থসম্পদ অবৈধ কাজে উড়িয়ে দেয়া, কিংবা বিলাসিতা, আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ উপভোগে ব্যয় করা এবং দিন দিন জীবন যাপনের মান বাড়ানোর একমাত্র ধান্দায় বল্গাহীন অর্থ ব্যয় করাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছে ঃ

وَلَا تُسْرِفُوْا ۔ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۔ (الانعام : ١٤١)

"অর্থ ব্যয়ে সীমালংঘন করোনা। আল্লাহ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেননা।" [আল আন'আম ঃ ১৪১]

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۔ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝ (بنى اسرائيل: ٢٦ - ٢٧)

"অপব্যয় করোনা। অপব্যয়কারীরা শয়তানদের ভাই। আর শয়তান তার মনিবের চরম অকৃতজ্ঞ।" [বনী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭]

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۔ (الاعراف : ٣١)

"পানাহার কর, কিন্তু সীমালংঘন করোনা। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেননা।" [আল আ'রাফ ঃ ৩১]

কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের সঠিক কর্মনীতি হলো এই যে, সে নিজের জন্যে এবং নিজের পরিবার পরিজনের জন্যে ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। তার অর্থসম্পদের উপর তার নিজের এবং তার সাথে যারা সম্পর্কিত তাদের অধিকার রয়েছে। এই অধিকার প্রদান করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করা যাবেনা। কিন্তু তাই বলে আবার কেবল এই এক অধিকার প্রদান করতেই অন্যান্যদের বঞ্চিত করে সব অর্থসম্পদ উজাড় করে দেয়াও যাবেনা। ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ۔ (بنى اسرائيل : ٢٩)

"আর নিজের হাতকে [কৃপণতা করে] গলায় বেঁধে রেখোনা, আবার সম্পূর্ণ প্রসারিতও করে দিওনা। এমনটি করলে তোমরা তিরস্কৃত হবে এবং খালি হাতে বসে পড়বে।" [বনী ইসরাঈল ঃ ২৯]

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۔ (الفرقان : ٦٧)

"[এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারাই] যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে সীমালংঘনও করেনা,

আবার কৃপণতাও করেনা, বরঞ্চ তারা উভয় চরম পন্থার মধ্যবর্তীতে অবস্থান করে।" [আল ফুরকান ঃ ৬৭]

وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ - (القصص: ٧٧)

"আল্লাহ তোমাকে যে অর্থসম্পদ দান করেছেন, তার মাধ্যমে পরকালের ঘর অন্বেষণ কর। তবে তোমার পার্থিব অংশের কথাও ভুলে যেয়োনা। আর [আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি] অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। [অর্থসম্পদ দ্বারা] পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করোনা।" [আল কাসাস ঃ ৭৭]

১১. অর্থ ব্যয়ের সঠিক খাত

যুক্তিসংগত সীমার মধ্যে থেকে নিজের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর বৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থসম্পদের যে অংশ হাতে অবশিষ্ট থাকবে, তা যেসব খাতে ব্যয় করা উচিত, সেগুলো হলো ঃ

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۥ قُلِ الْعَفْوَ - (البقرة: ٢١٩)

"লোকেরা তোমার কাছে জানতে চায়, তারা [আল্লাহর পথে] কি [পরিমাণ] খরচ করবে? তুমি বলো ঃ যা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত।" [আল বাকারা ঃ ২১৯]

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ---(البقرة: ١٧٧)

"তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরালে, তা কিন্তু প্রকৃত পুণ্যের কাজ নয়। বরং প্রকৃত নেক কাজ হলো, মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র প্রতি, পরকালের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল কিতাবের প্রতি, নবীদের প্রতি; আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় অর্থসম্পদ ব্যয় করবে আত্মীয়দের জন্যে, এতীমদের জন্যে, মিসকীনদের ও পথিকদের জন্যে, সাহায্যপ্রার্থীদের জন্যে এবং মানুষকে গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করার জন্যে .....।" [আল বাকারা ঃ ১৭৭]

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۥ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۥ (آل عمران: ٩٢)

"তোমরা কখনো পুণ্যের মর্যাদা লাভ করতে পারবেনা, যতোক্ষণ না তোমরা নিজেদের পছন্দনীয় জিনিস আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে। আর তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পূর্ণ জ্ঞাত।" [আলে ইমরান ঃ ৯২]

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۙ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۚ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاۤءَ النَّاسِ - (النساء: ٣٦ - ٣٨)

“আল্লাহ্‌র দাসত্ব কর। তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করোনা। দয়া ও সহানুভূতিমূলক আচরণ কর পিতামাতার সাথে, আত্মীয় স্বজনের সাথে, এতীমদের সাথে, মিসকীনদের সাথে, আত্মীয় প্রতিবেশীদের সাথে, অনাত্মীয় প্রতিবেশীদের সাথে, সাথী বন্ধুদের সাথে, পথিকদের সাথে এবং তোমাদের অধীনস্থ ভৃত্যদের সাথে। মূলত আল্লাহ গর্ব ও অহংকারী লোকদের ভালবাসেন না, যারা নিজেরা কার্পণ্য করে, অন্যদেরকেও কৃপণতার শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন তা লুকিয়ে রাখে। এরূপ অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্যে আমরা অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। আর [ঐ লোকদেরও আল্লাহ পছন্দ করেননা।] যারা কেবল লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের অর্থসম্পদ ব্যয় করে।” [আন নিসা ঃ ৩৬-৩৮]

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْــَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ - (البقرة: ٢٧٣)

“আল্লাহর পথে বিশেষভাবে অর্থসাহায্যের অধিকারী হলো সেইসব দুঃস্থ লোক, যারা আল্লাহ্‌র কাজে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবিকা উপার্জনের জন্যে তারা কোনো প্রকার চেষ্টা সাধনা করার সুযোগ পায়না[১৭] তাদের ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধের কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সচ্ছল অবস্থার লোক

---

১৭. রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সময় এর দ্বারা বুঝা হতো সেই চারশ' স্বেচ্ছাসেবী সাহাবীকে, যারা আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিজেদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করে মদীনায় এসে উপস্থিত হন এবং দীনের জ্ঞান লাভ, দীন প্রচার, দীনের শিক্ষা দান এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যখন জিহাদের যে দায়িত্বে পাঠাতে চান, তা যেন পাঠাতে পারেন, সেজন্যে নিজেদেরকে সার্বক্ষণিক সমর্পণ করে রাখেন। এসব কাজে নিজেদের পূরো সময় নিয়োগ করার কারণে তারা নিজেদের জীবিকার জন্যে চেষ্টা সাধনা করার সুযোগ পেতেন না। [যমখশরী ঃ আল কাশশাফ, ১ম খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা, আলবাহীয়া সংস্করণ, মিশর ১৩৪৩ হিজরী]। একইভাবে বর্তমানকালেও যেসব লোক নিজেদের পূরো সময় দীনের জ্ঞান লাভ, শিক্ষাদান, দীনের প্রচার এবং সমাজের অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে নিয়োগ করে এবং ব্যক্তিগত আয় রোজগারের দিকে দৃষ্টিপাত করার সুযোগ পায়না, তারাও এ আয়াতে উল্লেখিত কথিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

মনে করে। চেহারা দেখলেই তুমি তাদের চিনতে পারবে। তারা কারো কাছে গিয়ে কিছু চায়না। তাদের কল্যাণে তোমরা যা কিছুই ব্যয় করবে, আল্লাহ তা জ্ঞাত থাকবেন।" [আল বাকারা ঃ ২৭৩]

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّ أَسِيْرًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝ (الدهر: ٨-٩)

"[আর সৎলোকেরা] আল্লাহ্‌র ভালবাসায় খাবার খাওয়ায় মিসকীন, এতীম এবং বন্দীদের, আর বলে ঃ আমরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যেই তোমাদের আহার করাচ্ছি। তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার বিনিময় বা কৃতজ্ঞতা লাভের আমরা আকাঙ্ক্ষী নই।" [আদ দাহ্‌র ঃ ৮-৯]

وَالَّذِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝ (المعارج: ٢٤-٢٥)

"আর সেইসব লোকেরাই [জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাবে], যাদের অর্থসম্পদে সাহায্যপ্রার্থী এবং বঞ্চিত লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে [অর্থাৎ নিজেদের অর্থসম্পদে তারা এইসব লোকের জন্যে নিয়মমাফিক একটি অংশ নির্দিষ্ট করে রাখে।]" [আল মায়ারিজ ঃ ২৪-২৫]

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّ اٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْ اٰتٰكُمْ ـ (النور: ٣٣)

"তোমাদের ক্রীতদাসদের মধ্যে যারা [ফিদইয়া প্রদান করে মুক্তি অর্জনের জন্যে] চুক্তি সম্পাদন করতে চায়, তোমরা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও যদি তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে বলে তোমরা মনে কর। আর [ফিদইয়া পরিশোধের জন্যে] তাদেরকে আল্লাহ্‌র সেই অর্থসম্পদ থেকে দান কর, যা তিনি তোমাদের দান করেছেন।" [আন নূর ঃ ৩৩]

এইসব খাতে ব্যয় করাকে কুরআন কেবল একটি মৌলিক নেক কাজ বলেই ক্ষান্ত হয়নি, বরঞ্চ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে একথাও বলে দিয়েছে যে, এমনটি না করলে সামগ্রিকভাবে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য ঃ

وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوْا ۛ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ (البقرة: ١٩٥)

"আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর আর নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা। মানুষের প্রতি অনুগ্রহ-ইহ্‌সান কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন।" [আল বাকারা ঃ ১৯৫]

১২. আর্থিক কাফফারা

আল্লাহর পথে এই সাধারণ ও স্বেচ্ছামূলক দান ছাড়াও কুরআন মজীদ কিছু কিছু গুনাহ্ ও দোষত্রুটির ক্ষতিপূরণের জন্যে আর্থিক কাফফারাও নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন, যে ব্যক্তি কসম খেয়ে তা ভংগ করে তার জন্যে নির্দেশ হলো ঃ

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ - (المائدة : ٨٩)

"তার কাফফারা [প্রায়শ্চিত্ত] হলো, দশজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো, যেমন মধ্যম ধরনের খাবার খাওয়াও তোমরা নিজেদের পরিবার পরিজনকে; কিংবা তাদেরকে পরিধেয় দান করা; অথবা একজন দাস মুক্ত করা। কিন্তু যে এমনটি করতে পারবেনা, সে তিন দিন রোযা রাখবে।" [আল মায়িদা ঃ ৮৯]

এমনি করে যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে (মা বোনের তুলনা করে) নিজের জন্যে হারাম করে নেবে এবং পুনরায় তাকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করতে চাইবে, তার জন্যে বিধান হলো ঃ

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ...... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ ...... فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا - (المجادلة : ٣-٤)

"একজন আরেকজনকে স্পর্শ করার পূর্বে [স্বামী] একজন দাস মুক্ত করবে, তা সম্ভব না হলে অনবরত দুইমাস রোযা রাখবে.... তাও সম্ভব না হলে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে।" [মুজাদালা ঃ ৩-৪]

হজ্জের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে অনুরূপ কাফফারার বিধান দেয়া হয়েছে [দেখুন, আল বাকারা ঃ ১৯৬, আল মায়িদা ঃ ৯৫]। রোযার ক্ষেত্রেও এ ধরনের কাফফারা নির্ধারণ করা হয়েছে। [আল বাকারা ঃ ১৮৪]।

১৩. দান কবুল হবার আবশ্যিক শর্তাবলী

এযাবত যেসব দানের কথা বলা হলো, সেগুলো কেবল তখনই 'আল্লাহ্র পথে ব্যয়' বলে কবুল হবে, যখন দানের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার স্বার্থ উদ্ধারের চিন্তা থাকবেনা, আত্মপ্রচার ও প্রদর্শনেচ্ছা থাকবেনা, খোঁটা দেয়া এবং কষ্ট দেয়ার চেষ্টা থাকবেনা এবং ছাঁটাই বাছাই করে মন্দ ও নিকৃষ্ট ধরনের মাল দেয়া হবেনা। বরঞ্চ দানের সময় মন মগজে আল্লাহ্র ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা না থাকলেই সে দান কবুল হবে আশা করা যায়।

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ

يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝ (النساء : ٣٨)

"[আর আল্লাহ ঐ লোকদের পছন্দ করেন না] যারা লোক দেখানোর জন্যে নিজেদের

অর্থসম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখেনা। বস্তুতঃ শয়তান যার সাথী হলো, সে অত্যন্ত নিকৃষ্ট সাথীই লাভ করলো।" [আন নিসা ঃ ৩৮]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ - (البقرة : ٢٦٤)

"হে ঈমান গ্রহণকারীরা! তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে ঐ বক্তির মতো নিজেদের দানসমূহকে বিনষ্ট করোনা, যে লোক দেখাবার জন্যে স্বীয় অর্থ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখেনা।" [আল বাকারা ঃ ২৬৪]

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى ۔ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ - (البقرة : ٢٦٢-٢٦٣)

"যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের অর্থসম্পদ দান করে এবং দানের পর খোঁটা ও কষ্ট দেয়না, তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে রয়েছে পুরস্কার, তাছাড়া তাদের কোনো ভয় এবং দুশ্চিন্তা থাকবেনা। একটি ভালো কথা আর ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার, সেই দানের চেয়ে উত্তম, যার অনুগামী হয় কষ্টদান। মূলত আল্লাহ মুখাপেক্ষিতাহীন পরম সহিষ্ণু।" [আল বাকারা ঃ ২৬২-২৬৩]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۔ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ - (البقرة : ٢٦٧)

"হে ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা! আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর সেই উত্তম অর্থসম্পদ যা তোমরা উপার্জন করেছো এবং যা আমরা তোমাদের জন্যে যমীন থেকে উৎপন্ন করে দিয়েছি। বেছে বেছে তা থেকে মন্দটা আল্লাহ্‌র পথে দিওনা। কারণ এমনটি যদি তোমাদেরকে কেউ দেয়, তবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা ছাড়া তোমরাও তা গ্রহণ করবেনা। জেনে রেখো, আল্লাহ মুখাপেক্ষিতামুক্ত এবং প্রশংসিত গুণাবলীর অধিকারী।" [আল বাকারা ঃ ২৬৭]

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۔ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ - (البقرة : ٢٧١)

"তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তাও ভালো। আর যদি গোপনে দরিদ্রদের দাও, তবে তা অধিকতর ভালো। এমনটি করলে তোমাদের বহু পাপ মুছে দেয়া হবে। তোমরা যা-ই কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।" [আল বাকারা ঃ ২৭১]

১৪. আল্লাহ্‌র পথে অর্থব্যয়ের বাস্তব গুরুত্ব

আল্লাহ্‌র পথের ব্যয়কে কুরআন কখনো ইনফাক, কখনো ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ, কখনো সাদাকা, আবার কখনো যাকাত শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছে। এটা কেবল একটা নেক ও কল্যাণকর কাজই নয়, বরঞ্চ একটি ইবাদত এবং ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ ঈমান, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ। কুরআনে সাইত্রিশ বার এটাকে নামাযের সংগে উল্লেখ করে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে, এ দুটি জিনিসই ইসলামের অপরিহার্য বিধান এবং মুক্তির মানদণ্ড।[১৮] কুরআন বলে, যাকাত সব সময়ই ইসলামের স্তম্ভ ছিলো ঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ
وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ - (الانبياء : ٧٣)

"আর আমরা তাদেরকে [অর্থাৎ ইব্রাহীম, লূত, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-কে] নেতা বানিয়েছি। তারা আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে সঠিক পথ দেখাতো। তাদের কাছে আমরা নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম কল্যাণমূলক কাজ করার, সালাত কায়েম করার এবং যাকাত দান করার। আর তারা ছিলো আমাদের অনুগত।" [আল আম্বিয়া ঃ ৭৩]

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ - (البينة : ٥)

"আহলে কিতাবকে এছাড়া আর কোনো নির্দেশই দেয়া হয়নি যে, তোমরা একনিষ্ঠভাবে দীনকে আল্লাহ্‌র জন্যে একমুখী করে তাঁর দাসত্ব কর, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। এটাই সঠিক দীন।" [আল বাইয়্যেনা ঃ ৫]

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝ وَكَانَ
يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ۝ (مريم : ٥٥)

"আর এ কিতাবে ইসমাঈলের কথা স্মরণ কর। সে ছিলো ওয়াদা পালনে সত্যবাদী, আর ছিলো একজন রাসূল, একজন নবী। সে তার সাথে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিল সালাতের এবং যাকাতের; আর আল্লাহ্‌র কাছে সে ছিলো অত্যন্ত পছন্দনীয়।" [মরিয়ম ঃ ৫৪-৫৫]

---

১৮. উদাহরণ স্বরূপ কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দ্রষ্টব্য ঃ আল বাকারা ঃ ৩, ৪৩, ৮৩, ১১০, ১৭৭, ২৭৭। আন নিসা ঃ ৭৭, ১৬২। আল মায়িদা ঃ ১২, ৫৫। আল আনফাল ঃ ৩। আত তাওবা ঃ ৫, ১১, ১৮, ৭১। আর রা'দ ঃ ২২। ইব্রাহীম ঃ ৩১। মরিয়ম ঃ ৩১, ৫৫। আম্বিয়া ঃ ৭৩। আল হজ্জ ঃ ৩৫, ৪১, ৭৮। আল মু'মিনূন ঃ ২। আন নূর ঃ ৩৭, ৫৬। আন নমল ঃ ৩। লুকমান ঃ ৪। আল আহযাব ঃ ৩৩। ফাতির ঃ ৩৯। আশ শূরা ঃ ৩৮। আল মুজাদালা ঃ ১৩। আল মায়ারিজ ঃ ২৩। আল মুয্‌যাম্মিল ঃ ২০। আল মুদ্দাসসির ঃ ৪৩। আল বাইয়্যেনা ঃ ৫। আল মাউন ঃ ৫।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ...... وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ ـ (البقرة : ٨٣)

"সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমরা বনী ইসরাঈল থেকে শপথ নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো দাসত্ব করবেনা.... আর সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত পরিশোধ করবে।" [আল বাকারা ঃ ৮৩]

قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ۚ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۚ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۚ (مريم : ٣٠-٣١)

"সে [ঈসা ইবনে মরিয়ম] বললো ঃ আমি আল্লাহ্‌র দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন। আমি যেখানেই থাকিনা কেন আমাকে কল্যাণের প্রতীক বানিয়েছেন; আর আমি যতোদিন জীবিত থাকি ততোদিন আমাকে সালাত কায়েমের এবং যাকাত পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন।" [মরিয়ম ঃ ৩০-৩১]

একইভাবে যাকাত মুহাম্মদ (সা)-এর শিক্ষাদান কর্মসূচীতেও দীন ইসলামের একটি স্তম্ভ। কোনো ব্যক্তির মুসলিম উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত হবার জন্যে যেমন ঈমান এবং নামায অপরিহার্য ঠিক তেমনি যাকাতও অপরিহার্য ঃ

مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ ...... فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا بِٱللَّهِ ۚ (الحج : ٧٨)

"[আল্লাহ তোমাদের জন্যে] তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের তরীকা ধার্য করে দিয়েছেন। তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম।.... অতএব সালাত কায়েম কর, যাকাত দিয়ে দাও এবং আল্লাহ্‌র রশি শক্ত করে ধর।" [আল হজ্জ ঃ ৭৮]

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝ (البقرة : ٢-٣)

"এটি আল্লাহ্‌র কিতাব। এতে কোনো শোবা সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের পথ প্রদর্শনকারী, যারা গায়েবে বিশ্বাস করে, সালাত কয়েম করে এবং আমরা যে জীবিকা তাদের দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।" [আল বাকারা ঃ ২-৩]

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ...... ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝ أُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ (الانفال : ٢-٤)

"মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহ্‌র কথা আলোচিত হলে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে...যারা সালাত কায়েম করে এবং আমাদের প্রদত্ত জীবিকা থেকে ব্যয় করে। এরাই সত্যিকারের মুমিন।" [আনফাল ঃ ২-৪]

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ - (المائدة : ٥٥)

"তোমাদের প্রকৃত বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং সেইসব লোক, যারা ঈমান এনেছে, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং তারা আল্লাহ্র সামনে সদা মাথা নত করে আছে।" [আল মায়িদা ঃ ৫৫]

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ - (التوبة : ١١)

"অতএব যদি [মুশরিকরা তাদের শিরক থেকে] তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত পরিশোধ করে, তবে তারা তোমাদের দীনি ভাই।" [আত তাওবা ঃ ১১]

যাকাত যে কেবল সমাজ কল্যাণের জন্যেই প্রয়োজন তা নয়, বরঞ্চ দাতাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি, নৈতিক সংশোধন এবং তাদের সাফল্য ও মুক্তির জন্যেও দরকার। এটা কোনো ট্যাক্স নয়, বরং সালাতের মতোই একটি ইবাদত। মানুষের আত্মসংশোধনের জন্যে কুরআন যেসব বিধিবদ্ধ আইন দিয়েছে, যাকাত তার একটি অপরিহার্য অংগ ঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۔ (التوبة : ١٠٣)

"[হে নবী] তাদের অর্থসম্পদ থেকে একটি সাদাকা উসূল করে তাদেরকে পবিত্র কর এবং তাদের মধ্যে প্রশংসনীয় গুণাবলী বিকশিত কর আর তাদের জন্যে কল্যাণের দোয়া কর। তোমার দোয়া অবশ্যি সান্ত্বনার কারণ হবে।" [তাওবা ঃ ১০৩]

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۔ (آل عمران : ٩٢)

"তোমরা কিছুতেই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা, যতোক্ষণ না নিজেদের প্রিয়বস্তু ব্যয় করবে।" [আলে ইমরান ঃ ৯২]

وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

"দান কর। এতে তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণ রয়েছে। আর যারা মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পেলো, এমন লোকেরাই সাফল্য লাভ করবে।" [আত তাগাবুন ঃ ১৬]

১৫. আবশ্যিক যাকাত ও তার ব্যাখ্যা

কুরআন শিক্ষা ও নির্দেশনার দ্বারা সমাজের লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র পথে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দানের একটি সাধারণ প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরঞ্চ রাসূলুল্লাহকে (সা) এ নির্দেশও প্রদান করেছে যে, তুমি এই দানের একটি ন্যূনতম সীমা পরিমাণ নির্ধারণ করে ফরয হিসেবে সেটা ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আদায় ও

বন্টনের ব্যবস্থা কর ঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً - (التوبة : ١٠٣)

"[হে নবী] তাদের অর্থসম্পদ থেকে একটি সাদাকা উসূল কর।" [আত তাওবা ঃ ১০৩]

"একটি সাদাকা" শব্দ দ্বারা এই ইংগিতই প্রদান করা হয়েছিলো যে, লোকেরা সাধারণভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেসব সাদাকা দিয়ে থাকে, এটা সেসব সাদাকার মতো নয়, বরঞ্চ সেগুলোর বাইরে একটি বিশেষ পরিমাণের সাদাকা তাদের উপর ফরয করে দেয়ার নির্দেশ। আর এর পরিমাণ নির্ধারণ করার দায়িত্বও রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) উপরই ন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এই নির্দেশ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন ধরনের মালিকানার উপর একটি ন্যূনতম সীমা পরিমাণ নির্ধারণ করে দেন, যার চেয়ে কম পরিমাণের উপর যাকাত ধার্য হবেনা। অতঃপর নির্দিষ্ট পরিমাণ বা তার চেয়ে অধিক মালিকানার উপর অর্থসম্পদের প্রকারভেদে যাকাতের পরিমাণ নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়।[১৯]

১. সোনা, রূপা এবং নগদ মুদ্রা আকারে যে অর্থসম্পদ জমা হবে,[২০] তার যাকাত বার্ষিক ২.৫% ভাগ।

২. জমির উৎপাদিত ফসলে উশর ১০% ভাগ, যদি প্রাকৃতিক বর্ষণের দারা ফসল উৎপাদিত হয়।

৩. আর কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত হলে ৫% ভাগ ফসল উশর হিসেবে দিতে হবে।

৪. ব্যক্তিমালিকানাধীন খনিজ সম্পদ এবং প্রোথিত সম্পদের ২০% ভাগ যাকাত ধার্য হবে;

৫. যেসব গৃহপালিত পশু বংশবৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পালন করা হয়, সেগুলোর যাকাত দিতে হবে। ভেড়া, ছাগল, গাভী, উট প্রভৃতি পশুর ক্ষেত্রে যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে ফিকাহ্‌র গ্রন্থাবলী দেখা যেতে পারে।

যাকাতের এই পরিমাণ আল্লাহ্‌র নির্দেশে নবী করীম (সা) ঠিক সেইভাবে ধার্য [ফরয] করে দিয়েছেন, যেভাবে তিনি তাঁর নির্দেশে নামাযের রাক'আত সংখ্যা ধার্য [ফরয] করে দিয়েছেন। দীনি দায়িত্ব ও গুরুত্বের দিক থেকে এতদুভয়ের মধ্যে কোনো

---

১৯. আশ শওকানী ঃ নায়লুল আওতার, ৪র্থ খণ্ড, ৯৮-১২৬ পৃষ্ঠা, মুস্তফা আলবাবী মিশর ১৩৪৭ হিঃ।

২০. পরবর্তীতে ইজমার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বাণিজ্যিক সম্পদেও বার্ষিক ২.৫% হিসেবে যাকাত ধার্য করতে হবে। আশ শওকানী ঃ ৪র্থ খণ্ড ১১৭ পৃষ্ঠা। বাণিজ্যিক যাকাতের এই মূলনীতি সেইসব কলকারখানার উপরও আরোপিত হবে, যেগুলো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদন করে।

পার্থক্য নেই। সালাত ও যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে কুরআন মজীদ ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য করেছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۞ (الحج: ٤١)

"[এই মুমিনরা, যাদেরকে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে, তারা এমন লোক] তাদেরকে যদি আমরা পৃথিবীতে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করি, তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং কল্যাণের নির্দেশ দেবে আর অন্যায় অকল্যাণ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।" [আল হজ্জ ঃ ৪১]

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ....
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۞ (النور: ٥٥-٥٦)

"তোমাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে এবং কল্যাণকর কাজ করেছে, আল্লাহ তাদের সাথে এই ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যি তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন।....... তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও আর রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে করে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।" [আন নূর ঃ ৫৫-৫৬]

উপরে যে আয়াতগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ফরয যাকাত আদায় ও বন্টন করা ইসলামী রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র যদি বর্তমান না থাকে এবং মুসলিম সরকারও যদি এ ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করে তবু মুসলমানদের উপর থেকে ফরয রহিত হয়ে যায়না, ঠিক যেমনি রহিত হয়ে যায়না সালাত আদায়ের ফরযিয়াত। কোনো আদায়কারী ও বন্টনকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পাওয়া না গেলে প্রত্যেক 'সাহেবে নিসাব' মুসলমানের নিজেকেই নিজের অর্থসম্পদ থেকে যাকাত বের করে বন্টন করে দিতে হবে।

১৬. মালে গনীমতের এক পঞ্চমাংশ

ফরয যাকাত আরোপের মাধ্যমে যে তহবিল সংগ্রহ হয়, কুরআন তার সাথে আরো একটি আয় সংযোজন করেছে। তা হলো, মালে গনীমতের [Spoils of war] একটি অংশ। কুরআন আইন করে দিয়েছে যে, যুদ্ধে সৈন্যরা যে গনীমতের মাল লাভ করবে, তা কোনো সৈনিকই ব্যক্তিগতভাবে লুটে নিতে পারবেন না। বরঞ্চ যা কিছুই পাওয়া যাবে তার সবই কমাণ্ডারের কাছে জমা দিতে হবে। কমাণ্ডার মোট জমাকৃত সম্পদকে পাঁচ ভাগ করে চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দেবেন আর এক পঞ্চমাংশ পৃথক রেখে তা রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা দেবেন ঃ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ (الانفال: ٤١)

"জেনে রেখো, তোমরা যে গনীমতই লাভ কর, তার এক পঞ্চমাংশ থাকবে আল্লাহ, রাসূল, আত্মীয়স্বজন,[২১] এতীম ও মুসাফিরদের জন্যে।"

১৭. যাকাত ব্যয়ের খাত

উপরোক্ত দুটি [যাকাত ও গনীমত] উৎস থেকে যে অর্থসম্পদ সংগৃহীত হতো, কুরআনের দৃষ্টিতে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের [Public Exchequer] কোনো অংশ নয়। কারণ রাষ্ট্রীয় কোষাগারের লক্ষ্য তো যাকাতদাতা সহ সকল জনগণের সুবিধা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান। তাই কুরআন যাকাত তহবিলের ব্যয়ের খাত নিম্নরূপ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ - (التوبة:٦٠)

"এই সাদাকা নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো ফকীরদের[২২] জন্যে, মিসকীনদের[২৩] জন্যে, সাদাকা আদায়-বন্টন বিভাগের কর্মচারীদের জন্যে, তাদের জন্যে যাদের মন আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য হবে,[২৪] দাস মুক্তির জন্যে,[২৫] ঋণে নিমজ্জিতদের সাহায্যের জন্যে,

---

২১. রাসূলুল্লাহ্র (সা) জীবদ্দশায় তিনি গনীমতের এক পঞ্চমাংশ নিজের এবং নিজের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে গ্রহণ করতেন। কেননা যাকাতে তাঁর এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনের কোনো অংশ ছিলনা। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর রাসূল ও তাঁর আত্মীয়স্বজনের অংশ কাকে দেয়া হবে সে বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। কেউ কেউ মত দেন, রাসূল এ অংশটি পেতেন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর খলীফা ও খলীফার আত্মীয়স্বজন হবে এর অধিকারী। অন্য কিছু লোকের মত হলো রাসূলুল্লাহ্র (সা) মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়স্বজনই হবেন এর অধিকারী। অবশেষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে, রাসূল (সা) এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন যে অংশ পেতেন, এখন থেকে তা রাষ্ট্রীয় সামরিক খাতে ব্যয় হবে। [আল জাস্সাস ঃ ৩য় খণ্ড, ৭৫-৭৭ পৃষ্ঠা]।

২২. এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই ফকীর, যে প্রয়োজনের কম জীবিকা লাভ করার কারণে সাহায্যের মুখাপেক্ষী। [লিসানুল আরব ঃ ৫ম খণ্ড, ৬০-৬১ পৃষ্ঠা, বৈরুত ১৯৫৬ ইং]

২৩. উমর (রা) বলেছেন, মিসকীন সেই ব্যক্তি যে উপার্জন করতে পারেনা, কিংবা উপার্জন করার সুযোগ পায়না। [জাস্সাস ঃ ৩য় খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা]। এই সংজ্ঞার আলোকে সেইসব গরীব শিশু যারা এখনো উপার্জনের যোগ্য হয়নি, সেইসব বিকলাংগ ও বৃদ্ধ যারা উপার্জন করার যোগ্য নয় এবং সেইসব বেকার ও রোগী যারা সাময়িকভাবে উপার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত--তারাই মিসকীন।

২৪. রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে মন আকৃষ্ট করার জন্যে তিন ধরনের লোককে অর্থদান করা হতো ঃ [১] যেসব ইসলাম বিরোধী ব্যক্তি দুর্বল মুসলমানদের কষ্ট দিতো, কিংবা ইসলামের বিরুদ্ধে কঠোর শত্রুতা করতো। অর্থদান করে তাদের নম্র আচরণে রাজী করা হতো। [২] যারা শক্তি প্রয়োগ করে নিজ বংশ গোত্রের লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিতো, অর্থদান করে তাদেরকে এ আচরণ থেকে নিবৃত্ত করা হতো, [৩] যেসব নতুন নতুন লোক ইসলাম গ্রহণ করতো, তাদের আর্থিক সাহায্য করা হতো, যাতে করে তাদের হতাশা দূর হয় এবং নিশ্চিন্তে মুসলিম দলের সাথে অবস্থান করে। [জাস্সাস ৩য় খন্ড ১৫২]

২৫. সেইসব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত. বিভিন্ন যুদ্ধে শত্রুরা যাদেরকে বন্দী করে দাস বানিয়ে নেয় এবং

আল্লাহ্‌র পথে[২৬] এবং পথিকদের সাহায্যের জন্যে[২৭] এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আরোপিত একটি ফরয।" [আত তাওবা ঃ ৬০]

১৮. উত্তরাধিকার আইন

কোনো পুরুষ বা মহিলার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে কুরআনের বিধান হলো, এ সম্পত্তি তার পিতামাতা, সন্তানসন্ততি এবং তার স্ত্রী বা স্বামীর মধ্যে নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী বন্টিত হবে। পিতামাতা এবং সন্তানসন্ততি না থাকলে তার সহোদর এবং বৈমাতৃক ও বৈপিতৃক ভাইবোনদের অংশ দিতে হবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধান সূরা নিসায় আলোচিত হয়েছে।[২৮] [দেখুন, আয়াত ঃ ৭-১২, ১৭৬]। দীর্ঘ হবার ভয়ে এখানে সে আলোচনা উদ্ধৃত করলাম না।

এ ব্যাপারে কুরআনের মূলনীতি হলো, কোনো ব্যক্তির জীবদ্দশায় যে অর্থসম্পদ তার মালিকানাভুক্ত হয়েছে, তার মৃত্যুর পর তা আর কেন্দ্রীভূত থাকতে দেয়া যাবেনা। বরঞ্চ তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে হবে। এই মূলনীতি বড় পুত্রের বা জৈষ্ঠত্বের উত্তরাধিকার প্রথা [Primo geniture], যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি [Joint Family system] প্রথা এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত, যেসব প্রথার মূল লক্ষ্য হলো, কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পরও তার পুঞ্জিভূত সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত রাখা।

এমনি করে কুরআন পালকপুত্র গ্রহণের প্রথাকেও অস্বীকার করেছে। কুরআন আইন করে দিয়েছে যে, সত্যিকার আত্মীয়রাই কেবল উত্তরাধিকার লাভ করবে। কোনো পর মানুষকে পুত্র বানিয়ে কৃত্রিম উপায়ে উত্তরাধিকারী বানানো যাবেনা ঃ

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ط ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ط (الاحزاب : ٤)

"আল্লাহ তোমাদের মুখডাকা [পালক] পুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র বানাননি। এটাতো

সেইসব অমুসলিমও এর অন্তর্ভুক্ত যারা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে ফিদইয়া দিয়ে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে। তাছাড়া সেইসব দাসও এর অন্তর্ভুক্ত যারা পূর্ব থেকেই দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ ছিলো।

২৬. আল্লাহ্‌র পথ মানে জিহাদ ও হজ্জ। স্বেচ্ছাসেবী মুজাহিদ যদি নিজ প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের মতো সম্পদশালী হয়ও, তবু তিনি যাকাত গ্রহণ করতে পারেন। কেননা জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সফর প্রভৃতি খরচের জন্যে ব্যক্তির অর্থ যথেষ্ট হতে পারেনা। একইভাবে হজ্জের সফরেও যদি কারো পাথেয় শেষ হয়ে যায়, তবে তিনিও যাকাত লাভের অধিকারী। [জাস্‌সাস ঃ ৩য় খণ্ড, ১৫৬-১৫৭ পৃষ্ঠা। নায়লুল অওতার ঃ ৪র্থ খণ্ড, ১৪৪-১৪৬ পৃষ্ঠা]।

২৭. পথিক যদি তার বাড়ীতে ধনী ব্যক্তিও হয়ে থাকেন, কিন্তু ভ্রমণকালে যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন, তবে তিনি যাকাত পাওয়ার অধিকারী হন। [আল জাস্‌সাস ঃ ৩য় খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা]।

২৮. নবী করীম (সা) এ আইনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তার দৃষ্টিতে নিকটতম আত্মীয়স্বজন বর্তমান না থাকলে কিছুটা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়রা উত্তরাধিকার লাভ করবে, সেরকম কেউ না থাকলে পরবর্তী পর্যায়ের লোকেরা পাবে যারা অনাত্মীয়দের তুলনায় তার আত্মীয়। কিন্তু যদি কোনো ধরনের আত্মীয়ই বর্তমান না থাকে, তখন তার পূরো সম্পত্তি ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা হবে। [নায়লুল আওতার ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৫৬]।

তোমাদের মুখের কথা মাত্র।" [আল আহযাব ঃ ৪]

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ - (الاحزاب : ٦)

"আল্লাহ্‌র কিতাবে আত্মীয়রাই পরস্পরের অধিকতর হকদার।" [আল আহযাব ঃ ৬]

কিন্তু প্রকৃত উত্তরাধিকারী আত্মীয়দের অধিকার পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করার পর কুরআন তাদেরকে উপদেশ দিয়েছে, উত্তরাধিকার বন্টনের সময় ওয়ারিশ নয় এমন আত্মীয়রা উপস্থিত হলে তাদেরকেও যেনো সন্তুষ্টচিত্তে কিছু না কিছু প্রদান করা হয় ঃ

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ - (النساء : ٨-٩)

"[উত্তরাধিকার] বন্টনের সময় যখন আত্মীয়, এতীম ও মিসকীন ব্যক্তিরা উপস্থিত হবে, তখন তা থেকে তাদেরকেও কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলবে। একথা চিন্তা করে লোকদের ভয় করা উচিত যে, তারা নিজেরাও যদি অসহায় সন্তান রেখে চলে যায়, তবে মৃত্যুর সময় এই সন্তানদের জন্যে কতইনা আশংকা তাদেরকে পীড়িত করে। সুতরাং তারা যেনো আল্লাহকে ভয় করে।" [আন নিসা ঃ ৮-৯]

১৯. অসীয়তের বিধান

কুরআন মজীদ উত্তরাধিকার আইন নির্ধারণ করার সাথে সাথে মানুষকে উপদেশ দিয়েছে, তারা যেনো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে নিজেদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অসীয়ত করে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - (البقرة : ١٨٠)

"যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় এবং সে অর্থসম্পত্তি রেখে যেতে থাকে, তখন বাবা মা ও আত্মীয়স্বজনের জন্যে বৈধ পন্থায় অসীয়ত করাটাকে তোমাদের জন্যে লিখে দেয়া হয়েছে। এটি মুত্তাকীদের উপর একটি অধিকার।" [আল বাকারা ঃ ১৮০]

এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ব্যাপক। একদিকে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি বিশেষভাবে স্বীয় পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণের জন্যে নিজ সন্তানদের অসীয়ত করে যাবে। কেননা তাদের বৃদ্ধ দাদা দাদীকে খেদমতের আশা তাদের থেকে খুব কমই করা যায়। অপরদিকে তার পরিবারে যারা আইনগতভাবে উত্তরাধিকার লাভ করবেনা, সে যদি তাদেরকে সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত মনে করে তবে নিজ পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তাদেরকে অংশ দেয়ার জন্যে অসীয়ত করে যাবে। তাছাড়া কোনো ব্যক্তি যখন মৃত্যুর সময় প্রচুর অর্থসম্পদ রেখে যেতে থাকে, তখন তার পক্ষে জনকল্যাণমূলক কাজেও

অসীয়ত করে যাওয়া বৈধ। কেননা অসীয়তের অনুমতি কেবল পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্যে সীমাবদ্ধ করাটা উপরোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য নয়।[২৯]

অসীয়ত ও উত্তরাধিকারের এ আইন থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ব্যক্তিগত মালিকানার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে ইসলামের স্কীম হলো, অবশ্যি দুই তৃতীয়াংশ উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তিতে বন্টন করতে হবে। আর এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখী ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে হবে, যাতে করে সে তা যে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করার জন্যে অসীয়ত করে যেতে পারে। তবে শর্ত হলো, তা বৈধ পন্থায় হতে হবে। অর্থাৎ যে কাজের জন্যে অসীয়ত করে যাবে সে কাজটি বৈধ হতে হবে এবং তাতে কারো অধিকারও ক্ষুণ্ন হতে পারবেনা।[৩০]

২০. অজ্ঞ ও নির্বোধদের স্বার্থ সংরক্ষণ

অজ্ঞ, বোকা ও নির্বোধ হবার কারণে যারা নিজেদের মালিকানাধীন অর্থসম্পত্তির সঠিক ব্যয় ব্যবহার জানেনা বরং সম্পদ খোয়াতে থাকে, কিংবা নিশ্চিতভাবে আশংকা হয় যে, তারা তাদের সম্পদ খুইয়ে ফেলবে, তাদের ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশনা হলো, তাদের মালিকানা তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া যাবেনা। বরঞ্চ তাদের সহায় সম্পদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অভিভাবক কিংবা বিচারকের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। তাদের হাতে কেবল তখনই সোপর্দ করা যাবে, যখন আশ্বস্ত হওয়া যাবে যে, তারা নিজেরাই নিজ নিজ বিষয়াদির দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়ার উপযুক্ত হয়েছে ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ج (النساء: ٥-٦)

"তোমরা তোমাদের সেই অর্থসম্পদ, যা আল্লাহ তোমাদের পরিচালনার উপায়

---

২৯. নায়লুল আওতার ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা। এক্ষেত্রে নবী করীমের (সা) ব্যাখ্যা থেকে কুরআনের বক্তব্যের যে উদ্দেশ্য জানা যায়, তা হলো, নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে দরিদ্র ও পরমুখাপেক্ষী রেখে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা পছন্দনীয় নয়। নায়লুল আওতার গ্রন্থে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থাবলীর সূত্রে নবী করীমের (সা) যে বাণী উদ্ধৃত হয়েছে তা হলো ঃ "তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে সুহালে রেখে যাওয়াটা, মুখাপেক্ষী ও পরের কাছে হাত পাততে হবে—এমন অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম।"

৩০. অসীয়তের আইনের ব্যাখ্যা প্রসংগে নবী করীম (সা) অসীয়তের অধিকারের উপর তিনটি শর্তারোপ করেছেন। এক. নিজের পূরো সম্পদের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে অসীয়তের অধিকার প্রয়োগ করা যাবে। দুই. যারা আইনগত ভাবে উত্তরাধিকার লাভ করবে, তাদের কারো জন্যে অন্য ওয়ারিশদের অনুমতি ছাড়া অসীয়ত করা যাবেনা। তিন. কোনো ওয়ারিশকে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার কিংবা তার অংশ কম করার অসীয়ত করা যাবেনা। [নায়লুল আওতার ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১-৩৫।

বানিয়েছেন, অজ্ঞ নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দিওনা। অবশ্য তা থেকে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করো এবং তাদের সাথে উত্তম ও বিবেকসম্মত কথা বলো। আর এতীমদের পরীক্ষা করতে থাকো যতোদিন না তারা বিয়ের বয়সে উপনীত হয়। অতঃপর যখন তাদের মধ্যে সঠিক বিবেক বুদ্ধি সৃষ্টি হয়েছে বলে লক্ষ্য করবে, তখন তাদের অর্থসম্পদ তাদের দায়িত্বে ছেড়ে দাও।" [আন নিসা ঃ ৫-৬]

এ আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। তা হলো, ব্যক্তিমালিকানাধীন অর্থসম্পত্তিতে সেইসব ব্যক্তিদেরই স্বত্ব স্বীকৃত যারা আইনগতভাবে স্বত্বাধিকার লাভ করে। কিন্তু সে অর্থসম্পত্তি সম্পূর্ণরূপেই তাদের নয়। বরং তার সাথে জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। সে কারণেই কুরআন 'তাদের সেই অর্থসম্পদ' না বলে 'তোমাদের সেই অর্থসম্পদ' বলেছে। এ দৃষ্টিভংগির ভিত্তিতেই কুরআন অভিভাবক ও বিচারকদেরকে এ অধিকার প্রদান করেছে যে, তারা যেখানেই ব্যক্তিমালিকানাধীন অর্থসম্পদের অপব্যবহার দ্বারা সমাজের সামগ্রিক ক্ষতি হতে দেখবেন, কিংবা ক্ষতি হবার যুক্তিসংগত আশংকা করবেন, সেখানেই ব্যক্তির স্বত্বাধিকার ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে তার ব্যয় ব্যবহারের অধিকার নিজের হাতে তুলে নেবেন।[৩১]

২১. জাতীয় মালিকানায় সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণ

যেসব দ্রব্যসামগ্রী, অর্থসম্পদ এবং আয় আমদানী রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকবে, সেগুলোর ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশ হলো, সেগুলোর ব্যয় ও ভোগ ব্যবহার কেবল অর্থশালী শ্রেণীর স্বার্থে হতে পারবেনা, বরঞ্চ সাধারণ জনগণের স্বার্থে হতে হবে, বিশেষ করে, সেগুলোর মাধ্যমে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর কল্যাণের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে ঃ

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ..... لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ... وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ .... وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. (الحشر: ٧-١٠)

"আল্লাহ এই জনপদের লোকদের থেকে যা কিছুই তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র জন্যে, রাসূলের জন্যে,[৩২] [তাঁর] আত্মীয়স্বজনের

---

৩১. ইবনুল আরাবী ঃ আহকামুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড ১৩৩ পৃঃ। ইবনে কাসীর ঃ তাফসীরুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড ৪৫২ পৃষ্ঠা। আল জাসসাস ঃ আহকামুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড ৭২-৭৩ পৃঃ।

৩২. এর অর্থ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয়। এ উৎস থেকেই নবী করীম (সা) এবং তাঁর খলীফাগণ নিজেদের ভাতা গ্রহণ করতেন এবং সরকারী কর্মচারীদের [যাকাত বিভাগের কর্মচারী বাদে] বেতন প্রদান করতেন। যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের বেতন যাকাতের অর্থ থেকেই দেয়া হতো।

জন্যে,[৩৩] এতীমদের জন্যে এবং মিসকীন ও পথিকদের জন্যে। [এ বিধান এজন্যে দেয়া হলো] যাতে করে তা কেবল তোমাদের মধ্যকার ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে। ......তাছাড়া সেইসব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্যেও যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও বিষয় সম্পত্তি থেকে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত হয়ে এসেছে।...... আর তাতে সেই আনসারদেরও অধিকার রয়েছে, যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্ব থেকেই ঈমান এনে দারুল ইসলামে বসবাস করছে।.....তাছাড়া পরবর্তীতে আসা লোকদের অধিকারও তাতে রয়েছে।" [আল হাশর ঃ ৭-১০]

২২. করারোপের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি

করারোপের ক্ষেত্রে কুরআন যে মূলনীতির প্রতি পথনির্দেশনা দান করে তা হলো, করের বোঝা কেবল সেইসব লোকদের ঘাড়ে চাপবে, যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদের মালিক। তাছাড়া তাদের অর্থসম্পদের সেই অংশের উপরই কেবল কর চাপাতে হবে, প্রয়োজন সেরে যা উদ্বৃত্ত থাকে।

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلِ الْعَفْوَا ط (النساء: ٢١٩)

"তারা তোমার কাছে জানতে চায়, তারা কি ব্যয় করবে? তুমি বলো ঃ যা তোমাদের প্রয়োজন সেরে উদ্বৃত্ত থাকে।" [আন নিসা ঃ ২১৯]

ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

কুরআনের এই ২২ দফা নির্দেশনায় মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের জন্যে যে স্কীম প্রণয়ন করা হয়েছে, তার বুনিয়াদী নীতিমালা ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো ঃ

[১] এই স্কীম এমন প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, যার ফলে একদিকে যেমন সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক যুল্‌ম এবং বল্গাহীন লাভ ও দখলদারী নীতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, অপরদিকে তেমনি সমাজের উত্তম নৈতিক গুণাবলী বিকশিত হবার সুযোগ লাভ করে। কুরআন এমন কোনো সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়না, যেখানে ব্যক্তিগতভাবে কেউ কারো কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হবেনা, যেখানে ব্যক্তির প্রতিটি কল্যাণ কেবল একটি সামাজিক মেশিনের মাধ্যমে করা হবে। কুরআন এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা এ কারণে চায়না যে এরূপ ক্ষেত্রে সমাজের নৈতিক গুণাবলী বিকশিত হবার কোনো সুযোগ থাকেনা।

পক্ষান্তরে কুরআন এমন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও স্বার্থহীন দানশীলতা, সহানুভূতি ও দয়া

---

৩৩. এর ব্যাখ্যার জন্যে এ অধ্যায়ের ২১ নম্বর টীকা দেখুন।

অনুগ্রহের আচরণ করবে, যার ফলে তাদের মাঝে পারস্পরিক প্রীতি ও ভালবাসার প্রসার ঘটার সুযোগ হবে। এ উদ্দেশ্যে কুরআন মানুষের মধ্যে ঈমান সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ বানাবার পন্থার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এর পরও যদি কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যায় তাহলে সেসব ত্রুটি দূর করার জন্যে ইসলাম সেইসব বল প্রয়োগমূলক আইনের আশ্রয় নেয় যা সামাজিক সাফল্যের জন্যে অপরিহার্য। [দফা নম্বর ঃ ৮-১৩ এবং ১৫-১৯]

[২] এই স্কীমে অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে নৈতিক মূল্যবোধ থেকে পৃথক রাখা হয়নি। বরং উভয় নীতিকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে দেয়া হয়েছে। এখানে অর্থনৈতিক সমস্যাকে কেবল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান করা হয়নি। বরঞ্চ সেই পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থার ইমারত কাঠামোর মধ্যে রেখে সমাধান করা হয়েছে, ইসলাম যার ভিত স্থাপন করেছে পরিপূর্ণরূপে খোদার দাসত্ব ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা, নৈতিক দর্শন ও বিশ্বাসের উপর। [দফা ঃ ১, ২, ৪, ৫]।

[৩] এই স্কীমে পৃথিবীর অর্থনৈতিক উপায় উপকরণকে গোটা মানব জাতির উপর মহান আল্লাহ্র সাধারণ দান ও অনুগ্রহ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই এর লক্ষ্য হলো, ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা জাতীয় আধিপত্যের পরিবর্তে আল্লাহ্র দুনিয়ায় সকল মানুষকে জীবিকা উপার্জনের জন্যে যতোটা সম্ভব উন্মুক্ত সুযোগ করে দেয়া। [দফা ঃ ৫]

[৪] এই স্কীমে ব্যক্তিমালিকানার অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা বল্গাহীন নয়। ব্যক্তির ব্যক্তিগত মালিকানাধিকারের উপর অপরাপর ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থে প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপ করার সাথে সাথে এই স্কীমে প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থসম্পদ আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব, অভাবী, হতভাগা মানুষ এবং সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব অধিকারের মধ্যে কিছু কিছু আইনগতভাবে কার্যকর, আবার কিছু কিছু বুঝ ও উপলব্ধি সৃষ্টি এবং নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। [দফা ঃ ৩, ৫, ৭-১৫, ১৭, ১৯, ২০]।

[৫] এই পরিকল্পনার দৃষ্টিতে মানব জীবনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলো, লোকেরা তা নিজ নিজ স্বাধীন চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে পরিচালনা এবং বিকশিত করবে। কিন্তু এই স্বাধীন চেষ্টা সাধনাও আবার বিধিবন্ধনহীন রাখা হয়নি। বরঞ্চ সমাজের এবং স্বয়ং সেই ব্যক্তিদের নৈতিক, তামদ্দুনিক ও অর্থনেতিক কল্যাণের জন্যে কিছু সীমারেখা দ্বারা চেষ্টা সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। [দফা ঃ ৬, ৭, ১৫, ২২]।

[৬] এতে নারী পুরুষ উভয়কে তাদের নিজ নিজ উপার্জিত, উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত এবং অন্যান্য বৈধ পন্থায় প্রাপ্ত অর্থসম্পদের সমান স্বত্বাধিকারী ঘোষণা করা হয়েছে। উভয়কে নিজ নিজ অধিকারভুক্ত অর্থসম্পদ থেকে সমানভাবে উপকৃত হবার অধিকার দেয়া হয়েছে। [দফা ঃ ৩, ৪, ১৮]।

[৭] এ স্কীমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্যে একদিকে মানুষকে কৃপণতা ও বৈরাগ্য ত্যাগ করে আল্লাহর নিয়ামতের ভোগ ব্যবহারের জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে, অপরদিকে তাদেরকে অপব্যয়, বাহুল্য খরচ এবং বিলাসিতা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। [৫, ৮-১০]।

[৮] অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে এতে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থসম্পদের প্রবাহ যেনো ভ্রান্ত ও অবৈধ উপায়ে কোনো বিশেষ দিকে প্রবাহিত হতে না থাকে এবং বৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থসম্পদও যেনো কোনো একস্থানে পুঞ্জিভূত হয়ে অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়ে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এই স্কীমে অর্থসম্পদের বেশী বেশী ব্যবহার ও আবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এই আবর্তন থেকে বিশেষভাবে সেইসব লোকেরাই অংশ পাবে, যারা কোনো না কোনো কারণে নিজেদের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। [দফা ঃ ৬-১০, ১২-১৫, ১৭-১৯, ২১]।

[৯] এ স্কীম অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে আইন ও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের উপর অধিক নির্ভরশীল নয়। কতিপয় অপরিহার্য দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দেবার পর অবশিষ্ট সমস্ত প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং সমাজ সংশোধনের মাধ্যমে করা হয় যাতে স্বাধীন চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে অর্থনীতির যৌক্তিক দাবীসমূহ অক্ষুণ্ন রেখে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে। [দফা ঃ ৫-২২]

[১] সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষের মধ্যে শ্রেণীগত সংঘাত সৃষ্টি করার পরিবর্তে এ ব্যবস্থা সংঘাতের কার্যকারণসমূহকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা ও সহমর্মিতার স্পিরিট সৃষ্টি করে দেয়। [দফা ঃ ৪, ৬-১১, ১২, ১৫-১৭, ২১, ২২]।

এসব বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা যেভাবে নবী করীম (সা) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বাস্তবে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় কার্যকর করা হয়েছিল, তা থেকে বিধান ও দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা আরো অনেক বিস্তারিত রূপরেখা জানতে পারি। কিন্তু সে আলোচনা বর্তমান আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত। সে সম্পর্কে হাদীস, ফিকাহ, ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে ব্যাপক তথ্যাদি মওজুদ রয়েছে। বিশদভাবে জানার জন্য সেসব গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

গ্রন্থসূত্র

❑ কুরআনে হাকীম।
❑ বায়দাবী ঃ আনোয়ারুত তানযীল। সংস্করণ ঃ মুস্তফা আলবাবী হালবী, মিশর ১৩৩০ হিঃ (১৯১২ ইং)।
❑ আলূসী ঃ রূহুল মুয়ানী। সংস্করণ ঃ ইদারাতুত তবায়াতুল মুনীরীয়া, মিশর ১৩৪৫ হিঃ।
❑ আল জাসসাস ঃ আহকামুল কুরআন। আল বাহীয়া সংস্করণ, মিশর ১৩৪৭ হিঃ।
❑ ইবনুল আরাবী ঃ আহকামুল কুরআন। আস সায়াদা সংস্করণ, মিশর ১৩৩১ হিঃ।
❑ ইবনে জরীর ঃ জামেউল বয়ান। আল আমীরীয়া সংস্করণ, মিশর ১৩২৮ হিঃ।
❑ ইবনে কাসীর ঃ তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। সংস্করণ ঃ মুস্তফা মুহাম্মদ, মিশর ১৯৪৭ ইং।
❑ আয যমখশরী ঃ আল কাশশাফ। আল বাহীয়া সংস্করণ, মিশর ১৩৪৩ হিঃ।
❑ আল বুখারী ঃ সহীহ।
❑ মুসলিম ঃ সহীহ।
❑ আবু দাউদ ঃ সুনান।
❑ তিরমিযী ঃ সুনান।
❑ নাসায়ী ঃ সুনান।
❑ ইবনে মাজাহ ঃ সুনানে মুস্তফা
❑ আশ শওকানী ঃ নায়লুল আওতার। সংস্করণ ঃ দায়িরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ১৩৩৭ হিঃ।
❑ ইবনে আবদুল বার ঃ আল ইসতীয়াব। সংস্করণ ঃ ঐ
❑ ইবনে মনযূব ঃ লিসানুল আরব, বৈরুত ১৯৫৬ ইং।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও পুঁজিবাদের মধ্যে পার্থক্য

পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ইসলাম যে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক মতাদর্শ অবলম্বন করেছে তার ভিত্তিতে একটি কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ইসলাম নৈতিক শক্তি ও আইন—এ উভয়ের সাহায্য নিয়েছে। নৈতিক শিক্ষার সাহায্যে ইসলাম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মন মানসকে এ ব্যবস্থার স্বতস্ফূর্ত আনুগত্য করার জন্য তৈরী করে। অন্যদিকে আইনের বলে মানুষের উপর এমন সব বিধি নিষেধ আরোপ করে যার ফলে মানুষ এ ব্যবস্থার চৌহদ্দীর মধ্যে নিজেদেরকে আটকে রাখতে বাধ্য হয় এবং এর সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করে যেতে পারেনা। এ নৈতিক বিধি বিধান ও আইনসমূহ হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। নৈতিকতা, আইন এবং ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করার জন্য এসবের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

এক ঃ উপার্জনে বৈধ অবৈধের পার্থক্য

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হচ্ছে, ইসলাম এর অনুসারীদেরকে অর্থ উপার্জন করার অবাধ সুযোগ দেয় না; বরং উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ ও অবৈধতার পার্থক্য সৃষ্টি করে। এ পার্থক্যের একটা মূলনীতি রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, ধন উপার্জনের যেসব পন্থা ও উপায় অবলম্বিত হলে এক ব্যক্তির লাভ ও অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতি হয় তা সবই অবৈধ। অন্যদিকে যেসব উপায় অবলম্বন করলে ধন-উপার্জন প্রচেষ্টার সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ন্যায়সংগত সুফল ভোগ করতে পারে তা সবই বৈধ। এ মূলনীতিটি কুরআন মজীদে নিম্নোক্তভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٥ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا - (النساء : ٢٩-٣٠)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধনসম্পদ অবৈধ উপায়ে ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতি অনুযায়ী ব্যবসায়িক লেন-দেন করতে পারো। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে (অথবা পরস্পর পরস্পরকে) ধ্বংস করোনা। আল্লাহ তোমাদের

অবস্থার প্রতি করুণাশীল। যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম ক'রে যুল্‌ম সহকারে এরূপ করবে তাকে আমি অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করবো।" [আন নিসা ঃ ২৯-৩০]

এ আয়াতে পারস্পরিক লেন দেনকে ব্যবসা বলা হয়েছে। পারস্পরিক সম্মতিকে এর সাথে শর্ত হিসাবে সংযুক্ত করে এমন সব লেন-দেন অবৈধ গণ্য করা হয়েছে যার মধ্যে চাপ সৃষ্টি ও প্রতারণার কোনো উপকরণ থাকে অথবা এমন কোনো চালবাজী থাকে যা দ্বিতীয় পক্ষ জানতে পারলে এ লেন দেনে নিজের সম্মতি প্রকাশে কোনোদিনই প্রস্তুত হবে না। এরপর আরো জোর দেয়ার জন্য বলা হয়েছে "তোমরা পরস্পরকে ধ্বংস করোনা।" এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এ দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমরা একে অন্যকে ধ্বংস করোনা এবং দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি নিজের লাভের জন্য অন্যের সর্বনাশ করে সে যেন তার রক্তপান করে এবং পরিণামে সে এভাবে নিজের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে।

এ নীতিগত নির্দেশ ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অর্থ উপার্জনের নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোকে হারাম গণ্য করা হয়েছে ঃ

- উৎকোচ (আল বাকারা ১৮৮ আয়াত)
- ব্যক্তি, সমষ্টি নির্বিশেষে সবার সম্পদ আত্মসাত (আল বাকারা ২৮৩ ও আলে ইমরান ১৬১ আয়াত)
- চুরি (আল মায়িদা ৩৮ আয়াত)
- এতীমের অর্থ অন্যায়ভাবে তসরূপ (আন নিসা ১০ আয়াত); ওজনে কম করা (আল মুতাফ্‌ফিফীন ৩ আয়াত)
- চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উপকরণসমূহের ব্যবসা (আন নূর ১৯ আয়াত)
- বেশ্যাবৃত্তি ও দেহ বিক্রয়লব্ধ অর্থ (আন নূর ২, ৩৩ আয়াত)
- মদ উৎপাদন, মদের ব্যবসা ও মদ পরিবহণ (আল মায়িদা ৯ আয়াত)
- জুয়া ও এমন সব উপায় উপকরণ যেগুলোর মাধ্যমে নিছক ঘটনাচক্রে ও ভাগ্যক্রমে একদল লোকের সম্পদ অন্য একদল লোকের নিকট হস্তান্তরিত হয় (আল মায়িদা ৯০ আয়াত)
- মূর্তি গড়া, মূর্তি বিক্রয় ও মূর্তি উপাসনালয়ের সেবা (আল মায়িদা ৯০ আয়াত)
- ভাগ্য গণনা ও জ্যোতিষির ব্যবসা (আল মায়িদা ৯০ আয়াত)
- সুদ খাওয়া (আল বাকারা ২৭৫, ২৭৮ থেকে ২৮০ এবং আলে ইমরান ১৩০ আয়াত)

দুই ঃ ধন সঞ্চয়ের নিষেধাজ্ঞা

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হচ্ছে যে, বৈধ উপায়ে যে ধন উপার্জন করা হবে তা পুঞ্জীভূত ক'রে রাখা যাবে না। কারণ, এর ফলে ধনের আবর্তন বন্ধ হয়ে যায় এবং ধন-

বন্টনে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ধন সঞ্চয় করে রাশিকৃত ও পুঞ্জীভূত করে রাখে সে নিজে যে কেবল মারাত্মক নৈতিক রোগে আক্রান্ত হয় তাই নয় বরং মূলত সে সমগ্র মানব সমাজের বিরুদ্ধে একটি জঘন্যতম অপরাধ করে। এর ফল তার নিজের জন্যও খারাপ হয়। এজন্য কুরআন কার্পণ্য এবং কারুনের ন্যায় সম্পদ কুক্ষিগত ও পুঞ্জীভূত করে রাখার বিরোধিতা করেছে কঠোরভাবে। কুরআন বলে ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ - (آل‌عمران: ۱۸۰)

"যারা আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহে কৃপণতা করে, তারা যেন একথা মনে না করে যে, তাদের এ কাজ তাদের জন্য মঙ্গলজনক; বরং প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর।" [আলে ইমরান ঃ ১৮০]

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - (التوبة : ۳٤)

'যারা স্বর্ণ রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।' [আত তাওবা ঃ ৩৪]

এই ঘোষণা পুঁজিবাদের ভিত্তি-তে আঘাত হানে। উদ্বৃত্ত অর্থ জমা করে রাখা এবং জমাকৃত অর্থ আরো অধিক অর্থ সংগ্রহে খাটানো—এটিই হচ্ছে পুঁজিবাদের মূলকথা। কিন্তু ইসলাম আদতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ জমা করে রাখা পছন্দ করেনা।

তিন ঃ অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ

সঞ্চয় করার পরিবর্তে ইসলাম অর্থ ব্যয় করার শিক্ষা দেয়। কিন্তু ব্যয় করার অর্থ বিলাসিতা ও আয়েশ আরামের জীবন যাপন করে দু-হাতে অর্থ লুটানো নয়; বরং ব্যয় করার ক্ষেত্রে 'আল্লাহ্‌র পথে'র শর্ত আরোপ করে। অর্থাৎ সমাজের কোনো ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কাজে তা ব্যয় করতে হবে। এটিই হবে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلِ الْعَفْوَ - (البقرة : ۲۱۹)

"তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, তারা কী ব্যয় করবে? তাদেরকে বলে দাও, যা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত (তাই ব্যয় কর)।" [আল বাকারা ঃ ২১৯]

وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -(النساء:۳٦)

"আর সদ্ব্যবহার কর নিজের মা বাপ, আত্মীয়স্বজন, অভাবী মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, নিজের মোলাকাতি বন্ধুবর্গ, মুসাফির ও মালিকনাধীন

দাসদাসীদের সাথে।" [আন নিসা ঃ ৩৬]

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ - (الذريت : ١٩)

'তাদের অর্থসম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে।' [আয যারিয়াত আয়াত ঃ ১৯]

এখানে এসে ইসলাম ও পুঁজিবাদের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়।

বিত্তবান মনে করে, অর্থ ব্যয় করলে দরিদ্র হয়ে যাবে এবং সঞ্চয় করলে বিত্তশালী হবে। কিন্তু ইসলাম বলে, অর্থ ব্যয় করলে অর্থ কমে যাবে না বরং এতে বরকত হবে ও বৃদ্ধি হবে।

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ط (البقرة : ٢٦٨)

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের ন্যায় লজ্জাকর কাজের হুকুম দেয়; কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট মাগফেরাত ও অতিরিক্ত দানের ওয়াদা করেন।" [আল বাকারা ঃ ২৬৮]

বিত্তবান মনে করে কোনো কিছু ব্যয় করা হলে তা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে, না, তা নষ্ট হয়ে যায়নি বরং তার সর্বোত্তম লাভ তোমাদের নিকট ফিরে আসবে।

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ - (البقرة : ٢٧٢)

"সৎ কাজে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তা তোমরা পুরোপুরি ফেরত পাবে এবং তোমাদের উপর কোনোক্রমেই যুল্‌ম করা হবেনা।" [আল বাকারা ঃ ২৭২]

وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ٥ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ - (فاطر : ٢٩ - ٣٠)

"যারা আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে পোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন একটি ব্যবসায়ের আশা রাখে, যাতে কোনোক্রমেই লোকসানের সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ তাদেরকে এর বিনিময়ে পুরোপুরি ফল প্রদান করবেন বরং মেহেরবানী করে তাদেরকে আরো বেশী দান করবেন।" [ফাতির ঃ ২৯-৩০]

বিত্তবান মনে করে, সম্পদ আহরণ করে সুদী ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে সম্পদ বেড়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে, না, সুদের মাধ্যমে বরং সম্পদ কমে যায়। সৎকাজে অর্থ বিনিয়োগ করলেই সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ط (البقرة : ٢٧٦)

'আল্লাহ সুদ নির্মূল করেন এবং দান-সাদকাকে প্রতিপালন ও ক্রমবৃদ্ধি দান করেন।' [আল বাকারা ঃ ২৭৬]

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ - (الروم: ٣٩)

"তোমরা এই যে সুদ দাও মানুষের ধনসম্পদ বৃদ্ধির আশায়, জেনে রাখ, আল্লাহর নিকট তা কখনো বৃদ্ধি লাভ করেনা। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাকাত বাবদ যে অর্থ দান করে থাক একমাত্র তার মধ্যেই ক্রমবৃদ্ধি হয়ে থাকে।" [আর রূম ঃ ৩৯]

পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এটি আর একটি নতুন মতবাদ। ব্যয় করলে অর্থ বেড়ে যাবে এবং ব্যয়িত অর্থ নষ্ট হবে না তাই নয় বরং কিছুটা অতিরিক্ত লাভ ও কল্যাণসহ পূর্ণমাত্রায় ফিরে আসবে; অন্যদিকে সুদী ব্যবসা অর্থ বৃদ্ধির পরিবর্তে অর্থ হ্রাস ও লোকসানের সূচনা করবে এবং যাকাত ও সাদকার মাধ্যমে অর্থ হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে—এ মতবাদটি আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর মনে হবে। শ্রোতা মনে করে সম্ভবত এগুলো নিছক আখেরাতের সওয়াবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। নিঃসন্দেহে আখেরাতের সওয়াবের সাথে এসব কথার সম্পর্ক রয়েছে এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এটিই আসল গুরুত্বের অধিকারী। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এ দুনিয়াতেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এ মতাদর্শ একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধন সঞ্চয় করে সুদী ব্যবসায় নিয়োগ করার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ চতুর্দিক থেকে ধন আহরিত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে চলে আসবে। সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা প্রতিদিন কমে যেতে থাকবে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা সর্বত্র মন্দাভাব দেখা দেবে। জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে। অবশেষে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যার ফলে পুঁজিপতিরাও নিজেদের সঞ্চিত ধনসম্পদ অর্থ উৎপাদনের কাজে লাগাবার সুযোগ পাবেনা।[১] বিপরীত পক্ষে অর্থসম্পদ ব্যয় করলে এবং যাকাত ও সাদকা দান করলে জাতির সকল ব্যক্তির হাতে এ সম্পদ ছড়িয়ে পড়ে, প্রত্যেক ব্যক্তি যথেষ্ট ক্রয়-ক্ষমতার অধিকারী হয়, শিল্পোৎপাদন বেড়ে যায়, সবুজ ক্ষেতগুলো শস্যে ভরে ওঠে, ব্যবসা বাণিজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। এতে হয়তো কেউ লাখপতি-কোটিপতি হয় না কিন্তু সবার অবস্থা সচ্ছল হয় এবং পরিবার হয় সমৃদ্ধিশালী। এ শুভ-পরিণামসম্পন্ন অর্থনৈতিক মতাদর্শটির সত্যতা যাচাই করতে হলে আমেরিকার বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।[২] সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কারণে সেখানে ধন বন্টনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে এবং শিল্প ও বাণিজ্যের মন্দাভাব জাতির

---

১. রাসূলে করীম (সা) নিম্নোক্ত হাদীসটিতে একথার প্রতিই ইংগিত করেছেন ঃ

اِنَّ الرِّبٰوا وَاِنْ كَثُرَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ اِلٰى قُلٍّ -(ابن ماجه. بيهقى. احمد)

অর্থাৎ "সুদের পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন অবশেষে তা কম হতে বাধ্য।"

২. এ গ্রন্থ প্রণয়নের সময় আমেরিকায় যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক জীবনকে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় পৌঁছে দিয়েছে। এর তুলনায় ইসলামী যুগের প্রথম দিকের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যখন সেখানে পূর্ণাংগরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে জাতীয় সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার ফলে লোকেরা যাকাত গ্রহীতা খুঁজে বেড়াতো কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান পাওয়া যেতো না। এমন একজন লোকের সন্ধান পাওয়া যেতোনা, যে নিজেই যাকাত দেয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্জন করেনি। এ দুটি অবস্থাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে আল্লাহ সুদকে কিভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সাদকাকে ক্রমোন্নতি ও ক্রমবৃদ্ধি দান করেন তা দ্ব্যর্থহীনভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

ইসলাম পুঁজিবাদী মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক মানসিকতা সৃষ্টি করে। পুঁজিপতি একথা কল্পনাই করতে পারেনা যে, সুদ ছাড়া এক ব্যক্তি অর্থসম্পদ আরেক ব্যক্তিকে কেমন করে দিতে পারে। সে অর্থ ঋণ দিয়ে তার বিনিময়ে কেবল সুদই আদায় করেনা, বরং নিজের মূলধন ও তার সুদ আদায় করার জন্য ঋণগ্রহীতার বস্ত্র ও গৃহের আসবাবপত্রাদি পর্যন্ত ক্রোক করে নেয়। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, অভাবীকে কেবল ঋণ দিলেই হবে না, বরং তার আর্থিক অনটন যদি বেশী থাকে তাহলে তার নিকট কড়া তাকাদা করা যাবেনা, এমনকি, ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা না থাকলে তাকে মাফ করে দিতে হবে।

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ـ (البقرة : ٢٨٠)

"ঋণ গ্রহীতা যদি অত্যধিক অনটন পীড়িত হয়, তাহলে তার অবস্থা সচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত তাকে সুযোগ দাও; আর যদি তাকে মাফ করে দাও তাহলে তা হবে তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা কিছু জ্ঞান রাখতে, তাহলে এর কল্যাণকারিতা উপলব্ধি করতে পারতে।" [আল বাকারা ঃ ২৮০]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পারস্পরিক সাহায্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রথমে পারস্পরিক সাহায্য সমিতির তহবিলে অর্থ জমা করে আপনাকে এর সদস্য হতে হবে, তারপর আপনার যদি কখনো অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে সমিতি বাজারে প্রচলিত সাধারণ সুদের হারের তুলনায় কিছু কম হারে আপনাকে সুদী ঋণ দেবে। যদি আপনার কাছে অর্থ না থাকে তাহলে পারস্পরিক সাহায্য সমিতি থেকে আপনি কোনোই সাহায্য পাবেন না। বিপরীত পক্ষে ইসলাম যে পারস্পরিক সাহায্যের পরিকল্পনা দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, সামর্থবান লোকেরা প্রয়োজনের সময় তাদের কম সামর্থবান ভাইদেরকে কেবল ঋণই দেবে না বরং তাদের ঋণ আদায় করার বাপারেও সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে সাহায্য করবে। তাই 'আলগারেমীনা' অর্থাৎ ঋণগ্রস্তদের ঋণ আদায় করে দেয়াকেও যাকাতের অন্যতম ব্যয়ের খাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

পুঁজিপতি কখনো সৎকাজে কোনো অর্থ ব্যয় করলে নেহায়েত লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই তা করে থাকে। কারণ এ সংকীর্ণচেতা ব্যক্তি মনে করে যে, এ অর্থ ব্যয়ের

বিনিময়ে কমপক্ষে সুনাম ও সুখ্যাতি তার অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু ইসলাম বলে, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা উচিত নয় এবং প্রকাশ্যে বা গোপনে যা-ই ব্যয় করা হোক না কেন, সত্বর কোনো না কোনো আকারে এর প্রতিদান পাওয়া যাবে–এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্যও যেন এর পিছনে না থাকে। বরং কাজের পরিণতির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এ দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত করা যাবে সর্বত্রই দেখা যাবে, এ ব্যয়িত অর্থ সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং একের পর এক তা মুনাফা দিয়েই চলছে। "যে ব্যক্তি লোক দেখাবার উদ্দেশ্যে নিজের অর্থ ব্যয় করে, তার এ কাজকে এমন একটি প্রস্তরখণ্ডের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যার উপর ছিল মাটির আস্তরণ, সে এ মাটির মধ্যে বীজ বপন করেছিল কিন্তু পানির একটি প্রবাহ আসলো এবং সমস্ত মাটি ধুয়ে নিয়ে চলে গেলো। আর যে ব্যক্তি নিজের নিয়ত ঠিক রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করে, তার এ কাজকে এমন একটি উৎকৃষ্ট জমির সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যেখানে একটি উদ্যান রচনা করা হয়েছে, বৃষ্টি হলে সেখানে দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন হয়, আর বৃষ্টি না হলে নিছক ছোটখাট একটি স্রোতধারা তার জন্য যথেষ্ট।" [বাকারা ঃ ৩৬ রুকূ]

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ـ (البقرة : ٢٧١)

"যদি প্রকাশ্যে সাদকা দাও তাও ভালো; কিন্তু যদি গোপনে দাও এবং দরিদ্রদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও, তাহলে এটিই উত্তম হবে।" [আলবাকারা ঃ ২৭১]

পুঁজিপতি যদি কখনো সৎকাজে কোনো অর্থ ব্যয় করে তাহলে তার পিছনে তার আবেগ ও সদিচ্ছা থাকে না; বরং অনিচ্ছাকৃতভাবেই তা করে থাকে এবং এজন্য সে সবচেয়ে নিকৃষ্টমানের সম্পদ ব্যয় করে; তারপর নিজের শাণিত বাক্য-বাণে বিদ্ধ করে অর্থগ্রহীতার অর্ধেক প্রাণ বের করে নেয়। বিপরীতপক্ষে ইসলাম সবচেয়ে ভালো সম্পদ ব্যয় করা এবং এজন্য নিজের অনুগ্রহ প্রকাশ না করা, এমনকি প্রতিদানে কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এ আশাও পোষণ না করার শিক্ষা দেয়।

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ـ (البقرة : ٢٦٧)

"তোমরা যা কিছু উপার্জন করেছো, আর যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় কর; আর বাছাই করে নিকৃষ্টতর বস্তু ব্যয় করোনা।" [আল বাকারা ঃ ২৬৭]

لَا تُبْطِلُوا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى ـ (البقرة: ٢٦٤)

'অনুগ্রহ প্রকাশ করে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের সাদকাসমূহ ধ্বংস করো না।' [আল বাকারা ঃ ২৬৪]

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ۝ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا - (الدهر: ٨ - ٩)

"আর তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মিসকীন এতীম ও কয়েদীকে আহার করায় এবং বলে, আমরা তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, (এজন্য) আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রত্যাশী নই।" [আদ দাহর ঃ ৮-৯]

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুটি মানসিকতার মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান রয়েছে সে প্রশ্ন না হয় বাদই দিলাম। নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও দু'টি মতাদর্শের মধ্যে ইসলামই হচ্ছে অধিক শক্তিশালী এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর নির্ভুল। অতঃপর কল্যাণ ও ক্ষতি প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমি ইসলামের যে আদর্শ তুলে ধরেছি সেসব সামনে রেখে, ইসলাম কোনো অবস্থায় সুদী কারবারকে বৈধ গণ্য করতে পারে—এ কথা চিন্তা করার কোনো অবকাশ আছে কি?

চার ঃ যাকাত

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম যে দৃষ্টিভংগি পেশ করেছে তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ধন একস্থানে পুঞ্জীভূত ও কুক্ষিগত হয়ে থাকতে পারবে না; ইসলামী সমাজের যে কয়জন লোক তাদের উচ্চতর যোগ্যতা ও সৌভাগ্যের কারণে নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ আহরণ করবে, ইসলাম চায় তারা যেন এই সম্পদ পুঞ্জীভূত করে না রাখে, বরং এগুলো ব্যয় করে এবং এমন সব খাতে ব্যয় করে যেখান থেকে ধনের আবর্তনের ফলে সমাজের স্বল্পবিত্তের লোকেরাও যথেষ্ট অংশ লাভ করতে সক্ষম হবে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম একদিকে উন্নত নৈতিক শিক্ষা প্রদান, উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শনের শক্তিশালী অস্ত্র প্রয়োগ করে দানশীলতা ও যথার্থ পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার প্রবণতা সৃষ্টি করে। যাতে লোকেরা নিজেদের মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা আকাংখা অনুযায়ী ধনসম্পদ সঞ্চয় করাকে খারাপ জানবে এবং তা ব্যয় করতে উৎসাহী ও আগ্রহী হবে। অন্যদিকে ইসলাম এমনসব আইন প্রণয়ন করে, যার ফলে বদান্যতার এ শিক্ষা সত্ত্বেও নিজেদের অসৎ মনোবৃত্তির কারণে যেসব লোক সম্পদ আহরণ ও পুঞ্জীভূত করে রাখতে অভ্যস্ত হয় অথবা যাদের নিকট কোনো না কোনোভাবে সম্পদ সঞ্চিত হয়ে যায় তাদের সম্পদ থেকে সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানার্থে কমপক্ষে একটি অংশ অবশ্যই কেটে নেয়া হবে। একেই যাকাত বলা হয়। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এ যাকাতকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করা হয়েছে, এমনকি একে ইসলামের একটি মূলস্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নামাযের পরে এ যাকাতের উপরই সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অর্থসম্পদ সঞ্চয় করে, যাকাত না দেয়া পর্যন্ত তার ঐ সম্পদ হালাল হতে পারে না।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا - (التوبة : ١٠٣)

"(হে নবী!) তাদের ধনসম্পদ থেকে একটি সাদকা গ্রহণ কর, যা ঐ ধনসম্পদকে পাক পবিত্র ও হালাল করে দেবে।" [আত তাওবা ঃ ১০৩]

এখানে 'একটি সাদকা' শব্দটি থেকে সাদকার একটি বিশেষ পরিমাণ বুঝা যায়। এ সঙ্গে রাসূলে করীম (সা)-কে এটি আদায় করার নির্দেশ দেয়ার ফলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাধারণ স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সাদকা থেকে আলাদা এটি একটি ওয়াজিব ও ফরয সাদকা অর্থাৎ যাকাত এবং বিত্তশালী লোকদের নিকট থেকে এ সাদকা অবশ্যই আদায় করতে হবে। কাজেই এ নির্দেশ অনুযায়ী রাসূলে করীম (সা) বিভিন্ন প্রকার সম্পদের জন্য নিসাবের (যে সর্বনিম্ন পরিমাণের উর্ধে যাকাত অপরিহার্য) একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর নিসাব পরিমাণ বা তদূর্ধ বিভিন্ন প্রকার সম্পদের উপর যাকাতের বিভিন্ন হার নির্ধারণ করেছেন। সোনা, রূপা ও নগদ টাকা পয়সার উপর শতকরা আড়াই ভাগ এবং কৃষি উৎপাদনের উপর সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমি হলে শতকরা ৫ ভাগ ও সেচ ব্যবস্থার আওতা বহির্ভূত জমি হলে শতকরা ১০ ভাগ, ব্যবসায়িক পণ্যের উপর শতকরা আড়াই ভাগ, খনিজ দ্রব্যাদি (নিজস্ব মালিকানাধীন) ও গুপ্তধনের উপর শতকরা ২০ ভাগ যাকাত ধার্য করেছেন। এভাবে ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত গবাদি পশু প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণীর উপর বিভিন্ন হারে যাকাত ধার্য করেছেন।

আয়াতের শেষ শব্দটি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বিত্তশালী ব্যক্তির নিকট যে অর্থসম্পদ সঞ্চিত হয় ইসলামের দৃষ্টিতে তা অপবিত্র এবং তার মালিক তা থেকে প্রতিবছর কমপক্ষে একটি বিশেষ পরিমাণ আল্লাহর পথে ব্যয় না করা পর্যন্ত তা পবিত্র হতে পারেনা। 'আল্লাহ্র পথে' শব্দটির অর্থ কি? আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর অর্থসম্পদের প্রয়োজন নেই, তিনি অভাবীও নন। কাজেই তাঁর 'পথ' বলে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, বিত্তশালীদের সম্পদ ব্যয় করে জাতির দরিদ্র ও অভাবী লোকদেরকে সচ্ছল করার চেষ্টা করতে হবে এবং এমনসব কল্যাণমূলক কাজে এ সম্পদ নিয়োগ করতে হবে যা থেকে সমগ্র জাতি লাভবান হবে।

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ - (التوبة : ٦٠)

"মূলত সাদকা-যাকাত হচ্ছে ফকির[৩] ও মিসকীনদের[৪] জন্য এবং তাদের জন্য

---

৩. ফকির এমন সব লোকদেরকে বলা হয় যারা নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে কম রোজগার করার কারণে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। (লিসানুল আরব)

৪. মিসকীনদের সংজ্ঞা বর্ণনা করে হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ যারা অর্থ উপার্জন করতে পারে না অথবা অর্থ উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে যে দরিদ্র শিশু এখনো অর্থ উপার্জনের যোগ্যতা রাখে না এবং যেসব বেকার ও রুগ্নব্যক্তি সাময়িকভাবে উপার্জনের যোগ্যতা

যাদেরকে সাদকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত করা হয়, তাদের জন্য যাদের হৃদয়কে শক্তিশালী করার প্রয়োজন হয়,[৫] লোকদেরকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য, ঋণগ্রস্তদের ঋণমুক্ত করার জন্য, আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য এবং মুসাফিরদের[৬] জন্য।" [আত তাওবা ঃ ৬০]

এটিই মুসলমানদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি, তাদের ইনসিউরেন্স কোম্পানী এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড। এখান থেকেই মুসলিম সমাজের বেকারদেরকে সাহায্য করা হয়। তাদের অক্ষম, বিকলাংগ, রুগ্ন, এতীম, বিধবা ও কর্মহীনদেরকে এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রতিপালন করা হয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, এ ব্যবস্থা মুসলমানদেরকে ভবিষ্যত অন্ন সংস্থানের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে। এর সহজ সরল নীতি হচ্ছে, আজ এক ব্যক্তি বিত্তবান কাজেই সে অন্যকে সাহায্য করবে, আগামীকাল যখন সে অভাবী হয়ে পড়বে তখন অন্যেরা তাকে সাহায্য করবে। দরিদ্র হয়ে পড়লে আমার অবস্থা কি হবে, একথা চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। মরে গেলে স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের কি অবস্থা হবে? কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে পড়লে, পীড়িত হয়ে পড়লে, ঘরবাড়ীতে আগুন লেগে গেলে, বন্যাকবলিত হয়ে পড়লে, দেউলিয়া হয়ে গেলে তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে এবং এসব বিপদের হাত থেকে উদ্ধারের কি উপায় হবে— এসব চিন্তা করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। সফর অবস্থায় টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেলে জীবিকা নির্বাহের কি উপায় হবে? একমাত্র যাকাত ব্যবস্থাই এ সমস্ত চিন্তা থেকে মানুষকে চিরন্তন মুক্তি দান করে। এক্ষেত্রে ইসলামী সমাজের একজন সদস্যের কাজ কেবল এতটুকুই থাকে যে, সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসম্পদের একটি অংশ আল্লাহর ইনসিউরেন্স কোম্পানীতে জমা দিয়ে বীমা করে নেবে। প্রকৃতপক্ষে এ সময় এ অর্থের তার কোনো প্রয়োজন নেই। এ অর্থ এখন যাদের প্রকৃত প্রয়োজন তাদের কাজে লাগবে। কাল যখন তার বা তার সন্তান সন্ততিদের প্রয়োজন দেখা দেবে তখন কেবল তার নিজের প্রদত্ত সম্পদই নয় বরং তার চেয়ে অনেক বেশী সম্পদ ফেরত পাবে।

এখানে আবার দেখা যায়, পুঁজিবাদ এবং ইসলামের নীতি ও পদ্ধতির মধ্যে পরিপূর্ণ বৈপরীত্য। পুঁজিবাদের দাবি হচ্ছে, অর্থ সঞ্চয় করতে হবে এবং তার পরিমাণ বাড়াবার জন্য সুদ নিতে হবে। যার ফলে এ নালা দিয়ে গড়িয়ে আশেপাশের লোকদের সবার টাকা পয়সা এ পুকুরে এসে পড়বে। বিপরীতপক্ষে ইসলাম নির্দেশ দেয়, প্রথমত টাকা পয়সা জমা করে বা আটকে রাখা যাবে না; আর যদি কখনো জমা হয়ে যায়, তাহলে এ পুকুর থেকে নালা কেটে দিতে হবে, যাতে শুকিয়ে যাওয়া ক্ষেত্রগুলোতে পানি পৌঁছে

বঞ্চিত—তারা সবাই মিসকীন।

৫. এ দলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এমনসব নওমুসলিম যারা কুফর থেকে ইসলামে প্রবেশ করার কারণে সংকট জর্জরিত হয়েছে।।

৬. মুসাফির ব্যক্তির গৃহে সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেও সফর অবস্থায় অর্থ সংকটে পড়লে অবশ্যই সে যাকাত গ্রহণের হকদার।

যায় এবং আশেপাশের সমস্ত জমি তরতাজা হয়ে সবুজে শ্যামলে ভরে ওঠে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধন আবদ্ধ ও জমাটবদ্ধ হয়ে থাকে; কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় তা মুক্ত, স্বাধীন ও অবাধ গতিশীল। পুঁজিবাদের পুকুর থেকে পানি নিতে হলে প্রথমে আপনার পানি সেখানে অবশ্যই থাকতে হবে, নয় তো এক কাতরা পানি আপনি সেখান থেকে পেতে পারেন না। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থার পুকুরের নিয়ম হচ্ছে যে, যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকবে সে তার বাড়তি পানি ঐ পুকুরে ঢেলে দিয়ে যাবে, আর যার পানির প্রয়োজন হবে সে ওখান থেকে পানি নিয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, মৌলিকত্ব ও স্বভাব প্রকৃতির দিক দিয়ে এ দু'টি পদ্ধতি পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত। একটি অর্থব্যবস্থায় এ দুই বিপরীতধর্মী মতাদর্শকে একত্রিত করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ ধরনের বিপরীতধর্মী মতাদর্শের একত্র সমাবেশের কথা কল্পনাই করতে পারেনা।

পাঁচ ঃ মীরাসী আইন

নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয়, আল্লাহর পথে ব্যয় ও যাকাত আদায় করার পরও যে অর্থসম্পদ কোনো একহাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে তাকে বিকেন্দ্রীভূত করার জন্য ইসলাম আর একটি পন্থা অবলম্বন করেছে। একে বলা হয় মীরাসী আইন। এ আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি অর্থসম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করবে তা যতো কম বা বেশী হোক না কেন, তা কেটে টুকরো টুকরো করা হবে এবং নিকট ও দূরের সকল আত্মীয়ের মধ্যে ক্রমানুসারে বন্টন করা হবে। যদি এমন কোনো ব্যক্তি থাকে, যার কোনো ওয়ারিশ নেই, তাহলে তাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করার অধিকার দেয়ার পরিবর্তে, তার সম্পদ মুসলমানদের বায়তুলমালে জমা করে দিতে হবে। তাহলে সমগ্র জাতি এ থেকে লাভবান হতে পারবে। মীরাস বন্টনের এ আইনের অস্তিত্ব একমাত্র ইসলামেই দেখা যায়, অন্য কোনো অর্থব্যবস্থায় এর অস্তিত্ব নেই। অন্যান্য অর্থব্যবস্থা এ ব্যাপারে যে নীতি নির্ধারণ করেছে তা এক ব্যক্তি যে অর্থ সঞ্চিত করে রেখে যায়, তার মৃত্যুর পর তা এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট কেন্দ্রীভূত রাখতে চায়।[৭] কিন্তু ইসলাম সম্পদ কেন্দ্রীভূত করার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতি, এর ফলে অর্থের আবর্তন সহজতর হয়।

ছয় ঃ গনীমতলব্ধ সম্পদ ও বিজিত সম্পত্তি বন্টন

এ ক্ষেত্রেও ইসলাম একই দৃষ্টিভংগির অধিকারী। যুদ্ধে সেনাবাহিনী যে গনীমতের অর্থ (শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত সম্পদ) হস্তগত করে, সে সম্পর্কে ইসলাম একটি বিশিষ্ট আইন প্রণয়ন করেছে। এ অর্থসম্পদ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। চারভাগ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হয় এবং অবশিষ্ট একভাগ সাধারণ জাতীয় কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করার জন্য রেখে দেয়া হয়।

---

৭. জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার (Primogeniture) এবং একান্নবর্তী পরিবার (Joint Family System) প্রথা এ নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ - (الانفال: ٤١)

"জেনে রেখো, গনীমত হিসেবে তোমরা যাকিছু হস্তগত কর, তার এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, রাসূলের নিকটাত্মীয়, এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।" [আনফাল ঃ ৪১]

আল্লাহ ও রাসূলের অংশ বলতে এমন অংশকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের আওতাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে দেয়া হয়েছে।

যাকাতে রাসূলের নিকটাত্মীয়দের কোনো অংশ ছিল না বলে এখানে তাদের অংশ রাখা হয়েছে।

অতঃপর এতে আরো তিন শ্রেণীর অংশ বিশেষভাবে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। জাতির এতীম শিশুদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে জীবন সংগ্রামে অংশ নেয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য এতে তাদের অংশ রাখা হয়েছে। মিসকীনদের অংশ রাখা হয়েছে—বিধবা মহিলা, বিকলাঙ্গ, অক্ষম, রুগ্ন ও অভাবী প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। আর রাখা হয়েছে ইবনুস সাবীল অর্থাৎ মুসাফিরদের অংশ। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে মুসাফিরকে আপ্যায়ন করার প্রবণতা সৃষ্টি করেছে। এ সঙ্গে যাকাত, সাদকা ও যুদ্ধলব্ধ গনীমতের সম্পদেও তার অংশ রেখেছে। এ ব্যবস্থার কারণে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ্রমণ-পর্যটন, শিক্ষা-অধ্যয়ন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের জন্য যাতায়াত সহজতর হয়েছে।

যুদ্ধের ফলে ইসলামী রাষ্ট্র যেসব সম্পদ সম্পত্তির মালিক হয় ইসলাম সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন রাখার বিধান দিয়েছে।

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۚ...... لِلْفُقَرَآءِ
الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ ..... وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ
وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...... وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ - (الحشر: ٧-١٠)

"জনপদের অধিবাসীদের নিকট থেকে আল্লাহ্ 'ফায়' (বিনাযুদ্ধে শত্রুপক্ষের যেসব সম্পদ হস্তগত হয়) হিসেবে যা কিছু দান করেছেন তা আল্লাহ, তাঁর রাসূল, রাসূলের নিকটাত্মীয়, এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য, যাতে এগুলো কেবলমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।..... আর এর মধ্যে অভাবী মুহাজিরদেরও অংশ রয়েছে, যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সহায় সম্পদ থেকে বেদখল করে নির্বাসিত করা হয়েছে।..... আর তাদের অংশ রয়েছে যারা মুহাজিরদের আসার আগে মদীনায় ঈমান এনেছিল।..... আর তাদের পরে ভবিষ্যতে আগমনকারী বংশদরদেরও অংশ রয়েছে।" [আল হাশর ঃ ৭-১০]

এ আয়াতগুলোতে কেবলমাত্র 'ফায়লব্ধ' অর্থের ব্যয়ক্ষেত্রগুলোর বিশদ বর্ণনা করা হয়নি; বরং এইসঙ্গে যে উদ্দেশ্যে ইসলাম ফায়লব্ধ অর্থসম্পদ বন্টন তথা সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করেছে সেদিকেও সুস্পষ্ট ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ -

'অর্থসম্পদ যেন কেবলমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।' কুরআন মজীদ ছোট একটি বাক্যের মধ্যে যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছে সেটিই হচ্ছে সমগ্র ইসলামী অর্থব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর।

সাত ঃ মিতব্যয়িতার নির্দেশ

ইসলাম একদিকে ধনসম্পদ সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে আবর্তন করা ও ধনীদের সম্পদ থেকে নির্ধনদের অংশ লাভ করার ব্যবস্থা করেছে, অন্যদিকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হবার নির্দেশ দিয়েছে। এভাবে অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কখনো প্রান্তিকতার আশ্রয় নিয়ে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করবে না। এক্ষেত্রে কুরআনের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا - (بنی اسرائیل: ٢٩)

"আর নিজের হাত না একেবারে গলায় বেঁধে রাখবে, আর না একেবারে তাকে খুলে দিবে, যার ফলে পরবর্তীকালে আক্ষেপ করে বসে থাকার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়।" [বনী ইসরাঈল ঃ ২৯]

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا - (الفرقان: ٦٧)

"আর আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দারা যখন ব্যয় করে, অপব্যয় করে না, আবার কার্পণ্যও করেনা, বরং এ দুটির মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করে।" [আল ফুরকান ঃ ৬৭]

এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে থেকেই অর্থ ব্যয় করে। তার অর্থব্যয় যেন কখনো এমন পর্যায়ে না পৌছায়, যার ফলে তা তার আয়ের অংককে ছাড়িয়ে যায় এবং নিজের আজেবাজে খরচের জন্য তাকে অন্যের দ্বারে হাত পাততে হয়, অথবা অন্যের উপার্জনে ভাগ বসাতে হয় এবং যথার্থ প্রয়োজন ছাড়াই অন্যের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। অতঃপর গায়ের জোরে সে ঋণদাতাকে কাঁচকলা দেখিয়ে ফিরবে অথবা ঋণ পরিশোধ করার জন্য নিজের সব রকমের অর্থনৈতিক উপকরণ ব্যবহার করে অবশেষে ফতুর হয়ে ফকীর ও মিসকীনদের খাতায় নিজের নাম লেখাবে। আবার সে যেন নিজের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের তুলনায় অনেক কম খরচ করার মতো কার্পণ্যও না দেখায়। নিজের আয় ও অর্থনৈতিক উপায় উপকরণের সীমার মধ্যে থেকে ব্যয় করার অর্থ এ নয় যে, সে ভালো আয় উপার্জন করলে নিজের

সব টাকা পয়সা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আয়েশ আরাম ও ভোগ বিলাসিতায় উড়িয়ে দেবে, আর অন্যদিকে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশীরা চরম সংকটের মধ্যে দিন যাপন করবে। এ ধরনের স্বার্থান্ধ ব্যয়বাহুল্যকে ইসলাম অপচয় বলে গণ্য করেছে।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا - (بنی اسرائیل: ۲۶-۲۷)

“নিজের নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার পৌঁছে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকেও তাদের অধিকার দান কর। বাজে খরচ করো না। যারা অযথা ও বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রব—প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ—নাফরমান।” [বনী ইসরাইল ঃ ২৬-২৭]

ইসলাম এক্ষেত্রে কেবলমাত্র নৈতিক শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এসঙ্গে কার্পণ্য ও অমিতব্যয়িতার চূড়ান্ত অবস্থা প্রতিরোধের জন্য আইনও প্রণয়ন করেছে। ধন বন্টনের ভারসাম্য বিনষ্টকারী সকল পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। জুয়াকে হারাম ঘোষণা করেছে। মদ্যপান ও ব্যভিচারের পথ রোধ করেছে। অনর্থক ফূর্তিবাজী, তামাশা ও কৌতুকের এমন ব্যয়বহুল অভ্যাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, যেগুলোর অনিবার্য পরিণতি অর্থ ও সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। সঙ্গীতের স্বাভাবিক প্রবণতাকে এমন পর্যায়ে উপনীত হতে দেয়নি যেখানে সঙ্গীতপ্রিয়তা ও সঙ্গীতের মধ্যে ঐকান্তিক মগ্নতা মানুষের মধ্যে বহুবিধ নৈতিক ও আত্মিক ত্রুটি সৃষ্টির সাথে সাথে তার অর্থনৈতিক জীবনেও বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণ হয়। সৌন্দর্য পিপাসার স্বাভাবিক প্রবণতাকেও একটি সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। বহু মূল্যবান পরিচ্ছদ, হীরা ও মণি-মানিক্যের অলংকার, সোনা ও রূপার তৈজসপত্রাদি, চিত্র ও ভাস্কর মূর্তি সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা)-এর যে নির্দেশাবলী বিধৃত হয়েছে, তার মধ্যে বহুতর কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এসব কল্যাণের মধ্যে একটি মহত্তর কল্যাণ হচ্ছে এই যে, যে ধনসম্পদ বহুসংখ্যক দরিদ্র ও অভাবী ভাইদের জীবনের নিম্নতম অপরিহার্য প্রয়োজনাদি পূর্ণ করতে পারে এবং তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে দিতে পারে, তাকে নিছক নিজের দেহ ও গৃহসজ্জায় ব্যয় করা সৌন্দর্যপ্রীতি নয়, বরং নিকৃষ্ট পর্যায়ের হৃদয়হীনতা ও স্বার্থপরতার পরিচায়ক।

মোটকথা ইসলাম একদিকে নৈতিক শিক্ষা ও অন্যদিকে সুনির্দিষ্ট আইন কানুনের মাধ্যমে মানুষকে সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবন যাপনের নির্দেশ দেয়। এ অনাড়ম্বর জীবনে মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার সীমানা কোনোক্রমেই এতটা ব্যাপকতর হতে পারে না, যার ফলে মধ্যম মানের আয় উপার্জনে সংসার চালানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং নিজের স্বাভাবিক সীমার বাইরে গিয়ে তাকে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসাতে হবে অথবা যদি সে মধ্যম মানের অধিক আয় করতে সমর্থ হয়, তাহলে নিজের উপার্জিত যাবতীয় অর্থসম্পদ নিজেই ভোগ করবে এবং নিজের অপারগ ভাইদের সাহায্য করবে না, যারা মধ্যম মানের কম উপার্জন করে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি ও লক্ষ্য[১]

আমাকে বিশেষ কয়েকটি প্রশ্নের উপর আলোকপাত করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। আলোচনার পূর্বাহ্নেই আমি প্রশ্ন ক'টি আপনাদের পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছি। তাতে আমার আলোচনার পরিসর সম্পর্কে আপনারা কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারবেন। প্রশ্নগুলো হচ্ছে ঃ

এক ঃ ইসলাম কি কোনো অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেছে? করে থাকলে তার খসড়া পেশ করুন। উপরন্তু ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন সে খসড়ায় কোন্ ধরনের মর্যাদা লাভ করেছে?

দুই ঃ যাকাত ও সাদকার অর্থ কি অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যেতে পারে?

তিন ঃ আমরা কি সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারি?

চার ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান?

এ প্রশ্নগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন। কিন্তু সময় সংক্ষেপ হেতু এবং বিশেষ করে, আজকের আলোচনা সভায় উচ্চশিক্ষিত সমাজের নিকট আমার বক্তব্য উপস্থাপনার কারণে, এ প্রশ্নগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনাই আমি যথেষ্ট মনে করছি।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার ধরন

প্রথম প্রশ্নের দু'টি অংশ রয়েছে। এক ঃ ইসলাম কি কোনো অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেছে? করে থাকলে তার খসড়া পেশ করুন। দুই ঃ সে খসড়ায় ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন কোন্ ধরনের মর্যাদা লাভ করেছে? প্রশ্নের প্রথমাংশের জবাবে বলা যায়, ইসলাম অবশ্যই একটি অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেছে। তবে, ইসলাম প্রতি যুগের উপযোগী এমন একটি বিস্তারিত অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেছে যেখানে অর্থনৈতিক বিধানের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত সমাধান দেয়া হয়েছে, এ অর্থে তা একটি অর্থনৈতিক বিধান নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, ইসলাম আমাদেরকে এমন কিছু মূলনীতি

---

১. আধুনিক বিশ্বের খ্যাতনামা মনিষী ও চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৬৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে ইসলামের অর্থব্যবস্থার উপর এক সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। এ পুস্তিকাটি তারই হুবহু বাংলা অনুবাদ।

দিয়েছে, যার ভিত্তিতে আমরা নিজেরাই প্রতি যুগের উপযোগী একটি অর্থনৈতিক বিধান রচনা করতে পারি। কুরআন ও হাদীস গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে ইসলামের একটি রীতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে এই যে, ইসলাম জীবনের প্রতিটি বিভাগের একটি চৌহদ্দী নির্ধারণ করে দেয় এবং আমাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, এই চতুঃসীমার মধ্যে থেকে তোমরা নিজেদের জীবনের এ বিভাগটি গড়ে তোল। এর বাইরে তোমরা যেতে পারোনা। তবে এই চতুঃসীমার মধ্যে থেকে তোমরা নিজেদের অবস্থা, প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বিস্তারিত বিধান রচনা করতে পারো। ইসলাম এভাবেই ব্যক্তিগত জীবনক্ষেত্র থেকে শুরু করে সভ্যতা সংস্কৃতির সকল বিভাগে মানুষকে পথনির্দেশ দিয়েছে। পথনির্দেশের এই একই পদ্ধতি আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও অবলম্বিত হয়েছে। এখানেও ইসলাম আমাদেরকে কতিপয় মূলনীতি ও চতুঃসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এরই মধ্যে অবস্থান করে আমাদের নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো বিনির্মাণে অগ্রসর হতে হবে এবং প্রত্যেক যুগ-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্কিত যাবতীয় বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিধান রচনার কাজ চালাতে হবে। অতীতে এভাবেই এ কাজ সম্পাদিত হয়ে এসেছে।

ইসলামী ফিকাহ্ গ্রন্থগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে, আমাদের ফকীহ্গণ এই চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থান করেই স্ব স্ব যুগের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেছিলেন। ফকীহ্গণ যে অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেন, তা ইসলামের মূলনীতি থেকেই গৃহীত এবং ইসলাম নির্ধারিত চতুঃসীমার মধ্যে তার অবস্থান। সেসব খুঁটিনাটি বিধানগুলির যে অংশ আমাদের বর্তমান প্রয়োজন পূর্ণ করে, তা আমরা হুবহু গ্রহণ করে নেব; আর এ ছাড়া বর্তমানে আমাদের সামনে যেসব নতুন প্রয়োজন ও সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেগুলির জন্য আমরা নতুন বিধান রচনা করতে পারি। তবে সেসব বিধান অবশ্যি ইসলাম প্রদত্ত মূলনীতি থেকে গৃহীত হতে হবে এবং ইসলাম নির্ধারিত চতুঃসীমার (Four Corners) মধ্যে সেগুলিকে অবস্থান করতে হবে।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌল উদ্দেশ্য

ইসলামের একটি অর্থনৈতিক বিধান রয়েছে। এ কথার অর্থ এখন সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে ইসলাম আমাদেরকে যে মূলনীতি দিয়েছে তা বর্ণনা করার পূর্বে আমি ইসলামী অর্থব্যবস্থার উদ্দেশ্যাবলী (Objectives) আলোচনা করতে চাই। এ উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে, ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি অনুধাবন করা, অবস্থা ও প্রয়োজনের সাথে সেগুলির সামঞ্জস্য বিধান করা এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার যথার্থ প্রাণসত্তা অনুযায়ী বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিধান রচনা করা সম্ভব নয়। এখানে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ পেশ করা হলো ঃ

ক. ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষের স্বাধীনতা সংরক্ষণের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং মানব জাতির কল্যাণার্থে যতটুকু অপরিহার্য কেবলমাত্র ততটুকু

বিধি নিষেধই তার উপর আরোপ করেছে। ইসলাম মানুষের স্বাধীনতার উপর অনেক বেশী গুরুত্ব দান করেছে। এর কারণ হচ্ছে, ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। এখানে সমষ্টিগত জবাবদিহির কোনো ধারণাই নেই। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কাজের জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে দায়ী এবং ব্যক্তিগতভাবেই তার নিজের কাজের জবাব দিতে হবে। এ জবাবদিহির জন্য মানুষের নিজস্ব ঝোঁকপ্রবণতা, যোগ্যতা ও নিজের ব্যক্তিগত নির্বাচন অনুযায়ী তার ব্যক্তিসত্তার উন্নয়নের সর্বাধিক সুযোগ থাকতে হবে। এজন্য ইসলাম ব্যক্তির নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সাথে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। যেখানে ব্যক্তি-মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করা হয়, সেখানে তার নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাও বিলুপ্ত হয়। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়, যে ব্যক্তি নিজের অর্থনৈতিক ব্যাপারে অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের মুখাপেক্ষী, সে নিজস্ব কোনো স্বাধীন চিন্তা পোষণ করলেও তা কার্যকর করার স্বাধীনতা তার থাকে না। এ কারণে ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে নীতি দান করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সর্বাধিক স্বাধীনতা দান করা হয় এবং কেবলমাত্র যথার্থ মানবিক কল্যাণের স্বার্থে যেটুকু অপরিহার্য, সে পরিমাণ বিধি নিষেধই তার উপর আরোপ করা হয়। এজন্য ইসলাম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণমানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, জনগণ নিজেদের ইচ্ছামত এ সরকার পরিবর্তন করতে পারবে। জনগণের ইচ্ছা বা তাদের আস্থাভাজন প্রতিনিধিদের পরামর্শ অনুযায়ী সরকারের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে। এ ব্যবস্থার সমালোচনা বা এ সম্পর্কে মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা জনগণের থাকবে। সরকার কোনো ক্ষেত্রে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হবেনা; বরং কুরআন ও সুন্নাহর উচ্চতর আইন ও বিধান তার জন্য ক্ষমতার যে সীমা নির্দেশ করেছে, তার মধ্যে অবস্থান করেই সে কাজ করে যাবে। উপরন্তু ইসলামে আল্লাহর পক্ষ থেকে জনগণকে স্থায়ীভাবে মৌলিক মানবাধিকার নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এগুলি অপহরণ করার অধিকার কারোর নেই। ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ ও ব্যক্তিসত্তার উন্নয়ন রোধকারী কোনো প্রকার নির্যাতন ও একনায়কত্বমূলক ব্যবস্থা যাতে তার উপর চেপে বসতে না পারে, সে উদ্দেশ্যেই এসব ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়েছে।

খ. নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির সামঞ্জস্য

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ইসলাম মানুষের নৈতিক বিকাশ ও অগ্রগতিকে মৌলিক গুরুত্ব দান করে। এ উদ্দেশ্যে সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি যাতে স্বাধীনভাবে সৎকর্ম করার সর্বাধিক সুযোগ লাভ করে, তার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এভাবে মানুষের জীবনে দয়া, প্রেম, বদান্যতা, সহানুভূতি, পরোপকার ও অন্যান্য নৈতিক গুণাবলী বিশেষভাবে স্থান লাভ করে। তাই অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম কেবলমাত্র আইন ও সংবিধানের উপর নির্ভর করেনা। বরং এ ব্যাপারে ঈমান, ইবাদত, শিক্ষা ও নৈতিক অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের আভ্যন্তরীণ ও মানসিক সংস্কার সাধন, তার রুচি ও চিন্তাপদ্ধতির

পরিবর্তন এবং তার মধ্যে এমন শক্তিশালী নৈতিক অনুভূতি সৃষ্টি করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে যার সাহায্যে সে নিজে ইনসাফ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম হয়। এ সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরও কার্যসিদ্ধি না হলে, মুসলমানদের সমাজের অবশ্যই এতটুকু প্রাণশক্তি থাকতে হবে যার ফলে সামাজিক চাপের মুখে মানুষকে ইসলামী বিধি বিধানের অনুগত রাখা সম্ভব হয়। এ ব্যবস্থা যথেষ্ট প্রমাণিত না হলে, ইসলাম আইনের শক্তি ব্যবহার করে। এভাবে অবশেষে শক্তির সাহায্যে ইনসাফ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। যে সমাজ ব্যবস্থা ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কেবলমাত্র আইনের শক্তির উপর নির্ভরশীল হয় এবং মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে স্বেচ্ছায় ন্যায়ের পথে চলার শক্তি তিরোহিত করে দেয়, ইসলাম সে ব্যবস্থাকে ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ মনে করে।

গ. সহযোগিতা, সামঞ্জস্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা

তৃতীয় কথা হচ্ছে, ইসলাম মানবিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ধারক এবং নৈরাজ্য, দলাদলি ও সংঘর্ষের বিরোধী। তাই ইসলাম মানব সমাজকে শ্রেণীতে বিভক্ত করেনা এবং প্রকৃতিগতভাবে মানব সমাজে বিরাজিত শ্রেণীগুলিকে শ্রেণীসংগ্রামের পরিবর্তে সহানুভূতি ও সহযোগিতার পথে পরিচালিত করে। মানব সমাজ বিশ্লেষণ করলে এতে দু'ধরনের শ্রেণী দেখা যাবে। কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট নির্যাতনমূলক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবৈধ ও অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে এক ধরনের শ্রেণীর জন্ম দেয়; অতঃপর বলপূর্বক তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। যেমন, ব্রাহ্মণ্যবাদ, জমিদারী ব্যবস্থা বা পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। ইসলাম নিজে এই ধরনের শ্রেণীর জন্ম দেয়না। এবং এগুলি টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতীও ইসলাম নয়। বরং সামাজিক সংস্কার ও আইনগত পদ্ধতি অবলম্বন করে এগুলির বিলোপ সাধন করাই ইসলামের লক্ষ্য। প্রকৃতিগতভাবে মানবিক যোগ্যতা ও অবস্থার পার্থক্যের ভিত্তিতে দ্বিতীয় এক ধরনের শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। ইসলাম বলপূর্বক এই ধরনের শ্রেণীগুলির বিলোপ সাধন করেনা এবং এগুলিকে স্থায়ী শ্রেণীরূপ দানও করেনা বা এদের পরস্পরকে শ্রেণীসংগ্রামেও লিপ্ত করেনা। বরং ইসলামের নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এদের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ সহযোগিতা সৃষ্টি করে; তাদেরকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরস্পরের সাহায্যকারী ও সহযোগী বানায় এবং শ্রেণী নির্বিশেষে সবার জন্য সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যার ফলে এ শ্রেণীগুলি স্বাভাবিকভাবেই একাত্ম ও পরিবর্তিত হতে থাকে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

এ তিনটি বিষয় দৃষ্টি সমক্ষে রাখার পরই এই অর্থনৈতিক মূলনীতির যথার্থ উপলব্ধি সম্ভবপর হবে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌল উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনার পর এবার আমি এর মূলনীতিগুলি তুলে ধরবো।

ক. ব্যক্তিমালিকানা ও তার সীমারেখা

ইসলাম কতিপয় বিশেষ সীমারেখার মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি দেয়। ব্যক্তিমালিকানার ব্যাপারে উৎপাদন-উপকরণসমূহ ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মধ্যে অথবা শ্রমার্জিত আয় ও বিনাশ্রমে প্রাপ্ত আয়ের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য করেনা। ইসলাম মানুষকে মালিকানার সাধারণ অধিকার দান করে; তবে তাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। ইসলামে এমন কোনো ধারণা নেই যার ভিত্তিতে উৎপাদন-উপকরণসমূহ ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে উৎপাদন-উপকরণসমূহকে ব্যক্তিমালিকানার আওতা বহির্ভূত এবং নিছক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিকে এর আওতাভুক্ত করা যেতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে এক ব্যক্তি যেমন বস্ত্র, পাত্র ও গৃহের আসবাবপত্রের অধিকারী হতে পারে; অনুরূপভাবে সে জমি, মেশিন ও কারখানারও মালিকানা লাভ করতে পারে। এভাবে এক ব্যক্তি যেমন নিজের প্রত্যক্ষ শ্রমার্জিত অর্থসম্পদের বৈধ অধিকারী হয়, তেমনি সে নিজের পিতা, মাতা, স্ত্রী বা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিরও মালিক হতে পারে এবং অংশীদারিত্বের নীতির ভিত্তিতে সে এমন উপার্জনেরও অংশীদার হতে পারে, যা তার মূলধন খাটিয়ে অন্য এক ব্যক্তি নিজের পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করেছে। ইসলাম উৎপাদন-উপকরণসমূহের মালিকানা বা নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মালিকানা অথবা শ্রমার্জিত বা বিনাশ্রমে লব্ধ অর্থের মালিকানার মধ্যে পার্থক্য করেনা, বরং ইসলামে পার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে অর্থোপার্জনের উপায়সমূহের (Means) বৈধতা বা অবৈধতা অথবা অর্থ ব্যবহারের হারাম বা হালাল পদ্ধতি। ইসলাম সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের নীলনকশা এমনভাবে তৈরী করেছে যাতে মানুষ কতিপয় সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জন করতে পারে। ইতিপূর্বেই আমি বলেছি, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম এবং এ স্বাধীনতার ভিত্তিতেই সে মানবতার বিকাশ ও উন্নতির সমগ্র প্রাসাদ নির্মাণ করে। মানুষের এ স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য অর্থনৈতিক উপায় উপকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার অধিকার দান অপরিহার্য। মানুষের ব্যক্তিমালিকানা অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে অর্থনীতির সমগ্র উপায় উপকরণের উপর সামষ্টিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করলে অনিবার্যভাবেই মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ এ অবস্থা সৃষ্টি হবার পর, যে প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উপায় উপকরণসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মচারীতে পরিণত হয়।

খ. সমবন্টন নয়, ইনসাফপূর্ণ বন্টন

সম্পদের সমবন্টনের (Equal distribution) পরিবর্তে ইনসাফপূর্ণ বন্টন (Equitable distribution) ইসলামী অর্থব্যবস্থার আরেকটি মূলনীতি। অর্থোপার্জনের উপায় উপকরণসমূহ সমস্ত মানুষের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেয়া ইসলামের লক্ষ্য নয়। কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করলে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে যে, আল্লাহর এই দুনিয়ায় কোথাও সমবন্টন নীতি কার্যকর নেই।

সমবন্টন মূলত অপ্রাকৃতিক ও অস্বাভাবিক। সকল মানুষের স্মৃতিশক্তি কি সমান? সব মানুষ কি সমান সৌন্দর্য, শক্তি ও যোগ্যতা-সম্পন্ন? একই ধরনের পরিবেশ ও অবস্থায় কি সকল মানুষের জন্ম হয়? দুনিয়ায় কাজ করার জন্য সবাই কি একই ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়। এসব ব্যাপারে সাম্য না থাকলে নিছক উৎপাদন-উপকরণসমূহ ও অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে সাম্যের অর্থ কি? কার্যত এরূপ সাম্য সম্ভব নয় এবং কৃত্রিমভাবে এর প্রচেষ্টা চললে অনিবার্যভাবে তা ব্যর্থ হবে; উপরন্তু এর পরিণামেও দেখা দেবে মারাত্মক পরিণতি। এজন্যেই ইসলাম অর্থনৈতিক উপায় উপকরণাদি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুফলসমূহ সম-বন্টনের কথা বলেনা। বরং ইসলাম ইনসাফপূর্ণ বন্টনের দাবীদার। এ ইনসাফের জন্য ইসলাম কতিপয় নীতি নির্ধারণ করেছে।

এ প্রসঙ্গে প্রথম নীতি হচ্ছে, সম্পদ আহরণের উপকরণাদির মধ্যে ইসলাম হালাল ও হারামের পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। একদিকে ইসলাম ব্যক্তিকে স্বাধীন ও অবাধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থোপার্জনের অধিকার দান করে ও উপার্জিত সমুদয় সম্পদের উপর তার মালিকানা স্বীকার করে এবং অন্যদিকে অর্থোপার্জনের পদ্ধতিসমূহে হালাল ও হারামের সীমা নির্ধারণ করে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী যে কোনো ব্যক্তি হালাল পদ্ধতিতে অর্থোপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এজন্য সে নিজের ইচ্ছামত অর্থোপার্জনের যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে এবং যে কোনো পরিমাণ অর্থ উপার্জনও করতে পারে। সে তার এই উপার্জিত অর্থের বৈধ মালিক বলে স্বীকৃত হবে। তার এই বৈধ মালিকানা সীমিত করা বা তার থেকে এর অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার কারো নেই। তবে হারাম পদ্ধতিতে একটি পয়সাও উপার্জন করার অধিকার তার নেই। হারাম পদ্ধতি অবলম্বন থেকে তাকে বলপূর্বক বিরত রাখা হবে। এ পদ্ধতিতে উপার্জিত অর্থের সে বৈধ মালিক বলে স্বীকৃত হবে না। তার অপরাধের পর্যায়ানুসারে তাকে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা তার ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করার শাস্তি দেয়া যেতে পারে এবং এই অপরাধমূলক কাজ থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাও অবলম্বিত হবে।

ইসলামে যেসব পদ্ধতি ও উপায় উপকরণকে হারাম গণ্য করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে—আত্মসাৎ, ঘুষ, পরদ্রব্য গ্রাস, সরকারী কোষাগার থেকে আত্মসাৎ, চুরি, পরিমাণে কম করা, চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ব্যবসা, বেশ্যাবৃত্তি, মদ ও অন্যান্য মাদকদ্রব্যের শিল্প ও ব্যবসা, সুদ, জুয়া, ধাপ্পাবাজী এবং ব্যবসায়ের এমন সব পদ্ধতি যেখানে প্রতারণা ও চাপ প্রয়োগের ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালিত হয় অথবা যেগুলির মাধ্যমে কলহ, বিশৃংখলা ও বিভেদ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয় এবং যেগুলি ইনসাফ, ন্যায়নীতি ও গণস্বার্থ বিরোধী। ইসলাম আইন প্রয়োগ করে এসব পদ্ধতি ও উপায় উপকরণ ব্যবহার করার পথ রোধ করে। এ ছাড়াও ইসলাম মজুতদারী (Hoarding) নিষিদ্ধ গণ্য করে এবং যে ইজারাদারী কোনো প্রকার ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়াই অর্থ ও অর্থ উৎপাদনের উপকরণসমূহ থেকে সাধারণ লোকদের উপকৃত হবার সুযোগ ছিনিয়ে নেয়—তার পথও রুদ্ধ করে।

এ পদ্ধতি ও উপায় উপকরণগুলি বাদ দিয়ে বৈধ উপায়ে মানুষ যে সম্পদ অর্জন

করে, তা হালাল উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। এ হালাল সম্পদ সে নিজে ভোগ করতে পারে; উপহার, দান বা অন্যবিধ পদ্ধতিতে অন্যের নিকট স্থানান্তরও করতে পারে; এমনকি, অধিক সম্পদ আহরণের জন্যও ব্যবহার করতে পারে এবং নিজের উত্তরাধিকারীদের জন্য মীরাস হিসেবেও রেখে যেতে পারে। এই বৈধ উপার্জনের উপর এমন কোনো বিধি নিষেধ আরোপিত নেই, যার সাহায্যে কোনো এক পর্যায়ে পৌছে তাকে আরো উপার্জন থেকে বিরত রাখা যেতে পারে। কোনো ব্যক্তি হালাল উপার্জনের মাধ্যমে কোটিপতি হয়ে গেলে ইসলাম তার পথে প্রতিবন্ধক হবে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে ইচ্ছামত উন্নতি লাভ করতে পারে, তবে এ উন্নতি তাকে বৈধ উপায়ে লাভ করতে হবে। অবশ্যি বৈধ উপায়ে কোটিপতি হওয়া সহজসাধ্য নয়, এটা বিরল ঘটনা। কোনো অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কখনো কখনো আল্লাহর এ অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। নচেৎ বৈধ উপায় অবলম্বন করে কোটিপতি হবার অবকাশ কমই থাকে। কিন্তু ইসলাম কাউকে বেঁধে রাখেনা। হালাল উপায়ে সে যত অধিক সম্পদ চায় আহরণ করতে পারে। তার পথে কোনো বাধা নেই। কারণ অনর্থক বাধা নিষেধ ও প্রতিবন্ধকতার কারণে মানুষের কর্মপ্রেরণা (Incentive) খতম হয়ে যায়।

এভাবে বৈধ ও হালাল উপায়ে যে সম্পদ অর্জিত হয় ইসলামে তার ব্যবহারের উপরও বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

প্রথমত, এ সম্পদ মানুষ নিজের জন্য ব্যয় করতে পারে। এ ব্যয়কে ইসলাম এমনভাবে সংযত করে যার ফলে তা মানুষের নিজের চরিত্র ও সমাজের জন্য কোনোক্রমেই ক্ষতিকর হতে পারে না। সে মদপান করতে পারবে না। ব্যভিচার করতে পারবেনা। জুয়াবাজীতে নিজের সম্পদ উড়িয়ে দিতে পারবেনা। নৈতিকা বিরোধী পন্থায় বিলাসব্যসনে ব্যয় করতে পারবে না। সোনা রূপার পাত্র ব্যবহার করতে পারবেনা। এমনকি বসবাসের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জাঁকজমকের আশ্রয় নিলে তার উপর অবশ্যি বিধি নিষেধ আরোপ করা হবে।

দ্বিতীয়ত, এ সম্পদের কমবেশী কোনো অংশ মানুষ মওজুদ করে রাখতে পারে। কিন্তু ইসলাম এ প্রবণতা পছন্দ করেনা। ইসলাম মানুষের অতিরিক্ত সম্পদ মজুত রাখার পরিবর্তে বৈধ পদ্ধতিতে তাকে আবর্তিত করতে চায়। একটি বিশেষ আইন অনুযায়ী ইসলাম এ সঞ্চিত সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে। ফলে এর একটা অংশ বঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থে ও সামষ্টিক কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে। কুরআন মজীদে যেসব কাজকে সবচেয়ে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, মানুষের সম্পদ মওজুদ করার প্রচেষ্টা তন্মধ্যে অন্যতম। কুরআন বলে ঃ 'যারা সোনা ও রূপা জমা করে তাদের সংরক্ষিত সোনা ও রূপা জাহান্নামে তাদের দাগ দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হবে।' এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপকারের জন্য অর্থসম্পদ সৃষ্টি করেছেন; কাজেই একে আটকে রেখে মানুষের উপকারের পথ রুদ্ধ করার অধিকার কারো নেই। বৈধ ও হালাল উপায়ে অর্থসম্পদ উপার্জন করুন, নিজের প্রয়োজনে তা ব্যয় করুন; অতঃপর অবশিষ্ট যা থাকে বৈধ পদ্ধতিতে আবর্তন করাতে থাকুন।

এজন্য ইসলাম মজুতদারীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মজুতদারীর অর্থ হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বাজারে না ছেড়ে গুদামে সংরক্ষণ করা যার ফলে বাজারে সরবরাহ কমে যায় এবং দাম বেড়ে যায়। ইসলামী আইন এ ধরনের কাজকে হারাম গণ্য করে। কোনো ঘোরপ্যাঁচে না গিয়ে সোজাসুজি ব্যবসা চালাতে হবে। ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয়যোগ্য পণ্য থাকলে এবং বাজারে তার চাহিদা থাকলে, তা বিক্রয় করতে অস্বীকার করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। জেনে বুঝে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির অভাব সৃষ্টি করার জন্য তা বিক্রয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করা অন্যায়। এটা মানুষকে ব্যবসায়ী নয় ডাকাতে পরিণত করে।

এ কারণে ইসলাম অস্বাভাবিক ধরনের ইজারাদারীরও বিরোধী। কারণ এ ধরনের ইজারাদারী সাধারণ মানুষের পক্ষে অর্থোপার্জনের উপায় উপকরণাদি ব্যবহারের পথে বাধার সৃষ্টি করে। ইসলাম অর্থোপার্জনের বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও উপায় উপকরণ কতিপয় ব্যক্তি, বংশ বা শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া এবং এক্ষেত্রে অন্যদের অগ্রসর হবার পথ রোধ করাকে কোনোক্রমেই বৈধ গণ্য করেনা। সমষ্টিগত স্বার্থে যে ইজারাদারী একান্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র এই ধরনের ইজারাদারীর বৈধতা ইসলামে স্বীকৃত। অন্যথায় নীতিগতভাবে ইসলাম অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা এবং সবাইকে নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালাবার সমান সুযোগ দেয়ার পক্ষপাতী।

অতিরিক্ত অর্থসম্পদ ব্যবহার করে যদি কোনো ব্যক্তি আরও অর্থ উপার্জন করতে চায়, তাহলে তাকে অর্থোপার্জনের জন্য ইসলাম নির্ধারিত হালাল পদ্ধতিতেই তা করতে হবে। আমি ইতিপূর্বে অর্থোপার্জনের যেসব হারাম পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছি, সেগুলি অবলম্বন করা যাবে না কোনোক্রমেই।

গ. ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার

অতঃপর ইসলাম ব্যক্তির সম্পদের উপর সমষ্টির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে এবং এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। কুরআন মজীদে নিকট-আত্মীয়দের অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির উপার্জিত অর্থের উপর সে ছাড়াও তার আত্মীয় স্বজনের অধিকার দেয়া হয়েছে। সমাজের কোনো ব্যক্তি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হয় এবং তার আত্মীয়দের কেউ প্রয়োজনের চেয়ে কম সম্পদ উপার্জন করে, তাহলে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সে আত্মীয়কে সাহায্য করা তার সামাজিক দায়িত্ব। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির উপর এ দায়িত্ব বর্তায়। কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত এক একটি পরিবার যদি নিজেদের এ দায়িত্ব অনুভব করে এবং সামগ্রিকভাবে জাতির অধিকাংশ পরিবারকে সহায়তা দানের ব্যবস্থা করে, তাহলে বাইরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী পরিবারের সংখ্যা হয়তো অতি অল্পই থেকে যাবে। এজন্যই কুরআন মজীদে বান্দার হকের মধ্যে সর্বপ্রথম মা, বাপ ও আত্মীয়স্বজনের হকের উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে কুরআন ব্যক্তির সম্পদের উপর তার প্রতিবেশীদের অধিকারও প্রদান

করেছে। এর অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক পাড়ায়, মহল্লায়, অলিগলিতে তুলনামূলকভাবে সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিৎ সংশ্লিষ্ট পাড়া, মহল্লা ও গলির অসচ্ছল লোকদেরকে সহায়তা দান করা।

এই দ্বিবিধ দায়িত্বের পর কুরআন মজীদে সাহায্যের মুখাপেক্ষী বা সাহায্যপ্রার্থীকে নিজের সামর্থানুযায়ী সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করে।

('মানুষের ধনসম্পদে প্রার্থীত ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।') যে ব্যক্তি আপনার নিকট সাহায্য সহায়তা প্রার্থনা করে সে হচ্ছে প্রার্থী। যে দ্বারে দ্বারে ভিখ্ মেগে বেড়ায় এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তাকে প্রার্থী বলা যায়না। বরং যথার্থ প্রার্থী এমন ব্যক্তিকে বলা যেতে পারে, যে সত্যিকার অভাবী এবং তার অভাব পূরণের জন্য আপনার দ্বারস্থ হয়। অবশ্যি সে যথার্থ অভাবী কিনা এ ব্যাপারে নিজের সকল প্রকার সন্দেহ নিরসনের জন্য তার অবস্থা জানার অধিকার আপনার রয়েছে। কিন্তু সে যথার্থ অভাবী একথা আপনি যখন জানতে পারেন এবং তাকে সাহায্য দেয়ার মত প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদও যদি আপনার থাকে, তাহলে জেনে রাখুন আপনার ধনসম্পদে তার অধিকার রয়ে গেছে। আর বঞ্চিত বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে আপনার নিকট সাহায্য চাইতে আসে না; কিন্তু সে নিজের জীবিকা সংস্থান করতে পারে না একথা আপনি জানেন। আপনার অর্থসম্পদে এহেন ব্যক্তিরও অধিকার রয়েছে।

এ অধিকারগুলো ছাড়াও ইসলাম মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌র পথে দান করার সাধারণ নির্দেশ দিয়ে তাদের অর্থসম্পদে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকারও কায়েম করেছে। এর অর্থ হচ্ছে, মুসলমানকে দানশীল, উদার হৃদয়, সহানুভূতিশীল ও মানব-দরদী হতে হবে।

স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা পরিহার করে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিটি সৎকাজে এবং ইসলাম ও সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে। এটি একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী নৈতিক শক্তি। ইসলাম শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে এবং ইসলামী সমাজের সামষ্টিক পরিবেশের সাহায্যে প্রতিটি মুসলমানের মধ্যে এ নৈতিক বল সৃষ্টি করতে চায়। এভাবে কোনো প্রকার বল প্রয়োগ ছাড়াই হৃদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় মানুষ সমাজকল্যাণে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

ঘ. যাকাত

এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দানের পর ইসলাম আর একটি দানকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। সেটি হচ্ছে যাকাত। সঞ্চিত ও সংরক্ষিত অর্থ, ব্যবসার পণ্য, বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা, কৃষিজাত দ্রব্য ও গবাদি পশুর উপর যাকাত ধার্য করা হয়। এই যাকাতলব্ধ অর্থের সাহায্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর লোকদের সহায়তা দান করা হয়। এই দু'ধরনের ব্যয়কে নফল নামায ও ফরয নামাযের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। নফল নামায যত ইচ্ছা পড়তে পারেন। ইচ্ছামত আত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারেন। যত

বেশী আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চান, তত বেশী নফল নামায পড়ুন। তবে ফরয নামায অবশ্যি পড়তে হবে। আল্লাহর পথে ব্যয় করার ব্যাপারটিও এই একই পর্যায়ভুক্ত। এক প্রকার ব্যয় নফল শ্রেণীভুক্ত—নিজের ইচ্ছামত তা করতে পারেন। কিন্তু অন্যপ্রকার ব্যয় ফরযের অন্তর্ভুক্ত। একটি বিশেষ পরিমাণের অধিক অর্থের মালিক হলে এ ব্যয় করা আপনার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

যাকাত কোনো ট্যাক্স নয়। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ভুল ধারণা থাকা উচিত নয়। আসলে এটি একটি ইবাদত এবং নামাযের ন্যায় ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। যাকাত ও ট্যাক্সের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। ট্যাক্স মানুষের উপর জোরপূর্বক বসানো হয়। তাই মানুষ তাকে সানন্দে গ্রহণ করে নেবে এমন কোনো কথা নেই। ট্যাক্স ধার্যকারীদের কোনো ভক্ত-অনুরক্ত হয় না। তাদের কাজের সত্যতার উপর কেউ ঈমান আনে না। তাদের চাপানো এই বোঝাকে সবাই জোরপূর্বক আদায়কৃত জরিমানা মনে করে। এই ট্যাক্সের উপর তারা নাসিকা কুঞ্চন করে। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তারা হাজারো বাহানা তালাশ করে। ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু এর ফলে তাদের ঈমানের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য সূচিত হয় না। এ ছাড়াও এ দু'য়ের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য রয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, ট্যাক্সের সাহায্যে এমনসব ব্যয় নির্বাহ করা হয় যা থেকে ট্যাক্সদাতা নিজেও লাভবান হয়। ট্যাক্সের পিছনে যে মৌলিক চিন্তা কার্যকর রয়েছে তা হচ্ছে, আপনি যেসব সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন বোধ করেন এবং সরকারের মাধ্যমে যেগুলো লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করেন, সেগুলো লাভ করার জন্য আপনার আর্থিক সামর্থানুযায়ী সরকারকে চাঁদা দিন। এ ট্যাক্স আসলে প্রার্থিত সামষ্টিক সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে আপনার নিকট থেকে আইনের বলে গৃহীত এক ধরনের চাঁদার শামিল—এ সুযোগ সুবিধার দ্বারা সমাজের অন্যদের ন্যায় আপনিও লাভবান হন। বিপরীত পক্ষে যাকাত নামাযের ন্যায় একটি ইবাদত মাত্র। মানুষের কোনো পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদ যাকাত ধার্য করেনি বরং আল্লাহ নিজেই ধার্য করেছেন। প্রত্যেক মুসলমান তাঁকে একমাত্র মা'বুদ মনে করে। যে ব্যক্তি নিজের ঈমান সংরক্ষণ করতে চায়, সে কখনো যাকাত ফাঁকি দেয়া বা তা থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করতে পারে না। বরং তার নিকট থেকে হিসেব নেয়া এবং যাকাত আদায় করার জন্য বাইরের কোনো শক্তি না থাকলেও সে নিজের মন ও ঈমানের তাকিদে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজের সম্পদের যথাযথ হিসেব করে এবং তার যাকাত বের করে দেয়। উপরন্তু যেসব সামাজিক প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার সাথে আপনার স্বার্থ বিজড়িত এবং যেগুলি দ্বারা আপনি নিজেও লাভবান হন, সেগুলো পূর্ণ করার জন্য যাকাত গ্রহণ করা হয় না, বরং এমনসব লোকের জন্য এ যাকাত গ্রহণ করা হয়, যারা কোনো না কোনো ভাবে অর্থবন্টন ব্যবস্থায় নিজেদের অংশ পায়নি বা পূর্ণাংগরূপে পায়নি এবং কোনো কারণে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়েছে। এভাবে দেখা যায় প্রকৃতি, মূলনীতি, মৌল প্রাণসত্তা ও আকার আকৃতির দিক দিয়ে যাকাত ট্যাক্স থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দেশের পথ-ঘাট ও রেললাইন নির্মাণ, খাল খনন এবং আইন ও শাসন বিভাগ পরিচালনার জন্য এ অর্থ ব্যবহার করা হয় না। বরং

কতিপয় বিশেষ হকদারের হক আদায় করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদত হিসেবে একে ফরয করা হয়েছে। এটি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের প্রতিদান লাভ ছাড়া এর থেকে আপনি দুনিয়ায় আর কোনো প্রকার লাভবান হতে পারবেন না।

অনেকে এ ভুল ধারণা পোষণ করেন যে, ইসলামে যাকাত ও খারাজ ছাড়া কোনো প্রকার ট্যাক্স নেই। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ 'ধনসম্পদে যাকাত ছাড়াও আর একটি হক রয়েছে।' আসলে ইসলামী শরীয়ত যে ট্যাক্সগুলোকে অবৈধ গণ্য করেছে সেগুলো হচ্ছে কাইসার ও কিসরা এবং রাজা বাদশাহ ও আমীর উমরাহগণ কর্তৃক ধার্যকৃত ট্যাক্স, যেগুলোকে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে নিয়েছিল এবং জনগণের সম্মুখে তার আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করা নিজেদের দায়িত্ব মনে করতো না। তবে পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত সরকার জনগণের ইচ্ছা ও পরামর্শক্রমে যেসব ট্যাক্স ধার্য করে এবং এ খাতে সংগৃহীত সমুদয় অর্থ সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে গঠিত সরকারী তহবিলে জমা রাখে, জনগণের পরামর্শানুযায়ী তা ব্যয় করে এবং সরকার জনগণের সম্মুখে তার হিসেব দেয়ার ব্যাপারে নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করে, সেসব ট্যাক্স ধার্য করার ব্যাপারে শরীয়ত অবশ্যি কোনো বিধি নিষেধ আরোপ করেনি। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে সমাজে যদি কোনো প্রকার অস্বাভাবিক রকমের অর্থনৈতিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গিয়ে থাকে অথবা একদল লোক হারাম পদ্ধতিতে সম্পদের পাহাড় গড়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ইসলামী সরকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার পরিবর্তে ট্যাক্স বসিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য সৃষ্টি এবং অন্যান্য ইসলামী আইন প্রয়োগ করে সম্পদ স্তূপীকৃত হবার পথ রুদ্ধ করতে পারেন। বস্তুত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য শাসকগণকে এমনসব একনায়কত্বমূলক ক্ষমতা দান করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যেসব ক্ষমতা লাভ করার পর কোনো এক পর্যায়ে তাদেরকে নিয়ন্ত্রিত করা আর সম্ভব হয় না। ফলে এক যুলমের পরিবর্তে তার চেয়ে ভয়াবহ যুলমের প্রতিষ্ঠা হয়।

ঙ. উত্তরাধিকার আইন

এ ছাড়াও ইসলামের একটি উত্তরাধিকার আইনও রয়েছে। কোনো ব্যক্তি কমবেশী যে পরিমাণ সম্পদ সম্পত্তি রেখে মারা যাক না কেন একটি নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী তাকে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। সর্বপ্রথম পিতামাতা, স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা এ সম্পত্তির অধিকারী হয়, অতঃপর ভাইবোনেরা হয় এর উত্তরাধিকারী এবং তাদের পর হয় নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজন। যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় এবং তার কোনো পর্যায়ের কোনো উত্তরাধিকারী না পাওয়া যায়, তাহলে সমগ্র জাতিই তার উত্তরাধিকারী হবে এবং তার সম্পদ সম্পত্তি বায়তুলমালের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের জন্য ইসলাম উল্লিখিত মূলনীতি ও চতুঃসীমা নির্ধারণ করেছে। এ চতুঃসীমার মধ্যে পূর্বোল্লেখিত মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে আপনারা নিজেদের জন্য ইচ্ছামত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারেন। যুগসমস্যা ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতি যুগে একে বিস্তারিত রূপ দান আমাদের নিজেদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের যে দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে এবং যে বিষয়গুলো অবশ্যি মেনে চলতে হবে তা হচ্ছে, আমরা অবশ্যি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় একটি লাগামহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি না। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের ন্যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমগ্র উপায় উপকরণকে সমষ্টি, তথা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে পারি না। আমাদেরকে একটি চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থান করে এমন একটি স্বাধীন ও মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে—যেখানে মানুষের নৈতিক উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত থাকবে, সমষ্টির কল্যাণ সাধনের জন্য মানুষকে আইনের নিগড়ে বাঁধবার প্রয়োজন অতি অল্পই অনুভূত হবে, যেখানে ভ্রান্ত পদ্ধতিতে অস্বাভাবিক শ্রেণী বিভাগের অবকাশ থাকবে না এবং স্বাভাবিক শ্রেণীগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিবর্তে সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হবে। অর্থ উৎপাদনের যেসব উপায় উপকরণকে ইসলাম হারাম গণ্য করেছে, এ ব্যবস্থায় সেসবই হারাম বিবেচিত হবে এবং যেগুলোকে ইসলাম বৈধ গণ্য করেছে একমাত্র সেগুলোই বৈধ থাকবে। বৈধ পদ্ধতিতে অর্জিত সমুদয় সম্পদের উপর ব্যক্তির ইসলাম প্রদত্ত মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার স্বীকৃত হবে। সম্পদের উপর অবশ্যি যাকাত ধার্য করা হবে এবং যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী তাদের নিকট থেকে অপরিহার্যরূপে যাকাত আদায় করা হবে। এছাড়া উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী মীরাস বন্টন করা হবে। সীমারেখার মধ্যে ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও প্রতিযোগিতা চালাবার পূর্ণ সুযোগ দান করা হবে। এমন কোনো ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে না, যেখানে ব্যক্তিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হবে এবং তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা হবে। এ স্বাধীন ও অবাধ প্রতিযোগিতা প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মানুষ নিজেই যদি ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে আইন সেখানে অনর্থক মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করবে না। কিন্তু যদি তারা ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে অথবা বৈধ সীমারেখা অতিক্রম করে এবং অস্বাভাবিক ধরনের মজুতদারী প্রভৃতির পথ প্রশস্ত করতে থাকে, তাহলে তাদের মৌলিক অধিকারসমূহ হরণ করা ও স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য নয় বরং নিছক ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং সীমাতিক্রম করার প্রবণতা রোধ করার জন্য আইন অবশ্যি কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এ পর্যন্ত আলোচনায় প্রথম প্রশ্নের প্রথমাংশের জবাব শেষ হয়েছে। এবার প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশের আলোচনায় আসুন। এখানে বলা হয়েছে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন কোন্ ধরনের মর্যাদা লাভ করেছে?

শ্রম, পুঁজি ও সংগঠনের মর্যাদা

এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করার জন্য আমি আপনাদেরকে ইসলামী ফিকাহশাস্ত্রে বর্ণিত মুযারিয়াত (ভাগচাষ) ও মুদারিবাত (অংশীদার ভিত্তিক ব্যবসা) সংক্রান্ত আইনগুলো পাঠ করার পরামর্শ দিতে চাই। আধুনিক অর্থনীতিতে এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে জমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠনকে যে ধরনের অর্থনৈতিক উপকরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামী ফিকাহর পুরাতন গ্রন্থসমূহে ঠিক সেভাবে সেগুলো বিবৃত হয়নি এবং সেসব বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক গ্রন্থও রচিত হয়নি। ইসলামী

ফিকাহর বিভিন্ন অধ্যায়ে এসব বিষয় আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এগুলোর পরিভাষা ও বর্ণনাভংগি আধুনিক অর্থনীতির পরিভাষা ও বর্ণনাভংগি থেকে আলাদা। তবে যে ব্যক্তি পরিভাষা ও বর্ণনাভংগির দাস নয়, বরং অর্থনীতির আসল বিষয়বস্তু ও সমস্যাবলী সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী, সে অতি সহজেই ইসলামী ফিকাহর অর্থনৈতিক আলোচনার ধারা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে মুযারিয়াত ও মুদারিবাত সম্পর্কে যেসব বিধান লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা পর্যালোচনা করলে জমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন সম্পর্কিত ইসলামের দৃষ্টিভংগি পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। মুযারিয়াত বলতে এমন এক ধরনের কৃষিব্যবস্থা বুঝায় যেখানে এক ব্যক্তি জমির মালিক এবং অন্য এক ব্যক্তি তাতে চাষাবাদ করে। এ জমির ফসল থেকে উভয়েই অংশ লাভ করে। আর মুদারিবাত বলতে এমন এক ধরনের ব্যবসাকে বুঝায় যেখানে এক ব্যক্তির পুঁজি নিয়ে অন্য ব্যক্তি ব্যবসা চালায় এবং কারবারের মুনাফায় উভয়েই অংশীদারি হয়। লেনদেনের এ সকল ক্ষেত্রে ইসলাম যেভাবে জমি ও পুঁজির মালিক এবং চাষী ও উদ্যোক্তার অধিকার স্বীকার করেছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, জমি ও শ্রম উভয়ই উৎপাদনের উপাদান; এই সাথে পুঁজি ও এর সঙ্গে মানুষ নিজের যে শ্রম ও সাংগঠনিক যোগ্যতা যুক্ত করে এ সবই উৎপাদনের উপাদানরূপে স্বীকৃত। এসব উপাদান তাদের কর্মক্ষমতার মাধ্যমে মুনাফায় নিজেদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে। প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম এসব বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অংশীদারিত্বের সম্পর্কের ব্যাপারটি প্রচলিত রীতির উপর ছেড়ে দেয়। কারণ প্রচলিত পদ্ধতিতে মানুষ নিজেরাই যদি নিজেদের মধ্যে ইনসাফ করে, তাহলে সেখানে আইনের হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু যদি কোনো ব্যাপারে ইনসাফ না হয়, তাহলে অবশ্যি ইনসাফের সীমা নির্ধারণ করা আইনের দায়িত্ব হিসেবে গণ্য হবে। যেমন মনে করুন, আমি একজন জমির মালিক এবং আমি আমার জমি একজন কৃষককে বর্গা দিলাম বা আমার জমিতে এক কৃষককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কৃষিকাজে নিযুক্ত করলাম অথবা কাউকে জমি ঠিকে দিলাম। এসব ক্ষেত্রে যদি প্রচলিত রীতি অনুসারে ন্যায়নিষ্ঠার সাথে শর্তাবলী স্থিরীকৃত হয়, তাহলে এক্ষেত্রে আইনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। তবে যদি এখানে কোনো বেইনসাফী হয়, তাহলে অবশ্যি সেক্ষেত্রে আইনের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হবে। দেশের সংবিধানে এ উদ্দেশ্যে কৃষি সংক্রান্ত ধারা সন্নিবেশ করা যেতে পারে। ভাগচাষী, ভূমি শ্রমিক বা ভূমি মালিক কারো স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অনুরূপভাবে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পুঁজির মালিক এবং ব্যবসায়ে পরিশ্রমকারী ও সংগঠনকারীর মধ্যে ন্যায়নীতি সহকারে ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদিত হতে থাকবে এবং কেউ কারোর হক মারার চেষ্টা করবে না বা কারোর উপর অত্যাচার করবে না, ততক্ষণ আইন সেখানে হস্তক্ষেপ করবে না। তবে এসব ব্যাপারে কোনো পক্ষ যদি কোনো প্রকার বেইনসাফী করে, তাহলে সেক্ষেত্রে আইন কেবল হস্তক্ষেপ করারই অধিকারী হবে না, বরং পুঁজি, শ্রম ও সংগঠন সবাই যাতে ব্যবসায়ের মুনাফার ন্যায়ানুগ অংশ লাভ করতে পারে সেজন্য ইনসাফপূর্ণ বিধি বিধান প্রণয়ন তার দায়িত্ব বিবেচিত হবে।

যাকাত ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

দ্বিতীয় প্রশ্নে বলা হয়েছে, যাকাত ও সাদকাকে অর্থনৈতিক কল্যাণ ও উন্নয়নে ব্যবহার করা যায় কিনা। এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, যাকাত ও সাদকার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি কথা গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে, তা হচ্ছে, অর্থনৈতিক কল্যাণ ও উন্নয়ন বলতে যদি সারাদেশ ও সমগ্র জাতির কল্যাণ ও উন্নয়ন বুঝানো হয়, তাহলে এ উদ্দেশ্যে যাকাত ও সাদকার ব্যবহার বৈধ নয়। যাকাতের ব্যবহার সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। সমাজের কোনো ব্যক্তি যাতে তার মৌলিক মানবিক প্রয়োজন—অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও সন্তানদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না থাকে, যাকাত মূলত সেদিকেই দৃষ্টি রাখবে। এছাড়া যাকাতের সাহায্যে আমরা সমাজের এমন এক শ্রেণীর অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাতে পারি যারা অর্থোপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাবার যোগ্যতা রাখে না। এতীম শিশু, বৃদ্ধ, পঙ্গু, অক্ষম বা সাময়িকভাবে বেকার অথবা সুযোগ সুবিধা ও উপায় উপকরণের স্বল্পতা হেতু যারা অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতে পারছে না এবং সামান্য সাহায্য সহায়তা লাভ করলে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে বা যারা ঘটনাক্রমে কোনো ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে—এ ধরনের লোকদের সাহায্য সহায়তা দান করার জন্য যাকাত ধার্য করা হয়েছে। আর সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যাকাত ছাড়া অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা

তৃতীয় প্রশ্নে বলা হয়েছে, আমরা কি সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করতে পারি। এর জবাবে বলা যায়, অবশ্যি করতে পারি। ইতিপূর্বে কয়েকশ' বছর পর্যন্ত এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর আজ যদি আপনি অন্যের অন্ধ অনুসৃতি ত্যাগ করে যথার্থই এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেন, তাহলে তা আদৌ কোনো কঠিন কাজ নয়। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আধুনিক বিশ্বের ন্যায় সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছিল। ইসলাম এ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে এবং সুদকে হারাম করে দেয়। প্রথম আরবে সুদ হারাম হয়, অতঃপর যেখানেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানেই সুদ হারাম হতে থাকে। সমগ্র অর্থনীতি সুদ ছাড়াই চলতে থাকে। শত শত বছর ধরে এ ব্যবস্থা দুনিয়ার বুকে পরিচালিত হয়েছে এবং বর্তমানেও এর জীবনীশক্তির অভাবের কোনো কারণ দেখা যায় না। যদি আমাদের মধ্যে ইজতিহাদের শক্তি থাকে এবং আমরা ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হই ও এইসঙ্গে যে বস্তুকে আল্লাহ হারাম গণ্য করেছেন তাকে হারাম করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে পারি, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমরা আজ সুদের বিলোপ সাধন করে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে পারি। আমার 'সুদ' গ্রন্থে আমি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো জটিলতা নেই বলে আমি সেখানে দেখিয়েছি। বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। পুঁজি নিয়ে যারা কারবারে খাটাচ্ছে ও পরিশ্রম করছে এবং সাংগঠনিক

তৎপরতা ও কার্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে, তারা মুনাফা অর্জনে সফল হোক বা না হোক সেদিকে দৃষ্টি না রেখে, ঋণের আকারে কারবারে পুঁজি লগ্নি করা এবং নির্ধারিত হারে মুনাফা অর্জন করার কোনো অধিকার নেই। সুদের আসল অনিষ্টকারিতা হচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজের পুঁজি শিল্প-কারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অথবা কৃষিফার্মে ঋণ আকারে লগ্নি করে এবং পূর্বাহ্নেই এর উপরে নির্দিষ্ট হারে মুনাফা স্থিরীকৃত করে নেয়। পুঁজি লগ্নিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কারবারে লাভ হয়েছে বা লোকসান হয়েছে অথবা কি পরিমাণ লাভ বা লোকসান হয়েছে তার কোনো পরোয়াই করে না। সে কেবল বছরে বছরে বা মাসে মাসে নির্দিষ্ট হারে মুনাফা আদায় করেই যাবে এবং এইসঙ্গে আসল ফিরে পাওয়ারও অধিকারী হবে। এ যুল্‌ম আমাদেরকে খতম করতে হবে। বিশ্বের কেউ সুদের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারেনি। এর বৈধতার কোনো কারণ পেশ করা যেতে পারে না। পক্ষান্তরে ইসলামের নীতি হচ্ছে যে, আপনি যদি ঋণ দেন, তাহলে ঋণের আকারেই তা দিতে হবে। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র নিজের ঋণ বাবদ প্রদত্ত অর্থ ফেরত নেয়ার অধিকার আপনার থাকবে। আর যদি আপনি মুনাফা অর্জন করতে চান, তাহলে সোজাসুজি আপনাকে কারবারে অংশীদার হতে হবে এবং সেভাবেই চুক্তি করতে হবে। নিজের পুঁজি কৃষি, শিল্প, ব্যবসা যেখানেই লাগাতে চান, এ শর্তে লাগান যে, তা থেকে যে মুনাফা অর্জিত হবে তা আপনি এবং উদ্যোক্তা উভয়ে পূর্বনির্ধারিত হারে ভাগ করে নেবেন। এটি ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দাবী এবং এভাবে অর্থনৈতিক জীবনের সমৃদ্ধি সম্ভব। সুদী পদ্ধতি খতম করে এ পদ্ধতি প্রচলনের পথে বাধা কোথায়? বর্তমানে যে পুঁজি ঋণ আকারে খাটানো হয়, তা অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে খাটালেই হবে। সুদের হিসেবের পরিবর্তে মুনাফার হিসেব কষতে হবে, এ ব্যাপারে কোনো কঠিন সমস্যা দেখা যায় না। সমস্যা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই। আমরা অন্ধ অনুসৃতিতেই অভ্যস্ত। পূর্ব থেকে যা চলে আসছে, চোখ-কান বন্ধ করে তা চালিয়ে যেতেই আমরা চাই। ইজতিহাদ করে ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে কোনো সুসমঞ্জস, বৈধ ও ইনসাফপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে আমরা প্রস্তুত নই। বেচারা আলেম ওলামাদের নিন্দা করা হয় যে, তারা তাকলীদ তথা অন্ধ অনুসরণ করে—ইজতিহাদে প্রবৃত্ত নয়। অথচ তারা নিজেরাই (পাশ্চাত্য চিন্তার) অন্ধ অনুসরণ করে চলছে, ইজতিহাদে তারাও উদ্যোগী নয়। আমাদের রোগ এ মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত না হলে বহু পূর্বেই এ সমস্যার সমাধান হতো।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সম্পর্ক

শেষ প্রশ্নে বলা হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ পর্যায়ের সম্পর্ক রয়েছে? এর জবাবে বলা যায়, এ ব্যবস্থাগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক একটি গাছের শিকড়, কাণ্ড, শাখা প্রশাখা ও পত্রের মধ্যকার সম্পর্কের ন্যায়; আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। নৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি এখান থেকেই। ইবাদত বা প্রচলিত অর্থে

ধর্মীয় ব্যবস্থাও এখান থেকেই সৃষ্টি হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ব্যবস্থার উৎসও এখানেই। এগুলো সবই একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যদি আপনি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকেন এবং কুরআনকে আল্লার কিতাব বলে স্বীকার করে থাকেন, তাহলে অনিবার্যভাবে ইসলাম প্রদত্ত নৈতিক আদর্শ ও নীতি অবলম্বন করতে হবে, ইসলাম প্রদত্ত নীতির ভিত্তিতে অর্থনীতির সমগ্র ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে হবে। যে আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে আপনি নামায পড়েন, সেই একই আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে আপনাকে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। যে দীনের বিধি-বিধান আপনার রোযা ও হজ্জ্ব নিয়ন্ত্রণ করে সে একই দীনের বিধি-বিধান আপনার আদালত ও বাজারের জীবনও নিয়ন্ত্রিত করবে। ইসলামে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাগুলো পৃথক পৃথক এককের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এগুলো একই ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা মাত্র। এগুলো একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত এবং প্রত্যেকটি অন্যটির সাহায্যে শক্তিশালী। যেখানে তাওহীদ, রিসালত ও আখেরাতের প্রতি ঈমানের অস্তিত্ব নেই এবং এ উৎস থেকে উৎসারিত নৈতিক বৃত্তি অনুপস্থিত, সেখানে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং কোনোক্রমে প্রতিষ্ঠিত করলেও তা টিকে থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একই কথা। আল্লাহ, রাসূল, আখেরাত ও কুরআনের প্রতি ঈমান না থাকলে এ ব্যবস্থা চলতে পারেনা। কারণ ইসলাম যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা দান করেছে, তার ভিত্তি হচ্ছে ঃ আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক, রাসূল তাঁর প্রতিনিধি, কুরআন তাঁর অবশ্য পালনীয় ফরমান এবং আমাদেরকে একদিন সর্বশক্তিমান আল্লার সম্মুখে আমাদের কাজের জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামে ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কহীন কোনো পৃথক এককের অধিকারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে বা ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যবস্থা থেকে সম্পর্কহীন থাকতে পারে, এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। যে ব্যক্তি ইসলামকে জেনে বুঝে গ্রহণ করেছে, সে কখনো এ ধারণা পোষণ করতে পারে না যে, মুসলমান থাকা অবস্থায়ই তার রাজনীতি, অর্থনীতি বা তার জীবনের কোনো বিভাগ তার ধর্ম থেকে আলাদা থাকতে পারে। সে জানে রাজনীতি, অর্থনীতি ও আইন আদালতের ক্ষেত্রে ইসলাম থেকে আলাদা থেকে বা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে কেবলমাত্র 'ধর্মীয়' ব্যাপারে ইসলামের আনুগত্য করার নাম ইসলামী জীবন হতে পারে না।

পঞ্চম অধ্যায়

কুরআনের আলোকে অর্থনৈতিক জীবনের কতিপয় মৌলিক নীতিমালা

[আমরা এ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত তাফহীমুল কুরআনের অনেকগুলো টীকা সংযুক্ত করে দিয়েছি। কিন্তু অর্থনৈতিক বিষয়ে এমন কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ টীকা তাফহীমুল কুরআনে রয়েছে, যেগুলো নির্দিষ্ট কোনো অধ্যায়ে স্থান পায়নি। সেগুলো থেকে কয়েকটি টীকা বিশেষভাবে বিন্যাস করে এখানে পেশ করছি। আলোচনার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে কোনো কোনো স্থানে প্রয়োজনমত সামান্য বিয়োজন কিংবা দুয়েক বাক্য সংযোজন করা হয়েছে।]

১. ইসলামী সমাজের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য[১]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - (النحل : ٩٠)

"আল্লাহ আদল, ইহ্সান এবং সেলায়ে রেহমীর নির্দেশ দিচ্ছেন। আর ফাহ্শা, মুনকার ও বাগী থেকে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যেনো তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।" [আন নহল ঃ ৯০]

এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে এমন তিনটি জিনিসের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেগুলোর উপর গোটা মানব সমাজের পরিশুদ্ধি ও সার্থকতা নির্ভরশীল।

এর মধ্যে পয়লা নির্দেশ হলো 'আদল' [সুবিচার]। দুটি স্বতন্ত্র সত্যের সমন্বয়ে আদল গঠিত। এক. মানুষের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করা। দুই. প্রত্যেককে যথাযথভাবে তার অধিকার প্রদান করা। আমাদের ভাষায় সাধারণত 'আদল'-এর অর্থ করা হয় ইনসাফ করা। কিন্তু অনেক সময় ইনসাফ শব্দটি ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে। এ থেকে এ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে তাদের অধিকার বন্টিত হতে হবে অর্ধেক অর্ধেক বা সমান সামান ভিত্তিতে। এ থেকেই 'আদল' মানে ধরে নেয়া হয়েছে সমবন্টন। অথচ সমবন্টন ব্যবস্থা স্বাভাবিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে আদল যে জিনিসের দাবি করে তা হচ্ছে, ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য, সমান সমান নয়। কোনো কোনো দিক থেকে আদল সমাজে লোকদের মধ্যে অবশ্যই সমতা দাবি করে, যেমন নাগরিক অধিকার। কিন্তু আবার কোনো কোনো দিক থেকে 'সমতা' আদলের সম্পূর্ণ বিপরীত, যেমন পিতা-মাতা ও সন্তানের মাঝে সামাজিক ও নৈতিক সম্পর্ক এবং উন্নত ধরনের সেবা প্রদানকারী ও নিম্নমানের সেবা প্রদানকারীদেরকে সমান সমান বেতন দেয়া। তাই আল্লাহ্ তায়ালা এখানে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা হলো, অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা নয়, বরঞ্চ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা। আর এই নির্দেশের দাবি হলো, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নৈতিক, সম্পর্কগত, অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে যথাযথভাবে প্রদান করতে হবে।

দ্বিতীয় নির্দেশ হলো 'ইহসান'। ইহসান মানে সুন্দর ব্যবহার, হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ, চমৎকার আচরণ, পারস্পরিক ঔদার্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, অপরকে তার অধিকারের চেয়ে বেশী দেয়া এবং নিজের অধিকারের চেয়ে কম পেয়েও সন্তুষ্ট থাকা। বস্তুত ইহসান আদলের চেয়ে বেশী কিছু বুঝায়। সামাজিক জীবনে তাই ইহসানের গুরুত্ব

---

১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নহল, টীকা ৮৮-৮৯।

আদলের চেয়েও বেশী। আদল যদি হয় সামাজিক জীবনের ভিত, তবে ইহসান হলো সমাজের কারুকাজ। আদল যদি সমাজকে অসন্তোষ ও তিক্ততা থেকে রক্ষা করে, তবে ইহসান তাতে সন্তোষ ও মাধুর্য এনে দেয়। কোনো সমাজ কেবল এই সাদামাটা নীতির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না যেখানে সমাজের প্রত্যেক সদস্য হরহামেশা মেপেমেপে নিজের অধিকার নির্ণয় ও আদায় করে; আর অপরের অধিকার কতোটা রয়েছে তা খতিয়ে নির্ধারণ করে এবং কেবল ততোটুকুই দিয়ে দেয়। এ ধরনের একটি কাটখোট্টা সমাজে দ্বন্দ্ব সংঘাত ঘটেনা বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সে সমাজ প্রেম ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, মাহাত্ম্য উদারতা, ত্যাগ ও কুরবানী, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা এবং অপরের কল্যাণ কামনার মতো মহোত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহ হতে বঞ্চিত থেকে যায়। অথচ এই গুণ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ব্যক্তিজীবনে সজীবতা ও মাধুর্য সৃষ্টির এবং সমাজ জীবনে সৌন্দর্য ও সুষমা বিকাশের উপাদান।

তিন নম্বর নির্দেশটি হলো 'সেলায়ে রেহমী'। এ হচ্ছে আত্মীয়দের প্রতি ইহ্সান করার একটি খাস পন্থা। এর অর্থ কেবল এই নয় যে, কোনো ব্যক্তি তার আত্মীয়স্বজনের সাথে শুধু ভাল ব্যবহার করবে, তাদের সুখে দুখে শরীক হবে এবং বৈধ সীমার মধ্যে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করবে। বরং সেইসাথে এটাও এর অর্থ যে, প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি তার ধনসম্পদে নিজের ও নিজের সন্তান সন্ততির অধিকার প্রদানের সাথে সাথে স্বীয় আত্মীয় স্বজনের অধিকারও স্বীকার করে নেবে। আল্লাহর বিধান প্রত্যেক খান্দানের সচ্ছল ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল বানিয়েছে যে, সে তার খান্দানের লোকদেরকে অন্নহীন বস্ত্রহীন থাকতে দেবেনা। খোদায়ী শরীয়তের দৃষ্টিতে মানব সমাজে এর চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো অবস্থা হতে পারেনা যে, সেখানে পরিবারের এক ব্যক্তি সম্পদের প্রাচুর্যে আরাম আয়েশে কাল কাটাবে, আর সে পরিবারেরই অপর কোনো সদস্য ভাত কাপড়ের অভাবে দুর্ভোগ পোহাবে। মূলত ইসলাম পরিবারকে সমাজ সংগঠনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংগ মনে করে। এক্ষেত্রে ইসলাম এই নীতি ঘোষণা করেছে যে, প্রত্যেক পরিবারের দরিদ্রদের পয়লা অধিকার বর্তায় সেই পরিবারেরই সচ্ছল লোকদের উপর। এরপর তার অধিকার বর্তায় অন্যদের উপর। এ কথাটিই নবী করীম (সা) তাঁর বিভিন্ন বাণীতে সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন। বিভিন্ন হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়, যে কোনো ব্যক্তির উপর সর্বপ্রথম অধিকার বর্তায় তার মাতাপিতা, স্ত্রী, সন্তান সন্ততি এবং ভাই বোনের। অতঃপর তার উপর সেইসব লোকদের অধিকার বর্তায় যারা পরবর্তী পর্যায়ের নিকটজন। এভাবে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য নিকটতর লোকদের অধিকার বর্তায়।

এই নীতির ভিত্তিতে হযরত উমর ফারুক (রা) এক এতীম শিশুর চাচাতো ভাইদের বাধ্য করেছিলেন সে এতীমের লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। অপর একটি এতীমের ব্যাপারে ফায়সালা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, তার কোনো দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বর্তমান থাকলেও এর লালন পালনের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করতাম। যে সমাজের প্রত্যেক সদস্য (UNIT) এমনি করে নিজ আত্মীয়স্বজনের দায়িত্ব গ্রহণ করে,

সেখানে কতো সুন্দর অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, সামাজিক সুসম্পর্ক ও মাধুর্য এবং নৈতিক পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব গড়ে উঠতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

উপরে আলোচিত তিনটি কল্যাণকর কাজের প্রতিকূলে আল্লাহ তায়ালা তিনটি মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এই মন্দ কাজগুলো ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এবং সামাজিকভাবে গোটা সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

প্রথমেই নিষেধ করা হয়েছে 'ফাহ্‌শা' কাজ থেকে। ফাহ্‌শা বলতে যাবতীয় অনর্থক, অশ্লীল ও লজ্জাকর কাজকে বুঝায়। এমন প্রতিটি মন্দ কাজই ফাহ্‌শা, যা প্রকৃতিগতভাবেই মন্দ, লজ্জাকর এবং কুশ্রী। যেমন, কৃপণতা, ব্যভিচার, নগ্নতা ও উলংগপনা, সমকামিতা, নিষিদ্ধ নারীদের বিয়ে করা, চুরি ডাকাতি, মদ্যপান, ভিক্ষাবৃত্তি গালাগাল এবং অশ্লীল কথাবার্তা বলা ইত্যাদি। একইভাবে প্রকাশ্যে, ঘোষণা দিয়ে মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়া এবং মন্দ কাজ ছড়িয়ে দেয়াও ফাহ্‌শার অন্তর্ভুক্ত। যেমন, মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা করা, অপবাদ দেয়া, গোপন অপরাধসমূহের প্রচার করা, অসৎ কর্মে সুড়সুড়ি দানকারী গল্প, নাটক ও ফিল্ম, নারীদের সাজগোজ প্রদর্শন করে প্রকাশ্যে চলাফেরা, নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা, মঞ্চে উঠে নারীদের নাচগান করা এবং বিভিন্ন শারীরিক ভংগিমা প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত যে কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তা হলো 'মুনকার'। এমন প্রতিটি মন্দ কাজই মুনকার, যাকে মানুষ স্বভাবগতভাবে মন্দ বলে জানে, সব সময় যাকে মন্দ বলে আসছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত সকল শরীয়তে যেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

তৃতীয় নিষিদ্ধ কাজ হলো 'বাগী'। এর অর্থ হচ্ছে নিজের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং অন্যদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা, চাই সে অধিকার স্রষ্টার হোক কিংবা সৃষ্টির।

এসব হচ্ছে এমন মৌলিক গুণবৈশিষ্ট্য যার উপর ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলা ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভয়েরই দায়িত্ব। এই নির্দেশসমূহ পালন এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকা ও রাখার জন্যে নৈতিক ও আইনগত সকল শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

২. নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ইসলামী পদ্ধতি[১]

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ
وَجْهَ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - (الروم : ٣١)

"অতএব [হে মুমিনরা], আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকে [তাদের অধিকার]। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চায়, তাদের জন্যে এটাই উত্তম পন্থা। আর এসব লোকেরাই কল্যাণ ও সফলতার অধিকারী হবে।" [সূরা আর রূম ঃ ৩৮]

এ আয়াতে আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরকে ভিক্ষা দিতে বলা হয়নি। বলা হয়েছে তাদেরকে যা দিতে হবে, তা তাদের অধিকার। তাদের অধিকার মনে করেই তাদেরকে দাও। দেবার সময় তোমার মনের কোণেও যেনো এরূপ কোনো চিন্তার উদয় না হয় যে, তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ করছো, তুমি একজন মহামানব, দানবীর; আর সে হীন নগণ্য এবং তোমার দান খেয়েই সে জীবন ধারণ করে। বরঞ্চ তোমার মনের গভীরে একথা বদ্ধমূল করে নিতে হবে যে, ধনমালের প্রকৃত মালিক তোমাকে অধিক সম্পদ দিয়েছেন এবং তার অন্য বান্দাদের কম দিয়েছেন, এই অধিক সম্পদের মধ্যে কমওয়ালাদের অধিকার রয়েছে। তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যেই এই অধিক সম্পদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ দেখতে চান, তুমি তাদের অধিকার উপলব্ধি করছো কিনা এবং তা পৌঁছে দিচ্ছো কিনা?

আল্লাহ্র এ বাণীর প্রকৃত মর্ম যিনি উপলব্ধি করতে পারবেন, তিনি অবশ্যি অনুভব করবেন যে, কুরআন মজীদ মানুষের নৈতিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতির যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে, তা বাস্তবায়নের জন্যে স্বাধীন সমাজ ও একটি স্বাধীন অর্থনীতি বর্তমান থাকা একান্ত অপরিহার্য। এমন কোনো সামাজিক ব্যবস্থায় এই পদ্ধতি কার্যকর করা কিছুতেই সম্ভব নয়, যেখানে ব্যক্তিমালিকানার অধিকার রহিত করা হয়, সকল উপায় উপকরণ জাতীয়করণ করা হয় এবং জনগণের মধ্যে জীবিকা বন্টনের যাবতীয় কাজ সরকারী ব্যবস্থাপনায় আঞ্জাম দেয়া হয়। এমন ব্যবস্থায় ব্যক্তি নিজের উপর অপরের অধিকার বুঝতে ও আদায় করতে পারেনা এবং কেউ কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ ও তার জন্যে কল্যাণ কামনা করতে পারেনা। একইভাবে কমিউনিজমের উপস্থাপিত সমাজব্যবস্থাও কুরআনী স্কীমের সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ একে 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' এবং 'কুরআনী প্রতিপালন ব্যবস্থা' ইত্যাদি প্রতারণামূলক নাম দিয়ে কিছু লোক আমাদের দেশের সাধারণ মানুষকে ধোকায় ফেলতে চাইছে এবং এই ব্যবস্থাকে জোরপূর্বক কুরআনের উপর চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এ ব্যবস্থার সাথে কুরআনী দৃষ্টিভংগির দূরতম

---

১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আর রূম, টীকা ৫৭।

কোনো সম্পর্কও নেই। এ ব্যবস্থা কুরআনী দৃষ্টিভংগির সম্পূর্ণ খেলাফ। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত নৈতিকতার লালন ও চারিত্রিক উন্নতি সাধনের পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। কুরআনের স্কীম তো কেবল সে সমাজেই বাস্তবায়িত হতে পারে যেখানে সমাজের মানুষ ব্যক্তিগতভাবে কিছু না কিছু সহায় সম্পদের মালিক হবে; নিজ মালিকানাধীন সহায় সম্পদের ব্যয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভ করবে এবং নিজের ইচ্ছা আগ্রহ অনুযায়ী আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহ্দের অধিকার নিষ্ঠার সাথে আদায় করতে পারে। এই ধরনের সমাজের ক্ষেত্রেই আশা করা যেতে পারে যে, একদিকে সেখানে মানুষের মধ্যে পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং তা প্রদান করার মতো মহান গুণাবলী সৃষ্টি হবে। অপরদিকে যেসব লোকের সাথে এই কল্যাণমূলক আচরণ করা হবে, তাদের অন্তরেও এই কল্যাণকারী লোকদের প্রতি হৃদ্যতা, কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা, আন্তরিকতা এবং অনুগ্রহ করার পবিত্র মনোভাব সৃষ্টি ও লালিত হবে। এভাবেই শেষ পর্যন্ত এমন একটি আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি হবে, যেখানে অন্যায়ের প্রতিরোধ আর ন্যায়ের প্রতিপালন কোনো ক্ষমতাধরের ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল হবেনা। বরঞ্চ লোকেরা নিজ থেকেই অন্তরের পবিত্রতা ও সদিচ্ছার কারণে স্বেচ্ছায় এসব দায়িত্ব পালন করে যাবে।

৩. জীবিকার ধারণা এবং ব্যয়ের দৃষ্টিভংগি

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ - (طٰه : ١٣١)

"পার্থিব জীবনের সেইসব জাঁকজমকের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিও দিয়োনা, যা আমি এই লোকদের মধ্য থেকে বিভিন্ন জনকে দিয়ে রেখেছি। এগুলো তো তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলার জন্য দিয়েছি। আসলে তোমার রবের দেওয়া হালাল জীবিকাই উত্তম এবং স্থায়ী।" [সূরা তোয়াহা ঃ ১৩১]

আমরা এখানে 'রিয্‌ক' শব্দের অনুবাদ করেছি 'হালাল জীবিকা'। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালা কোথাও হারাম ধনমালকে 'রিয্‌কে রব' বা 'রবের দেওয়া জীবিকা' বলেননি। আল্লাহ্ তায়ালার এ বাণীর মর্ম হলো, ফাসিক ফাজির লোকেরা অবৈধ পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে নিজেদের জীবনে যে বাহ্যিক চাকচিক্য সৃষ্টি করে, তাকে ঈর্ষা ও লোভের দৃষ্টিতে দেখা তোমার ও তোমার সাথী ঈমানদার লোকদের কাজ নয়। বৈধ পন্থায় তোমরা যে পবিত্র জীবিকা উপার্জন কর, তা পরিমাণের দিক থেকে যতো কমই হোকনা কেন, সত্যপন্থী ও ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্যে তা-ই উত্তম ও কল্যাণকর। আর এর মধ্যেই সেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা ইহজগত থেকে নিয়ে পরজগত পর্যন্ত বিস্তৃত ও স্থায়ী হবে।[১]

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ - (النور: ٣٨)

"আল্লাহ যাকে চান অগণিত দান করেন।" [আন নূর ঃ ৩৮]

وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ -(القصص: ٨٢)

"আফসোস আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা জীবিকার প্রশস্ততা দান করেন আর যাকে ইচ্ছা পরিমিত মাত্রায় দিয়ে থাকেন।" [আল কাসাস ঃ ৮২]

অর্থাৎ জীবিকার প্রশস্ততা এবং সংকীর্ণতা যেটাই হোক না কেন, তা আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্র ইচ্ছার পেছনে থাকে কল্যাণ ও মঙ্গল। কাউকে অধিক জীবিকা দানের অনিবার্য অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং সম্পদ দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করছেন। অনেক সময় এমন হয় যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্র সাংঘাতিক অপছন্দনীয়, কিন্তু আল্লাহ তাকে বিপুল ধনসম্পদ দান করে

১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা তোয়াহা, টীকা ঃ ১১৩

যাচ্ছেন। অবশেষে এই ধনসম্পদই তার উপর আল্লাহর আযাব নিয়ে আসে। পক্ষান্তরে কাউকেও যদি পরিমিত দান করা হয়ে থাকে, তবে তার অনিবার্য অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর অসন্তুষ্ট এবং স্বল্প রিযিক দিয়ে আল্লাহ তাকে সাজা দিচ্ছেন। আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়া সত্ত্বেও নেক লোকের উপর জীবিকার সংকীর্ণতা চেপে থাকতে পারে। অনেক সময় আল্লাহ্‌র রহমত হিসেবেও তাঁদের জীবিকা এরূপ সংকীর্ণ করা হতে পারে। সম্পদ দান সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র এই নীতি অনুধাবনে ব্যর্থ হবার কারণেই বহু লোক আল্লাহ্‌র অভিশাপে নিপতিত লোকদের প্রাচুর্যের প্রতি লোভ ও ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।[২]

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - (الحج : ٣٥)

"যাদের অবস্থা এমন যে, আল্লাহ্‌র কথা শুনতেই তাদের অন্তর কেঁপে উঠে, তাদের উপর যে বিপদ আসে, তাতে তারা সবর অবলম্বন করে, সালাত কায়েম করে, আর আমরা যে জীবিকা তাদের দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।" [আল হজ্জ ঃ ৩৫]

পূর্বেই একথা বলে এসেছি যে, আল্লাহ তায়ালা কখনো হারাম এবং অপবিত্র ধনসম্পদকে 'তাঁর দেয়া জীবিকা' বলেননি। তাই এই আয়াতের অর্থ হবে, যে পবিত্র জীবিকা আমরা তাদের দান করেছি, অথবা যে হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা তাদের করে দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে। ব্যয় শব্দ দ্বারাও এখানে সব ধরনের ব্যয়কে বুঝানো হয়নি। এখানে ব্যয়ের অর্থ হলো, নিজের এবং নিজ পরিবার পরিজনের বৈধ প্রয়োজন পূরণ করা; আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা, জনকল্যাণকর কাজে অংশ নেয়া এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী করার কাজে আর্থিক কুরবানী করা। বাহুল্য ব্যয়, বিলাসিতা ও জাঁকজমকের জন্যে ব্যয় এবং লোক দেখানো ব্যয় সেই ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, কুরআন যাকে 'ইনফাক' বলেছে; বরং এ ধরনের ব্যয়কে তো কুরআন অপব্যয় বলে আখ্যায়িত করেছে। অনুরূপভাবে কৃপণতা ও সংকীর্ণ মন নিয়ে যে ব্যয় করা হয়, যার দ্বারা স্বীয় পরিবার পরিজনকে সংকীর্ণতায় ফেলে রাখা হয় এবং যে ব্যয়ের দ্বারা নিজের অবস্থা ও মর্যাদা অনুযায়ী প্রয়োজন পূরণ করা হয়না এবং সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবা ও সাহায্যেও এগিয়ে আসা হয়না—এসব ব্যয়কে আর যাই হোক, কুরআনে বর্ণিত 'ইনফাক' নামে অভিহিত করা যায় না। বরং আল কুরআন একে কৃপণতা এবং মনের সংকীর্ণতা বলে অভিহিত করেছে।[৩]

---

২. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল কাসাস, টীকা ঃ ১০১

৩. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হজ্জ, টীকা ঃ ৬৬

৪. ব্যয়ের মূলনীতি

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

"সেসব জিনিস থেকে খাও যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" [সূরা আল আনআম ঃ ১৪২]

এখানে আল্লাহ্ তায়ালা তিনটি কথা বলেছেন। এক. মানুষ যেসব ক্ষেত খামার, বাগবাগিচা এবং জীবজন্তুর অধিকারী তা সবই আল্লাহ্র দান। এই দান করার ক্ষেত্রে অপর কারো কোনো অংশ নেই। সুতরাং দানের কৃতজ্ঞতা পাবার ক্ষেত্রেও অপর কারো কোনো অংশ থাকতে পারেনা। দুই. যেহেতু এসব জিনিস আল্লাহ্রই দান, সেহেতু এগুলির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কেবল আল্লাহ্র দেয়া আইন কানুন এবং নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সীমারেখা, নিয়ম কানুন এবং নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার কোনো অধিকার অপর কারো থাকতে পারেনা। আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো আরোপিত সীমারেখা ও বিধিবন্ধন মেনে চলা এবং আল্লাহ ছাড়া অপর কারো সামনে দানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নজরানা পেশ করা বিলকুল সীমালংঘন। আর এটাই শয়তানের পদাংক অনুসরণ। তিন, আল্লাহ তায়ালা যেসব হালাল জিনিস মানুষের পানাহার ও ভোগ ব্যবহারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, অনর্থক সেগুলোকে হারাম করে নেয়া বৈধ নয়। মানুষ নিজের ধারণা কল্পনার ভিত্তিতে আল্লাহর দেয়া জীবিকা ও নিয়ামতসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেসব বিধি নিষেধ আরোপ করে নিয়েছে, তা আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক।[১]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۔ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۠ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۔ (المائدة : ٨٧ - ٨٨)

"হে ঈমানদার লোকেরা। আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যেসব পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন, সেগুলিকে তোমরা হারাম করোনা এবং সীমালংঘন করোনা, আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের সাংঘাতিক অপছন্দ করেন। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল পবিত্র জীবিকা দান করেছেন, তা থেকে পানাহার কর এবং সেই মহান আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করা থেকে নিজেকে সংরক্ষণ কর, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো।" [সূরা আল মায়িদা ঃ ৮৭-৮৮]

---

১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আনআম, টীকা ঃ ১১৮

এখানে দুটি কথা বলা হয়েছে। এক. মানুষ যেন হালাল হারাম নির্ধারণ করার অধিকার নিজের হাতে তুলে না নেয়। প্রকৃতপক্ষে সেটাই হালাল, যা আল্লাহ হালাল করেছেন। আর হারামও কেবল সেটাই, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। নিজেদের ইচ্ছেমতো কোনো হালালকে যদি হারাম করা হয় তবে আল্লাহর আইন পালনকারী হবার পরিবর্তে নফসের আইন পালনকারী বলে সাব্যস্ত হতে হবে।

দুই. খৃস্টান পাদ্রী, হিন্দু সন্নাসী, বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং প্রাচ্যের সূফীদের মতো বৈরাগ্য অবলম্বন এবং ভোগ ব্যবহার পরিহারের পন্থা অবলম্বন করা যাবেনা। ধর্মীয় মানসিকতা সম্পন্ন সরল প্রকৃতির কিছু লোকদের মধ্যে সব সময়ই এ প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে যে, তাঁরা দেহ ও আত্মার অধিকার প্রদান করাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক মনে করেছেন। তাদের ধারণা, নিজেকে নিজে কষ্টে নিমজ্জিত করা, নিজের আত্মাকে পার্থিব ভোগ ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করা এবং পার্থিব জীবনোপকরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা নেকীর কাজ এবং এ পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও অনুরূপ মানসিকতার দুয়েকজন ছিলেন। একবার নবী করীম (সা) জানতে পারলেন, কয়েকজন সাহাবী এই বলে শপথ করেছেন যে তারা সারাজীবন [প্রতিদিন] রোযা রাখবেন, রাত্রে কখনো বিছানায় শোবেন না, বরং সারারাত বিনিদ্র জেগে ইবাদত করে কাটাবেন, কখনো গোশ্‌ত এবং চর্বি খাবেন না এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না। এ সম্পর্কে নবী করীম (সা) একটি ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন ঃ "আমাকে এরূপ করবার হুকুম দেয়া হয়নি। তোমাদের উপর তোমাদের আত্মারও অধিকার আছে। সুতরাং কোনো কোনো দিন রোযা রাখবে এবং কোনো কোনো দিন পানাহার করবে। রাত জেগে ইবাদতও করবে আবার ঘুমাবেও। আমাকে দেখ! আমি রাত্রে ঘুমাই আবার নামাযেও দাঁড়াই। কোনো দিন রোযা রাখি আবার কোনো দিন রোযা ছেড়ে দিই। গোশ্‌তও খাই, ঘিও খাই, সুতরাং যে আমার অনুসৃত নিয়ম পন্থা অপছন্দ করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" অতঃপর তিনি বললেন ঃ "এই লোকদের কি হয়েছে? কেন এরা নিজেদের জন্য নারী, উত্তম খাদ্য, সুগন্ধি, ঘুম এবং পার্থিব ভোগ ব্যবহার হারাম করে নিয়েছে? আমি তো তোমাদেরকে পাদ্রী এবং সন্নাসী হবার শিক্ষা দিইনি! আমার আনীত দীনের মধ্যে নারী এবং গোশ্‌ত পরিহার করার বিধান নেই। ঘরের কোনায় নির্জনবাসের কোনো নিয়ম নেই। আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে এখানকার বিধান হলো রোযা রাখা। বৈরাগ্যবাদের পরিবর্তে এখানে কল্যাণ লাভের পথ হলো জিহাদ। আল্লাহর আনুগত্য দাসত্ব কর! তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করোনা। হজ্জ্ব এবং উমরা পালন কর। সালাত কায়েম কর। যাকাত পরিশোধ কর এবং রমযানের রোযা রাখ। তোমাদের পূর্বেকার যেসব লোক ধ্বংস হয়েছে, তারা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তারা নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ করে নিয়েছিল। ফলে আল্লাহও তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করেছেন। গীর্জা ও খানকায় যা ঘটছে তা তাদেরই ধ্বংসাবশেষ।"

এ প্রসংগে আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায় নবী করীম (সা) জনৈক সাহাবী

সম্পর্কে জানতে পারলেন যে, তিনি দীর্ঘদিন তার স্ত্রীর নিকট যাননি। দিনরাত ইবাদতে মশগুল থাকেন। তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে রাসূল (সা) তাঁকে নির্দেশ দিলেন, এখনই তোমার স্ত্রীর কাছে যাও। সাহাবী বললেন, আমি যে রোযা রেখেছি। তিনি বললেন ঃ রোযা ভেংগে ফেলো এবং যাও।

হযরত উমরের খিলাফতকালে এক মহিলা এসে অভিযোগ করলো ঃ "আমার স্বামী প্রতিদিন রোযা রাখেন এবং সারারাত ইবাদত করেন। আমার সাথে কোনো সংস্পর্শ রাখেন না।" হযরত উমর (রা) বিখ্যাত তাবেয়ী কায়াব ইবনে সাওরুল আযদীকে তাদের মামলা শুনার জন্যে নিযুক্ত করলে তিনি এই ফায়সালা প্রদান করেন যে, এই মহিলার স্বামী একাধারে তিন রাত যতো ইচ্ছে ইবাদত করতে পারে। কিন্তু চতুর্থ রাতে তাকে অবশ্যি তার স্ত্রীর কাছে আসতে হবে। এটা স্ত্রীর অধিকার।[২]

এই আয়াতে 'সীমালংঘন করা' কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। হালালকে হারাম করা এবং আল্লাহ তায়ালা যেসব জিনিসকে পবিত্র বলেছেন, সেগুলোকে অপবিত্র জিনিসের মতো পরিহার করাও এক প্রকার সীমালংঘন। পবিত্র জিনিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপব্যয় এবং বাহুল্য ব্যয়ও একপ্রকার সীমালংঘন। তাছাড়া হালালের সীমা অতিক্রম করে হারামের সীমায় প্রবেশ করাও আরেক প্রকার সীমালংঘন। এই তিন ধরনের সীমালংঘনই আল্লাহ্র অপছন্দনীয়।[৩]

---

২. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মায়িদা, টীকা ঃ ১০৪
৩. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মায়িদা, টীকা ঃ ১০৫

৫. মিতব্যয়ের মূলনীতি

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا - وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ (الفرقان : ٦٧-٦٨)

"যারা খরচ করার সময় বাহুল্য খরচ করেনা, আবার কৃপণতাও করেনা, বরঞ্চ তাদের ব্যয় এই দুই প্রান্তিকতার মধ্যবর্তী হয়ে থাকে। তারা আল্লাহ ছাড়া অপর কোনো ইলাহকে ডাকেনা। আল্লাহ্‌র হারাম করা কোনো প্রাণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেনা। ব্যভিচারে লিপ্ত হয়না। যে-ই এ অপরাধের কাজ করবে, সে অবশ্যি তার অপরাধের প্রতিফল লাভ করবে।" [সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৭-৬৮]

অর্থাৎ তারা এমন নয় যে, বিলাসিতা, জুয়া খেলা, মদ্যপান, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া, মেলা মীনাবাজার এবং বিয়েশাদীতে অঢেল অর্থ ব্যয় করবে এবং নিজের অবস্থার চেয়ে অধিক জৌলুস দেখানোর জন্যে খানাপিনা, ঘরবাড়ী, পোশাক আশাক, সাজসজ্জা ও বেশভূষায় দুই হাতে অর্থ লুটাবে। পক্ষান্তরে তারা এমনও নয় যে, অর্থপূজারী ব্যক্তির মতো পাই পাই করে অর্থকড়ি ধনদৌলত সংগ্রহ করবে; অথচ নিজেও খাবেনা, সামর্থানুযায়ী সন্তান সন্ততির প্রয়োজনও পূরণ করবেনা এবং আন্তরিকতার সাথে কোনো কল্যাণমূলক কাজেও ব্যয় করবেনা। তৎকালীন আরবদেশে এই দুই ধরনের লোকই ছিলো। একদিকে ছিলো সেইসব লোক যারা লাগামহীনভাবে অর্থকড়ি ব্যয় করতো। এরা অর্থকড়ি ব্যয় করতো নিজেদের ভোগ বিলাসিতার জন্যে, সমাজে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখা এবং স্বীয় বদান্যতা ও ধনদৌলতের ডঙ্কা বাজানোর জন্যে। অপরদিকে ছিলো সেইসব কৃপণ লোক, যাদের কৃপণতা খ্যাতি অর্জন করেছিল। খুব কম লোকই ছিলো, যারা মিতব্যয়িতার নীতি অবলম্বন করতো। এই গুটিকয়েক মিতব্যয়ী ব্যক্তির মধ্যেও রাসূলে করীম (সা) এবং তাঁর সাথীরাই ছিলেন সর্বাধিক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

এ প্রসংগে অপব্যয় ও কৃপণতার সংজ্ঞা জেনে নেয়া দরকার।

ইসলামের দৃষ্টিতে তিনটি জিনিসকে অপব্যয় বলা হয় ঃ

এক. অবৈধ কাজে অর্থসম্পদ ব্যয় করা, তা একটি পয়সাই হোকনা কেন।

দুই. বৈধ কাজে খরচ করতে গিয়ে সীমালংঘন করা, চাই তা সামর্থ্যের চেয়ে অধিক খরচ করা হোক, কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ নিজের ভোগবিলাস ও জাঁকজমকের জন্যে ব্যয় করা হোক।

তিন. ভালো কাজে ব্যয় করা, কিন্তু তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য নয়, বরঞ্চ লোক দেখানো ও আত্মপ্রচারের জন্যে করা।

অপরদিকে দুটি জিনিসকে কৃপণতা বলা হয় ঃ

এক. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের ও সন্তান সন্ততির প্রয়োজন পূরণ না করা এবং

দুই. ভাল, ন্যায় ও কল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় না করা।

এই দুই প্রান্তিকতার মধ্যবর্তী অবস্থাই হলো মিতব্যয়। আর এটাই হলো অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশিত পন্থা। এ সম্পর্কেই নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهُ فِيْ مَعِيْشَتِهِ -

"জীবিকার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই বিজ্ঞতার পরিচায়ক।" [আহমদ ও তাবরানী ঃ আবু দারদা]

৬. অর্থনৈতিক সুবিচার

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ (الاعراف : ٨٥)

"[শুয়াইব] বললো ঃ হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আল্লাহ্‌র দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নাই। তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও পথনির্দেশনা এসেছে। সুতরাং ওজন ও পরিমাপ পূর্ণ করে দাও। লোকদের দ্রব্য সামগ্রীতে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করোনা। সংস্কার সংশোধনের পর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত আছে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।" [সূরা আ'রাফ ঃ ৮৫]

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ -

"তার জাতির সেসব নেতা, যারা তার আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকার করলো, নিজেরা নিজেরা বলাবলি করলো ঃ শুয়াইবের আহবানে সাড়া দিলে তোমরা অবশ্যি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" [সূরা আ'রাফ ঃ ৯০]

প্রথম আয়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের জাতির মধ্যে দুটি বিরাট অন্যায় অপরাধের কাজ বর্তমান ছিলো। এর একটি হলো শিরক; আর অপরটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি। শুয়াইব আলাইহিস সালামের জাতির নেতারা তাঁর আহবানের যে জবাব দিয়েছে, তাকে ছোট করে ভাবা ঠিক হবেনা। বরঞ্চ তাদের বক্তব্যে ভেবে দেখার মতো বিষয় রয়েছে। মাদইয়ানের সর্দার লীডাররা মূলত একথাই বলছিল এবং জাতির লোকদের বুঝাচ্ছিল যে, শুয়াইব যে সততা ও বিশ্বস্ততার আহবান জানাচ্ছে এবং নৈতিকতা ও সুবিচারের যেসব সুদৃঢ় নীতিমালা অনুসরণ করতে বলছে সেগুলো মেনে নিলে তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। সত্য ও সততার নীতি অনুসরণ করলে এবং খাঁটি ও অকৃত্রিম লেনদেন করলে কেমন করে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য চলতে পারে? তাছাড়া আমরা যে বিশ্ববাণিজ্যের সবচেয়ে বড় দুটি রাজপথের চৌমাথায় বাস করছি এবং মিশর ও ইরাকের মতো বিশাল সভ্য সুসংগঠিত ও উন্নত সাম্রাজ্যের সীমানায় অধিবাস করছি, সে হিসেবে আমরা যদি বাণিজ্য কাফেলাসমূহকে উৎপীড়ন করা বন্ধ করে দিই এবং শান্তিপ্রিয় ভালো মানুষ হয়ে বসি, তবেতো বর্তমান ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে আমরা যেসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করছি, সেগুলো সব খতম হয়ে যাবে এবং আশেপাশের জাতিসমূহের উপর আমাদের যে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তা আর অবশিষ্ট থাকবেনা। এ ধরনের চিন্তা ও আচরণ

কেবল শুয়াইব আলাইহিস সালামের জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরঞ্চ সকল যুগের বিকৃত মন ও চরিত্রের লোকেরাই সত্য, সততা ও সুবিচারের নীতিকে এরকমই বিপদজনক বলে মনে করেছে। প্রত্যেক যুগের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকেরাই এ দৃষ্টিভংগি পোষণ করেছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি এবং অন্যান্য ধর্মীয় কার্যক্রম মিথ্যা, অসততা এবং অনৈতিকতা ছাড়া চলতে পারেনা। সর্বত্রই সত্যের দাওয়াতের বিরুদ্ধে যেসব বড় বড় অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, তন্মধ্যে এটাও একটি যে, বিশ্বের প্রচলিত পথ ও পন্থা থেকে বেরিয়ে এসে যদি এই দাওয়াতের অনুসরণ করা হয় তবে তো জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।[১]

---

১. তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা আ'রাফ ঃ টীকা ৭০ ও ৭৪

দ্বিতীয় খন্ড

ইসলামী অর্থব্যবস্থার কতিপয় দিক

এ খণ্ডে আছে

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূমির মালিকানা

[ভূমির মালিকানা সমস্যা আধুনিককালের বড় বড় সমস্যাগুলোর অন্যতম। এর উপর এতো বেশী আলোচনা, পর্যালোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ হয়েছে যে, এখন মতভেদের স্তূপের নীচে প্রকৃত সত্য চাপা পড়ে গেছে। এ সম্পর্কে চিন্তা গবেষণার সঠিক সমকোণ এখন স্পর্শকাতর হয়ে রয়েছে। একদিকে কিছু লোক সমর্থন করে পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানাকে। অপরদিকে অন্য কিছু লোক সমর্থন করে বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত জাতীয় মালিকানার সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে। ব্যক্তি মালিকানার সমর্থকদের জোতদার ও পুঁজিপতিদের এজেন্ট বলে গালি দেয়া হয়। আর যারা জমিদারী ও জায়গীরদারীর বিরোধী, তারা এ প্রথার সংস্কারের জন্যে বিকল্প হিসেবে জাতীয় মালিকানা ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করতেই প্রস্তুত নয়। দৃষ্টিভংগির এসব বিকৃতির কারণে কিছু কিছু লোকের পক্ষে ইসলামের মালিকানা সংক্রান্ত ধারণা অনুধাবন করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার বিস্তারিত লিখেছেন। আমরা তাঁর লেখা থেকে কিছু অংশ নতুনভাবে বিন্যাস করে এ গ্রন্থে সংকলিত করে দিয়েছি, যাতে এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভংগি পাঠকদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ইসলামের মালিকানা ব্যবস্থার উপর চিন্তা করতে হবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে, অন্য কোনো ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে নয়।

এ প্রসংগে আরেকটি কথা সামনে রাখতে হবে। তা হলো, ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তুলনায় ঢের পুরাতন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থাকে ব্যবহার করেছে এবং একটি বিশেষ আকৃতি দান করেছে। এক্ষেত্রে যেসব বিকৃতি ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তা মূলত পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই অন্তর্নিহিত ভাবধারা, মৌল উদ্দেশ্য এবং রূপ-আকৃতি ও প্রাতিষ্ঠানিকতার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ প্রসংগে চিন্তা করার সময় 'ব্যক্তিমালিকানা' এবং 'পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে এর বিকৃত রূপ'-এর মাঝে সৃষ্ট সেই ভ্রান্ত জটিলতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে, সমাজতান্ত্রিক তাত্ত্বিকরা যার মধ্যে লোকদেরকে নিমজ্জিত করতে চায়।—[সংকলক]

১. কুরআন এবং ব্যক্তিমালিকানা

সর্বপ্রথম আমি এ মূলনীতি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যখন কোনো প্রচলিত প্রথার ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করা হয়, তখন তাকে সবসময়ই সম্মতি ও বৈধতার সমর্থক বলে ধরে নেয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোনো এলাকার লোকেরা জনসাধারণের চলাচলের জন্য কোনো জমির উপর দিয়ে পথ বানিয়ে নেয় এবং সেখান দিয়ে যাতায়াত নিষিদ্ধ বলে কোনো নোটিশ লাগানো না হয়, তাহলে এর অর্থ হবে ঐ পথে যাতায়াতের অনুমতি আছে। এই বৈধতার জন্য নতুনভাবে কোনো ইতিবাচক অনুমতির প্রয়োজন হয় না। কারণ সে পথে যাতায়াত নিষিদ্ধ না হওয়াটাই অনুমতির অর্থ সৃষ্টি করছে। ভূমির মালিকানার ব্যাপারটাও ঠিক তাই। ইসলামের পূর্বে হাজার হাজার বছর ধরে দুনিয়ায় এ প্রথা জারি ছিল। কুরআন তা নিষিদ্ধ করেনি, তা রহিত করার জন্য কোনো স্পষ্ট নির্দেশও দেয়নি, এর পরিবর্তে অন্য কোনো আইনও প্রণয়ন করেনি; এমনকি, ইশারা ইঙ্গিতে কোথাও এর সমালোচনাও করেনি। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই পুরাতন রেওয়াজকে বৈধ রেখেছেন। এই অর্থ গ্রহণ করেই মুসলমানগণ কুরআন নাযিল হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত ভূমিকে সেভাবেই ব্যক্তিমালিকানায় রাখছে যেভাবে ইতিপূর্বে তা ব্যক্তিমালিকানায় ছিল। এখন যদি কেউ এটা নাজায়েয হওয়ার দাবী করে, তবে তাকেই এর পক্ষে দলীল পেশ করতে হবে—আমার কাছে সে এর প্রমাণ চাইতে পারে না।

কিন্তু কথা শুধু এতটুকুই নয় যে, কুরআন প্রাচীন প্রথাকে রহিত করেনি, বরং আপনি যদি গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করেন, তবে জানতে পারবেন যে, কুরআন এ প্রথাকে ইতিবাচকভাবেই বৈধ হিসেবে সমর্থন করেছে এবং এরই ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে হুকুম দিয়েছে। দেখুন! ভূমির সাথে মানুষের দুটি উদ্দেশ্য জড়িত; হয় 'চাষাবাদ' অথবা 'বসবাস'। এ দুটি উদ্দেশ্যে কুরআন জমির ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে।

সূরা আন'আমে বলা হয়েছে—

كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ - (انعام : ١٤١)

"এর ফলমূল থেকে খাও যখন তা ফলে এবং এর ফসল কাটার সময় তাঁর (আল্লাহর) হক আদায় কর।"

এখানে আল্লাহর হক আদায় করার অর্থ দান-খয়রাত ও যাকাত প্রদান। প্রকাশ থাকে যে, ভূমির উপর সামাজিক মালিকানা হলে যাকাত দেয়া বা নেয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ হুকুম তো কেবল তখনই দেয়া যেতে পারে যখন কিছু লোক ভূমির মালিক হবে এবং তারা এর উৎপাদন থেকে আল্লাহ্র হক পৃথক করে ভূমিহীন নিঃস্বদের মধ্যে বিতরণ করে দেবে। এখন বলুন—যাকাতের নির্দেশ জারি করে কুরআন ভূমির ব্যক্তিমালিকানার প্রাচীন প্রথার প্রত্যয়ন করেছে কিনা? অন্য আর এক আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ -

(البقرة : ٢٦٧)

"হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পবিত্র উপার্জন থেকে খরচ কর এবং সেইসব জিনিস থেকে যা আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেছি।" [বাকারা ঃ ২৬৭]

জমির উৎপাদন থেকে খরচ করার যে হুকুম এখানে দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে সকলেই একমত যে, তা হলো যাকাত ও দান-খয়রাত। যারা উৎপাদিত জিনিসের মালিক হবে তাদেরকেই এ হুকুম পালন করতে হবে। আর এ দান তাদের জন্য করতে হবে যারা সহায় সম্পত্তির মালিক নয়। বস্তুত দানখয়রাত কার প্রাপ্য কুরআনে তাও বলে দেয়া হয়েছে।

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ -(البقرة : ٢٧٣)

"এটা অভাবগ্রস্তদের প্রাপ্য যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, তারা দেশময় ঘোরাফেরা করতে পারে না।" [বাকারা ঃ ২৭৩]

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ ... (التوبة : ٦٠)

"যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত প্রাপ্য।" [তওবা ঃ ৬০]

এখন দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে সূরা নূরে বলা হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا...... فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ - (النور : ٢٧)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের বাড়ী ছাড়া অন্যের বাড়ীতে বিনানুমতিতে প্রবেশ করো না। আর প্রবেশ করেই বাড়ির মালিককে সালাম করবে.... যদি সেখানে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করো না।" [নূর ঃ ২৭-২৮]

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, কুরআন মজীদ বসবাসের জন্যও ভূমির ব্যক্তিগত দখল ও মালিকানার স্বীকৃতি দান করে এবং মালিকের এই অধিকার স্বীকার করে যে, তার অনুমতি ছাড়া কেউ তার দখলীভুক্ত এলাকায় পা রাখতে পারবে না।

এখন হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। যদি সামগ্রিকভাবে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস এবং তাঁর যুগের কার্যক্রম ও খেলাফতে রাশেদার যুগের কার্যক্রম এবং নবী করীম (সা)-এর নিকটবর্তীকালের ইমামগণ, কুরআন, হাদীস ও সাহাবাদের বাণীর উপরে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখা যায় যে, ভূমির মালিকানার ব্যাপারে তারা ইসলামের আইন কিভাবে বুঝেছিলেন, তাহলে এ সম্পর্কে মোটেই সন্দেহের অবকাশ থাকবে না যে, ইসলাম শুধু ব্যক্তিমালিকানাই জায়েয রাখে না, বরং ইসলাম ব্যক্তিমালিকানার কোনো নির্দিষ্ট সীমাও নির্ধারণ করে না। এবং জমির মালিককে এই অধিকার দেয় যে, যে ভূমি কোনো ব্যক্তি নিজে চাষাবাদ করতে পারবে না, তা অপরকে মুজারায়ায় (ভাগচাষে) অথবা কিরায়ায় (নগদ অর্থের বিনিময়ে) চাষাবাদ করতে দিতে পারবে। এখন আসুন এ বিষয়ে আমরা ইসলামী আইনের মূল উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখি।

২. রাসূল (সা) ও খেলাফতে রাশেদার যুগের দৃষ্টান্ত

রাসূলে করীম (সা) এবং খেলাফতে রাশেদার যুগে ভূমি ব্যবস্থাপনা কোন্ পদ্ধতিতে করা হয়েছিল তা বুঝার জন্য মনে রাখতে হবে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে আসা ভূমি চারটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ

(১) যে ভূমির মালিক ইসলাম কবুল করেছিল।

(২) যে ভূমির মালিক নিজেদের ধর্মেই বহাল থেকে যায়, কিন্তু একটি চুক্তির মাধ্যমে নিজেকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন করে দেয়।

(৩) যে ভূমির মালিক যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে।

(৪) যে ভূমি কারো মালিকানায় ছিল না।

এসব ব্যাপারে রাসূল (সা) ও তাঁর খলিফাগণ কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা আমরা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করবো।

প্রথম প্রকারের ভূমির মালিকানা বিধান

প্রথম প্রকারের ভূমির মালিকানার ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা) যে নীতিমালা অনুসরণ করেছেন তা হলো ঃ

إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوْا أَحْرَزُوْا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ -

"মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে নিজের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ করে নেয়।"

إِنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ -

"ইসলাম গ্রহণ করার সময় মানুষ যে সম্পদের মালিক ছিল তা তারই মালিকানায় থাকবে।"

এ নীতিমালা স্থাবর ও অস্থাবর সব সম্পদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হত। অকৃষিজ ও কৃষিজ উভয় জমির বেলায় একইরূপ নীতি অনুসরণ করা হত। হাদীস ও আছারের গোটা সংগ্রহ এ কথার সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরবের কোথাও ইসলাম গ্রহণকারীদের সম্পদের মালিকানার ব্যাপারে কোনো আপত্তি তোলেননি। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে যে লোক যে জমির মালিক ছিল, ইসলাম গ্রহণ করার পর তাকে সেই জমির মালিক রাখা হয়েছে।

এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন ঃ

"যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের রক্ত (হত্যা করা) হারাম। ইসলাম গ্রহণ করার সময় তাঁরা যে সম্পদের মালিক ছিল তা তাদেরই থাকবে। এভাবে তাদের ভূমি তাদের মালিকানায়ই থাকবে। আর এ ভূমিকে 'উশরী' ভূমি বলে অভিহিত করা হবে। এর নজীর হলো মদীনা। মদীনাবাসী রাসূলে করীম (সা)-এর হাতে ইসলাম কবুল করেন এবং তারা তাদের ভূমিরও মালিক থাকেন। এ ভূমির উপর 'উশর' ধার্য করা হয়েছিল। তায়েফ ও বাহরাইনের লোকদের ব্যাপারেও এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। যেসব বেদুঈন ইসলাম কবুল করেছে তাদেরকেও নিজ নিজ কূপ ও এলাকার মালিক হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে। তাদের জমি 'উশরী'। তা থেকে তাদেরকে বেদখল করা যাবে না। এ জমিকে তারা বিক্রি করতে পারবে এবং তাদের উত্তরাধিকারীগণ এর সকল অধিকার ভোগ করতে পারবে। অনুরূপভাবে কোনো এলাকার অধিবাসীগণ ইসলাম কবুল করলে তারা তাদের সম্পদের মালিক থাকবে।" (কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৩৫)

ইসলামের অর্থনীতি বিষয়ক আইনের আরেক বিশেষজ্ঞ ইমাম আবু ওবায়েদ আল কাসেম ইবনে সাল্লাম লিখেন ঃ

"হযরত রাসূলে করীম (সা) এবং তাঁর খলীফাদের নিকট হতে যে 'আছার' আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে, তা ভূমির ব্যাপারে তিন ধরনের বিধান বহন করে এনেছে। এক প্রকার বিধান হলো, ওইসব ভূমি সম্পর্কে যার মালিকগণ ইসলাম কবুল করে। ইসলাম গ্রহণের সময় তারা যে ভূমির মালিক ছিল তা তাদেরই মালিকানায় থাকবে। এসব ভূমিকে 'উশরী' ভূমি বলে অভিহিত করা হবে। 'উশর' ছাড়া এসব ভূমির উপর আর কোনোরূপ কর আরোপিত হবে না।" [কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৫৫]

সামনে এগিয়ে তিনি আরও লিখেছেন ঃ

"যে এলাকার অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা নিজেদের জমির মালিক থাকবে। যেমন মদীনা, তায়েফ, ইয়েমেন ও বাহরাইন। এভাবে মক্কাও, যদিও মক্কা অস্ত্রবলে জয় করা হয়েছে, কিন্তু রাসূলে করীম (সা) মক্কাবাসীদের প্রতি দয়া করেছেন এবং তাদের জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করেননি এবং তাদের সম্পদকে গনীমতের মাল হিসেবে ঘোষণা দেননি। অতএব এদের ধনসম্পদ যখন তাদের মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হলো তখন তারা পরে মুসলমান হয়ে গেলো। তাদের মালিকানার ব্যাপারে সেই হুকুমই থাকলো যা অন্যান্য ইসলাম গ্রহণকারীদের মালিকানা সম্পর্কে ছিল। আর তাদের জমি 'উশরী' জমি হিসেবে পরিগণিত হলো।" (ঐ, পৃষ্ঠা ৫১২)

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (র) যাদুল মাআদে লিখেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নীতি এই ছিল যে, ইসলাম গ্রহণকালে যে ব্যক্তি যে সম্পদের মালিক ছিল তা তারই মালিকানায় থাকবে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তা কিভাবে তার

দখলে এসেছে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয়নি, বরং তা তার হাতে সেভাবেই থাকতে দেয়া হয়েছে যেভাবে আগে থেকে চলে আসছিল।" [২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৬]

এটা এমন এক মৌলনীতি যাতে ব্যতিক্রমের একটি উদাহরণও রাসূলুল্লাহ (সা) ও খেলাফতে রাশেদার যুগে পাওয়া যায় না। ইসলাম এর অনুসারীদের অর্থনৈতিক জীবনে যেসব সংশোধনই জারি করেছে তা করেছে ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু আগে থেকেই যে মালিকানা লোকদের দখলে ছিল তা বিলোপ করা হয়নি।

দ্বিতীয় প্রকারের ভূমির মালিকানা বিধান

দ্বিতীয় প্রকারের লোক ছিল তারা, যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি; কিন্তু সন্ধির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে বসবাস করাকে মেনে নিয়েছে। এদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) যে নীতি নির্ধারণ করেন তা এই যে, যেসব শর্তের ভিত্তিতে তাদের সাথে সন্ধি হয়েছে কোনোরূপ রদবদল ছাড়াই তা পূর্ণ করতে হবে। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا فَيَظْهَرُوْنَ عَلَيْكُمْ فَيَتَّقُوْنَ بِأَمْوَالِهِمْ دُوْنَ اَنْفُسِهِمْ وَاَبْنَاءِهِمْ فَتُصَالِحُوْنَهُمْ عَلٰى صُلْحٍ فَلَا تُصِيْبُوْا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَالِكَ فَاِنَّهُ لَا يَصْلُحُ -

"যদি কোনো জাতির সাথে তোমাদের যুদ্ধ বাধে এবং তারা ধন সম্পদের বিনিময়ে তোমাদের নিকট তাদের নিজের ও সন্তানের জীবন রক্ষা করতে তৈরী হয়ে যায় এবং তোমরা তাদের সাথে সন্ধি কর, তাহলে সন্ধিচুক্তির চেয়ে বেশী কিছু তোমরা তাদের নিকট থেকে আদায় করো না। কারণ তা তোমাদের জন্য জায়েয হবে না।"

اَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِ انْتَقَصَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (ابوداؤد)

"সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ যিম্মির উপর যুলুম করবে অথবা চুক্তি অনুসারে তার যে অধিকার আছে তা ক্ষণ্ন করবে, অথবা তার উপর তার সামর্থ্যের বেশী বোঝা আরোপ করবে অথবা সম্মতি ছাড়া তার থেকে কোনো বস্তু আদায় করবে—কিয়ামতের দিন আমি স্বয়ং তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানাবো।" [আবু দাউদ]

এ নীতিমালা অনুযায়ী নাজরান, আয়লা, আযরুআত, হিজরসহ অন্যান্য যেসব এলাকা ও গোত্রের সাথে সন্ধি করা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সা) সেসব এলাকা ও গোত্রের জায়গা জমি, ধনসম্পদ, শিল্প কারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির উপর এলাকাবাসী ও গোত্রের লোকদের মালিকানা পূর্ববৎ বহাল রাখেন এবং তাদের নিকট থেকে চুক্তি মোতাবিক শুধু জিযিয়া ও খাজনা আদায় করেই ক্ষান্ত হন। খেলাফতে রাশেদাও এ

নীতির উপরই আমল করেছেন। ইরাক, সিরিয়া, আল জাযিরা, মিসর, আরমেনিয়া, মোটকথা, যেখানে যেখানে শহর বা জনপদের লোকেরা সন্ধির ভিত্তিতে নিজদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন করে দিয়েছে, তাদের ধনসম্পদ যথারীতি তাদের দখলেই রাখা হয়েছে এবং যে মালের বিনিময়ে সন্ধি হয়েছে তা ব্যতীত তাদের কাছ থেকে আর কিছুই আদায় করা হয়নি। হযরত উমর (রা)-এর সময়ে সার্বিক কল্যাণ চিন্তা করে নাজরানের অধিবাসীদেরকে আরবের অভ্যন্তর থেকে সিরিয়া ও ইরাকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু তাদের যার কাছে নাজরানের যে পরিমাণ কৃষিজ ও বসবাসযোগ্য ভূমি ছিল তার বিনিময়ে অন্যত্র শুধু ওই পরিমাণ ভূমিই তাদেরকে দেয়া হয়নি, বরং হযরত উমর (রা) সিরিয়া ও ইরাকের গভর্ণরদেরকে সাধারণ নির্দেশ লিখে পাঠান যে, "তারা যে যে এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করবে সেখানে فَلْيُوَسِّعُهُمْ مِنْ خَرِيْبِ الْأَرْضِ - তাদেরকে প্রশস্ত মনে উর্বর জমি দিয়ে দাও।" [কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ, পৃঃ ১৮৯]

এই মূলনীতির ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে ও খেলাফতে রাশেদার কালেও কোনো ব্যতিক্রম করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ইসলামের ফিকাহবিদদের এটাও সর্বসম্মত রায়। ইমাম আবু ইউসুফ (র) তাঁর 'কিতাবুল খারাজে' এটাকে আইনের একটি দফা হিসেবে এভাবে বিধৃত করেছেন ঃ

"অমুসলিমদের মধ্যে যে জাতির সাথে ইমামের এ শর্তে সন্ধি স্থাপিত হয় যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত থাকবে এবং কর প্রদান করবে, তাহলে তারা যিম্মী। তাদের ভূমি খারাজের (কর) অন্তর্ভুক্ত ভূমি। যে শর্তে সন্ধি হয়েছে তাদের নিকট হতে ঠিক তা-ই নেয়া হবে। তাদের সাথে অঙ্গীকার পুরা করতে হবে। শর্তের অতিরিক্ত কোনো কিছু করা যাবে না।" [পৃঃ ৩৫]

তৃতীয় প্রকারের ভূমির মালিকানা বিধান

যেসব লোক শেষ সময় পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ করবে এবং অস্ত্রের মুখে পরাজিত হবে তাদের সম্পদের ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা) ও খেলাফতে রাশেদার সময়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কর্মপন্থা গৃহীত হয়েছে ঃ

এক—প্রথম কর্মপন্থা নবী করীম (সা) মক্কা বিজয়কালে গ্রহণ করেছেন। মক্কা বিজয়ের পর لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ - (আজ তোমাদের উপর কোনোরূপ প্রতিশোধ নেয়া হবে না)। এ মর্মে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে বিজিতদের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা দান করেছেন। এ অবস্থায় মক্কাবাসীরা নিজদের জায়গা জমি ও ধনসম্পত্তির যথারীতি মালিক থেকে যায়। আর ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের এসব জমি 'উশরী ভূমি' হিসেবে পরিগণিত হয়।

দুই—দ্বিতীয় কর্মপন্থা খায়বারে অবলম্বন করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে বিজিত ভূমির

সাবেক মালিকদের মালিকানা বিলুপ্ত করা হয়েছে। অতঃপর এর এক অংশ নিয়ে নেয়া হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) জন্য। বাকী জমি খায়বারের যুদ্ধে যারা ইসলামী সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন তাদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। এ বন্টিত ভূমি যাদের ভাগে পড়ে তারাই এর মালিক গণ্য হন। এ ভূমিতে 'উশর' ধার্য হয়। [কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ, পৃঃ ৫১৩]

তিন—তৃতীয় কর্মপন্থা সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের পর হযরত উমর ফারুক (রা) অবলম্বন করেছিলেন। তিনি বিজিত এলাকার জমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করার পরিবর্তে এসব ভূমিকে মুসলমানের সামষ্টিক মালিকানাভুক্ত করেন; আর এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মুসলমানদের তরফ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে নিজের হাতে নিয়ে নেন। তিনি এসব এলাকার অধিবাসীদেরকে আগের মত তাদের ভূমির মালিক হিসেবে বহাল রাখেন। তাদের যিম্মী ঘোষণা করে তাদের উপর জিযিয়া ও খারাজ (কর) ধার্য করেন এবং এ জিযিয়া ও খারাজ সাধারণ মুসলমানদের জনকল্যাণমুখী কাজে ব্যয়ের ঘোষণা দেন। কেননা, মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে তারাই ছিল বিজিত এলাকাসমূহের মালিক।

এ শেষ পদ্ধতিতে দৃশ্যত 'সমষ্টিগত মালিকানা' ধারণার ইংগিত পাওয়া যায়। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা যেভাবে চূড়ান্ত হয়েছিল, তার বিস্তারিত দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ সমষ্টিগত মালিকানার সাথে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দূরতম সম্পর্কও নেই। আসল কথা হলো মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের বিরাট এলাকা বিজিত হওয়ার পর হযরত যুবায়ের (রা) ও হযরত বিলাল (রা) এবং তাঁদের সমমনা ব্যক্তিগণ গোটা এলাকার সমস্ত ভূমি ও বিষয় সম্পত্তি খায়বারের ভূমির মত বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করার জন্য হযরত উমর (রা)-এর নিকট দাবী পেশ করেন। হযরত উমর (রা) তাঁদের এ দাবী মঞ্জুর করেননি। হযরত আলী (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত মু'আয্ বিন জাবাল (রা)-এর মত প্রবীণ সাহাবীগণ এ ব্যাপারে হযরত উমর (রা)কে সমর্থন করেন। এ দাবী মঞ্জুর না করার কারণ উল্লেখিত সাহাবীগণের বক্তব্য হতে বুঝা যায়। হযরত মু'আয্ (রা) বলেন ঃ

"আপনি যদি তা বন্টন করে দেন তাহলে আল্লাহর কসম, তার এমন ফল হবে যা আপনি কখনও পসন্দ করবেন না। বিরাট বিরাট ও মূল্যবান ভূমিখণ্ড সৈনিকদের মধ্যে বন্টিত হয়ে যাবে। এরপর এসব সৈনিকদের মৃত্যুর পর কারো ওয়ারিস হবে কোনো নারী এবং কারো ওয়ারিস হবে কোনো শিশু। পরে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারার ভার গ্রহণ করবে, তাদের দেবার জন্য কিছু তখন রাষ্ট্রের হাতে অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব আপনি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যাতে আজকের লোকদের জন্যও সুযোগ থাকে এবং ভবিষ্যতের লোকদের জন্যও সুযোগ থাকে।"

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

"দেশের কৃষিভূমি তার স্বঅবস্থায় থাকতে দিন যাতে তা সকল মুসলমানের অর্থনৈতিক শক্তির উৎস হতে পারে।"

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ

"এটা কিভাবে হতে পারে যে, আমি তোমাদের মধ্যে জমি ভাগ করে দেবো, আর পরবর্তী বংশধরগণের জন্যে এতে কোনো অংশ থাকবে না।" অবশেষে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য কি থাকবে?......... তোমরা কি চাও, ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য কিছুই না থাকুক? আর আমার আরো আশংকা হচ্ছে যে, আমি যদি তোমাদের মধ্যে তা ভাগ করে দিই, তাহলে তোমরা পানি নিয়ে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হবে।"

এর ভিত্তিতে যে ফায়সালা করা হয়েছিল তা ছিল এই যে, জমি তার সাবেক মালিকদের হাতেই থাকতে দিতে হবে, তাদেরকে যিম্মী ঘোষণা করে তাদের উপর জিযিয়া ও খারাজ (কর) ধার্য করতে হবে এবং এই খারাজ মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণের কাজে খরচ করতে হবে। এ ফায়সালার খবর হযরত উমর (রা) তাঁর ইরাকের গভর্ণর হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর নিকট যে ভাষায় পাঠিয়েছিলেন তা নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

فَانْظُرْ مَا اَجْلَبُوْا بِهٖ عَلَيْكَ فِى الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ اَوْ مَالٍ فَاقْسِمْهُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاتْرُكِ الْاَرْضِيْنَ وَالْاَنْهَارَ لِعُمَّالِهَا لِيَكُوْنَ ذَالِكَ فِى اَعْطِيَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاِنَّا اِنْ قَسَمْنَاهَا بَيْنَ مَنْ حَضَرَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ شَيْئٌ-

"যুদ্ধ চলাকালে গনীমত হিসেবে সৈনিকরা যেসব অস্থাবর সম্পদ জমা করেছে এবং সৈনিকদের মধ্যে জমা হয়েছে, এসব মাল তুমি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে ভাগ করে দাও। কিন্তু নদী নালা, জায়গা জমি যেসব লোকের কাছেই থাকতে দাও— যারা তাতে চাষাবাদ করত। তাহলে তা মুসলমানদের বেতনের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। নতুবা যদি এসবও আমরা বর্তমান লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিই, তাহলে পরবর্তী বংশধরদের জন্য আর কিছুই থাকবে না।"[২]

এ নতুন বন্দোবস্ত দানের বুনিয়াদী মতবাদ তো এই ছিলো যে, ভূমির মালিক হবে সকল মুসলমান এবং সাবেক মালিকদের আসল অবস্থান হবে কৃষক হিসেবে। আর ইসলামী রাষ্ট্র মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের সাথে লেনদেন করবে।[৩] কিন্তু

---

২. গোটা আলোচনার জন্য দেখুন কিতাবুল খারাজ পৃঃ ২০-২১ এবং কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৫৭-৬৩।

৩. এই মতবাদের ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে পাওয়া যায় যে, একবার উতবা বিন ফারকাদ (রা)

বাস্তব ক্ষেত্রে যিম্মী ঘোষণার পর সাবেক মালিকদের যে অধিকার দেয়া হয়েছিল তা মালিকানার অধিকার থেকে কিছুমাত্র ভিন্ন ছিল না। সেসব ভূমি তাদের দখলে থাকবে যা আগে তাদের দখলে ছিল। এদের উপর মুসলমান বা রাষ্ট্রের তরফ থেকে খারাজ (কর) ছাড়া আর কিছু ধার্য করা হয়নি। জমির উপর তাদের বেচা-কেনা, বন্ধক দেয়া এবং ওয়ারিশী স্বত্বের সমস্ত অধিকার আগের মতই বহাল ছিল। এ ব্যাপারটিকে ইমাম আবু ইউসুফ (র) একটি আইনের ধারা আকারে এভাবে বলেছেন ঃ

"যে দেশ রাষ্ট্রপ্রধান অস্ত্রবলে জয় করেন সেই এলাকার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে তা বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারেন। এ অবস্থায় তা 'উশরী' জমি হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি তিনি বন্টন করা সমীচীন মনে না করেন এবং জমি এর পূর্বতন মালিকদের হাতে রেখে দেয়াই ভাল মনে করেন, যেমন হযরত উমর (রা) ইরাকে করেছেন, তাহলে তিনি তা-ও করতে পারেন। এ অবস্থায় তা হবে 'খারাজী' জমি। খারাজ আরোপিত হওয়ার পর তা দখলভোগীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার অধিকার কারো থাকবে না, এর মালিক তারাই হবে। উত্তরাধিকার সূত্রে তারা একে অপরের কাছে হস্তান্তর করতে পারবে, পারবে বেচাকেনা করতে; তাদের উপর খারাজ ধার্য করা হবে এবং তাদের সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা তাদের উপর চাপানো যাবে না।" (কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৩৫, ৩৬)

চতুর্থ প্রকারের ভূমির মালিকানা বিধান

উপরে বর্ণিত তিনটি শ্রেণী তো ছিল সেইসব ভূমি সম্পর্কে যা প্রথম থেকেই বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মালিকানায় ছিল। আলোচনায় দেখা যায় যে, ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব ভূমির সাবেক মালিকানাই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে; আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে এতে কিছুটা রদবদল করা হয়েছে। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, এ রদবদল কেবল মালিকানার ব্যাপারেই করা হয়েছে, মালিকানা ব্যবস্থার মধ্যে কোনো রদবদল করা হয়নি। উক্ত আলোচনার পর এবার আমাদেরকে দেখতে হবে যে, মালিকানাহীন জমির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর খলীফাগণ কি কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন।

হযরত উমার (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে এসে বললেন, আমি ফোরাতের কিনারের এক খন্ড জমি খরিদ করেছি। হযরত উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কার কাছ থেকে? উতবা (রা) বললেন, এর মালিকের কাছ থেকে। উমার (রা) তখন মুহাজির ও আনসারদের দিকে ফিরে বললেন, এর মালিক তো এখানে বসা আছেন। (কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৭৪)। হযরত আলী (রা)-এর একটি কথাও এই মত সমর্থন করে। ইরাকের পুরানো জমিদারদের একজন এসে তাঁর সামনে ইসলাম কবুল করার ঘোষণা দিলে তিনি বললেন, এখন তোমার উপর থেকে জিযিয়া বিলুপ্ত হয়ে গেলো। কিন্তু তোমার জমি খারাজী জমি হিসেবেই থাকবে। কেননা তা আমাদের। (কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৮০)।

দেখা যায় যে, এই শ্রেণীর ভূমি দুটি বড় ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ

এক—'মাওয়াত' অর্থাৎ অনাবাদী ভূমি। 'আদিউল আবাদ' (যে জমির মালিক মরে গেছে) বা যার কোনো মালিকই ছিল না, অথবা যে ভূমি ঝোপ ঝাড়, কাদা মাটির ফাঁক এবং প্লাবনের নীচে পড়ে গেছে তা-ই হচ্ছে মাওয়াত।

দুই—'খালিসা' ভূমি বা খাস জমি। যার উপর সরকারী মালিকানা ঘোষণা করা হয়েছিল। এর মধ্যে কয়েক প্রকার ভূমি শামিল ঃ প্রথমত, যে ভূমির মালিকগণ স্বেচ্ছায় মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ ক'রে তা রাষ্ট্রের অধীন ছেড়ে দিয়েছে যাতে রাষ্ট্র যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যবহার করতে পারে।[৪] দ্বিতীয়ত, ইসলামী রাষ্ট্র যে জমি থেকে মালিককে বেদখল করে খাস জমি ঘোষণা করেছে। যেমন মদীনার চারপাশে বনি নজিরের জমি। তৃতীয়ত, বিজিত এলাকার যে জমি খাস জমি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। যেমন ইরাকে পারস্য সম্রাট ও তার পরিবারের অধিকারভুক্ত ভূমি অথবা যেসব জমির মালিক যুদ্ধে মারা গেছে বা পালিয়ে গেছে; হযরত উমর (রা) এ ধরনের জমিকে 'খালিসা' (খাস জমি) ঘোষণা করেছেন।[৫]

এ দু'শ্রেণীর জমির মালিকানা বিধান সম্পর্কে আমি ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণনা করবো।

চাষাবাদের ভিত্তিতে মালিকানার অধিকার

মাওয়াত-এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রাচীন রীতিই বহাল রাখেন যার ভিত্তিতে দুনিয়ায় জমির মালিকানার সূচনা হয়েছে। মানুষ যখন এ ভূমন্ডলে বসবাস শুরু করে তখন থেকেই এ নিয়ম চলে আসছে যে, যেখানে যে আছে, সে জায়গা তার। আর, কোনো জমি যে ব্যক্তি যে কোনো প্রকারে ব্যবহারের উপযোগী করেছে তা কাজে লাগাবার অধিকার তারই বেশী। প্রকৃতির সকল অবদানের উপর মানুষের মালিকানার অধিকারের এটাই হলো বুনিয়াদী নীতি। রাসূলে করীম (সা) বিভিন্ন সময়ে নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে এ কথারই সমর্থন করেছেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ
فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا۔ قَالَ عُرْوَةُ قَضٰى بِهٖ عُمَرُ فِىْ خِلَافَتِهٖ - (بخارى- احمد- نسائى)

---

৪. ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় আছে--রাসূলে করীম (সা) মদীনায় আগমন করলে আনসারগণ যেসব জমিতে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে পানি পৌঁছানো যেতো না, সেসব জমি রাসূল (সা)-কে দিয়ে দিলেন যেন তিনি যেভাবে খুশী তা ব্যবহার করেন। (কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ২৮২)।

৫. ইমাম আবু ইউসুফ ও আবু উবায়েদ এই শ্রেণীর ভূমি দশ প্রকার বলে নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

"হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি মালিকানাহীন কোনো জমি আবাদযোগ্য করে, সে ব্যক্তিই সে জায়গার হকদার। উরওয়া বিন যুবায়ের বলেছেন, হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে এর উপরই আমল করেছেন।" (বুখারী, আহমাদ, নাসাঈ)।

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهٗ - (احمد، ترمذى، نسائى، ابن حبان)

"জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃত (অনাবাদী) ভূমি জীবিত (আবাদযোগ্য) করেছে, সে জমি তার।" (তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, ইবনে হিব্বান)

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَاطَ حَائِطًا عَلٰى اَرْضٍ فَهِيَ لَهٗ - (ابوداؤد)

"সামুরা বিন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো অনাবাদী ভূমির উপর নিজের সীমারেখা টেনে নেয় সে ভূমি তার।" (আবু দাউদ)।

عَنْ اَسْمَرَبْنِ مُضَرِّسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَبَقَ اِلٰى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ اِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهٗ - (ابوداؤد)

"আসমার বিন মুদাররিস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো কূপ পায় যা এর আগে কোনো মুসলিমের দখলে আসেনি, সে কূপ তার।" (আবু দাউদ)।

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى اَنَّ الْاَرْضَ اَرْضُ اللّٰهِ، وَمَنْ اَحْيٰى مَوَاتًا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا، جَاءَنَا بِهٰذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالصَّلٰوةِ عَنْهُ - (ابوداؤد)

"উরওয়া বিন যুবায়ের (তাবেঈ) বলছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা দিয়েছেন, জমি আল্লাহর, আর বান্দারাও আল্লাহর। যে ব্যক্তি কোনো পতিত জমি আবাদ করে, সে ব্যক্তিই সে জমির হকদার। যেসব প্রবীণ ব্যক্তির মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা এসে পৌঁছেছে, তাদের মাধ্যমেই (অর্থাৎ

সাহাবায়ে কিরাম) রাসূল (সা)-এর নিকট হতে এ নীতি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।" (আবু দাউদ)।

এই প্রাকৃতিক নীতিমালা পুনর্বহাল করার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্য দুটি বিধান নির্দিষ্ট করেছেন। একটি হলো, যে ব্যক্তি অন্যের মালিকানার জমি চাষাবাদ করে, এ চাষাবাদের কারণে সে জমির মালিকানার হকদার বলে দাবী করতে পারবে না। দ্বিতীয় হলো, যে ব্যক্তি অযথা কোনো ভূমির চৌহদ্দি টেনে বা নিশান টাঙ্গিয়ে ভূমিকে নিজের মালিকানায় আটকিয়ে রাখে, এতে কোনো প্রকার চাষাবাদ করে না, তিন বছর পর তার মালিকানার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। প্রথম বিধানকে তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا مَيْتَةً فَهِىَ لَهٗ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ـ (احمد، ابوداؤد، ترمذى)

"হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা) বলেছেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি জীবিত (আবাদযোগ্য) করেছে সে জমি তার। আর অপরের জমিতে নাজায়েয পদ্ধতিতে আবাদকারীর জন্য কোনো কিছু নেই।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ)

দ্বিতীয় বিধানের উৎস হলো নিম্নবর্ণিত হাদীস ঃ

عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادِىُّ الْاَرْضِ لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدُ فَمَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِىَ لَهٗ وَلَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلٰثِ سِنِيْنَ ـ (ابو يوسف، كتاب الخراج)

"তাউস তাবেঈ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ মালিকবিহীন পতিত জমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা), এরপর তা তোমাদের জন্য। অতএব যে কেউ পতিত জমি আবাদযোগ্য করবে, তা তার। তিন বছর পর্যন্ত অনাবাদী ফেলে রাখার পর মালিকের এতে আর কোনো হক থাকে না।" (আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ)।

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِىَ لَهٗ وَلَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلٰثِ سِنِيْنَ وَذٰلِكَ اَنَّ رِجَالًا كَانُوْا يَحْتَجِرُوْنَ مِنَ الْاَرْضِ مَالَا يَعْمَلُوْنَ ـ (ابو يوسف، كتاب الخراج)

"হযরত সালেম বিন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) মিম্বারে উঠে এক ভাষণে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো পতিত অনাবাদী জমিকে চাষাবাদযোগ্য করে সে জমি তার। কিন্তু অনাহূতভাবে যারা জমি আটকে রাখে, তিন বছর পর এতে তার কোনো অধিকার থাকবে না। সে সময় কেউ কেউ কোনো চাষাবাদ না করে এমনিতেই জমি আটকিয়ে রাখতো; এ কারণে এ ঘোষণা দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।" (আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ)

এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। মতভেদ যদি থাকে তবে আছে এ ব্যাপারে যে, আবাদযোগ্য করার দ্বারাই কি কোনো ব্যক্তি পতিত জমির মালিক হয়ে যায়? অথবা মালিকানা প্রমাণের জন্য সরকার থেকে অনুমতি প্রয়োজন? এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (র) রাষ্ট্রের অনুমতি প্রয়োজন মনে করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মাদ (র), ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র) প্রমুখের মত হলো যে, এ সম্পর্কে হাদীস একেবারেই সুস্পষ্ট। তাই আবাদকারীর মালিকানার অধিকারের জন্য রাষ্ট্রের নিকট হতে অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া হক অনুযায়ী আবাদকারী এ জমির মালিক হয়ে যাবে। এরপর ব্যাপারটা যখন রাষ্ট্রের নিকট পেশ হবে তখন এর কাজ হবে আবাদকারীর হককে মেনে নেয়া। আর যদি এ নিয়ে কলহ বাধে তাহলে রাষ্ট্র তার হকই বলবৎ রাখবে। ইমাম মালিক (র) জনবসতির নিকটবর্তী জমি ও দূরবর্তী অনাবাদী জমির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে প্রথম প্রকারের জমি এ নির্দেশের আওতাধীন নয়। আর দ্বিতীয় প্রকারের জমির জন্য সরকারের অনুমোদন শর্ত নয়। শুধু আবাদ করার মাধ্যমেই আবাদকারী এর মালিক হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে হযরত উমর (রা) ও হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর কর্মনীতি এই ছিল ঃ "যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জমি পরিত্যক্ত মনে করে আবাদ করে নেয় এবং এর পর কেউ এসে এর মালিকানা দাবী করে বসে, তবে শেষোক্ত ব্যক্তিকে এখতিয়ার দেয়া হবে যে, হয় সে আবাদ করার জন্য প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিয়ে জমি নিজে নিয়ে নেবে, অথবা জমির মূল্য নিয়ে মালিকানার অধিকার প্রথম ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করবে।[৬]

---

৬. বিস্তারিত অবগত হবার জন্য ইমাম আবু ইউসুফের 'কিতাবুল খারাজ' পৃঃ ৩৬ ও ৩৭ এবং আবু উবায়েদের 'কিতাবুল আমওয়াল' পৃঃ ২৮৫-২৮৯ দেখুন। কানযুল উম্মালে শায়খ আলী মোত্তাকী এ বিষয়ের উপর বর্ণিত সব হাদীস এক স্থানে জমা করেছেন। যারা এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা অবগত হতে চান, উল্লিখিত কিতাবের ২য় খন্ড এহইয়ায়ে মাওয়াত অধ্যায় দেখে নিন।

সরকার কর্তৃক দানকৃত জমি

অতপর 'মাওয়াত' (পতিত) ও 'খালিসা' (খাস) উভয় প্রকারের ভূমি থেকে প্রচুর পরিমাণ জমি রাসূলে করীম (সা) নিজে মানুষকে দান করেছেন এবং তাঁর পর খোলাফায়ে রাশেদীনও হামেশা এ ধরনের দান করতেন। এসব দানের অনেক দৃষ্টান্ত হাদীসের গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

(১) উরওয়াহ বিন যুবায়ের (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ও হযরত উমর (রা)-কে কিছু জমি দান করেছিলেন। হযরত উসমান (রা)-এর সময়ে হযরত যুবায়ের (রা) উমারের ওয়ারিসগণ থেকে তাদের অংশের জমি খরিদ করে নিয়েছিলেন। আর এ খরিদকে মজবুত করার জন্য হযরত উসমান (রা)-এর নিকট তিনি হাজির হলেন এবং বললেন, হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, রাসূলে করীম (সা) এ জমিগুলো আমাকে ও হযরত উমর (রা) বিন খাত্তাবকে দান করেছিলেন। অতঃপর আমি উমর (রা)-এর বংশধরদের নিকট হতে তাঁর অংশ খরিদ করে নিয়েছি। একথা শুনে হযরত উসমান (রা) বললেন, 'আবদুর রহমান সত্য সাক্ষ্য দেবার মতো লোক। সে সাক্ষ্য তার পক্ষে হোক অথবা বিপক্ষে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)।

(২) আলকামা বিন ওয়ায়েল তাঁর পিতা হযরত ওয়ায়েল বিন হুজার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে হাদরামাউতে এক খন্ড জমি দান করেছিলেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

(৩) হযরত আবু বকর (রা)-এর কন্যা হযরত আসমা (রা) বলেছেন, রাসূলে করীম (সা) তাঁর স্বামী যুবায়েরকে খায়বারে এক খন্ড জমি দান করেছিলেন। এতে খেজুর গাছসহ অন্যান্য গাছপালাও ছিল। তাছাড়া উরওয়া বিন যুবায়ের বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) তাকে বনী নযীবের জমি থেকে এক খন্ড খেজুর বাগান দান করেছিলেন। আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, জমির একটি বড় খন্ড রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যুবায়েরকে দান করেছিলেন। এ দান ছিল এত বড় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন, 'ঘোড়া দৌড়াতে থাক। যেখানে গিয়ে তোমার ঘোড়া থেমে যাবে ততদূর পর্যন্ত সব জমি তোমাকে দিয়ে দেয়া হবে। তাই তিনি ঘোড়া দৌড়ালেন। এক জায়গায় গিয়ে ঘোড়া থামলে তিনি তার হাতের চাবুক সামনে নিক্ষেপ করলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, বেশ, চাবুক যেখানে গিয়ে পড়েছে সেখান পর্যন্ত ভূমি তাকে দিয়ে দেয়া হোক' (বুখারী, আহমদ, আবু দাউদ, আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ, আবু উবায়েদের কিতাবুল আমওয়াল)।

(৪) হযরর উমর বিন দীনার বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমনের পর হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) উভয়কে ভূমি দান করেছিলেন। (কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ)।

(৫) হযরত আবু রাফে' (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) তাঁর খান্দানের লোকজনকে একটি জমি দান করেছিলেন, কিন্তু তারা তা আবাদযোগ্য করতে পারেননি। হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে সে জমি আট হাজার দীনার মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। (কিতাবুল খারাজ)।

(৬) ইবনে সিরীন হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) আনসার সম্প্রদায়ের এক জয়তুন ব্যবসায়ীকে এক খন্ড জমি দান করেছিলেন। ভূমি খন্ডটির দেখাশুনার জন্য তিনি প্রায়ই বাইরে যেতেন। ফিরে এসে শুনতে পেতেন যে, তিনি বাইরে যাবার পর মহানবী (সা)-এর উপর এতটুকু এতটুকু কুরআন নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই এই হুকুম জারি করেছেন, এতে তাঁর মনে দুঃখ হতো। অবশেষে একদিন তিনি রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, এ জমি আমার আর আপনার মধ্যে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই জমিটি আপনি আমার কাছ থেকে নিয়ে নিন। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে জমি ফেরত নেয়া হলো। এর পর হযরত যুবায়ের (রা) জমিটির জন্য আবেদন করলে রাসূল (সা) তা তাঁকে দিয়ে দিলেন। (কিতাবুল আমওয়াল)

(৭) হযরত বিলাল বিন হারেস মুযানী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে আকীকের সমস্ত জমি দান করে দিয়েছিলেন। (কিতাবুল আমওয়াল)

(৮) হযরত আদী বিন হাতিম (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফোরাত বিন হাইয়ান আজ্লীকে ইয়ামামার এক খন্ড জমি দান করেছিলেন। (কিতাবুল আমওয়াল)

(৯) আরবের বিখ্যাত চিকিৎসক হারিস বিন কালদাহর ছেলে নাফে' হযরত উমর (রা)-এর নিকট বসরা এলাকার এমন একটি জমির জন্য আবেদন জানালেন যা খারাজমুক্ত ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল না, আবার মুসলমানদের কোনো স্বার্থের সাথেও সম্পৃক্ত ছিল না। তিনি বললেন, আমি এ ভূমিতে ঘোড়ার জন্য ঘাসের চাষাবাদ করবো। হযরত উমর (রা) বসরার গভর্ণর আবু মূসা (রা)-এর নিকট ফরমান লিখে জানালেন, যদি নাফে'র বর্ণনা ঠিক হয় তাহলে জমিটি তাকে দিয়ে দেয়া হোক। (কিতাবুল আমওয়াল)

(১০) মূসা বিন তালহা (র) বলেছেন, হযরত উসমান (রা) তাঁর খিলাফতকালে যুবায়ের (রা) বিন আওয়াম, সাআদ (রা), ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা), উসামা (রা) বিন যায়েদ (রা), খাব্বাব বিন আরাত (রা), আম্মার (রা) বিন ইয়াসির এবং সা'দ বিন মালিককে জমি দান করেছিলেন। (কিতাবুল খারাজ, কিতাবুল আমওয়াল)

(১১) আবদুল্লাহ বিন হাসান (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা) আবেদন জানালে হযরত উমর (রা) তাঁকে 'ইয়াম্বু'র এলাকা দান করেছিলেন। (কানযুল উম্মাল)।

(১২) ইমাম আবু ইউসুফ (র) বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন, পারস্যের শাসক কিসরা ও তার বংশধরগণের যেসব জমি অনাবাদী পতিত ছিল অথবা

যে জমির মালিক পালিয়ে গিয়েছিল অথবা নিহত হয়েছিল অথবা যেসব জমি কাদামাটি, প্লাবন বা ঝোপ ঝাড়ের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল সেসব জমিকে 'খালিসা' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। যাকে তিনি জমি দান করতেন এসব জমি হতেই দান করতেন। (কিতাবুল খারাজ)

ভূমি দান করার শরয়ী বিধান

ভূমি প্রদানের এ রীতি শুধু রাজকীয় এনাম ও বখশিশ ধরনেরই ছিল না বরং এর কিছু নীতিমালাও ছিল যা আমরা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে পাই। এ নীতিমালাগুলো হচ্ছে ঃ

১। কোনো ব্যক্তি ভূমি লাভ করে তা কোনো কাজে না লাগালে এই দান বাতিল গণ্য হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইমাম আবু ইউসুফ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 'মুযাইনা' ও 'জুহাইনা' বংশের লোকজনদেরকে কিছু জমি দান করেন। কিন্তু তারা সে জমিকে বেকার ফেলে রেখেছিল। অতঃপর অন্যকিছু লোক এসে সে জমি আবাদ করে। 'মুজাইনা' ও 'জুহাইনার' লোকেরা উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তাঁর নিকট দাবী নিয়ে এলো। হযরত উমর (রা) বললেন, "এ জমি যদি আমার অথবা আবু বকর (রা)-এর দান হতো তাহলে আমি এ দান বাতিল করে দিতাম। কিন্তু এ দান তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর। অতএব আমি অপরাগ। অবশ্য পদ্ধতি হলো এই ঃ

مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلٰثَ سِنِيْنَ فَلَمْ يُعَمِّرْهَا فَعَمَّرَهَا قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَهُمْ اَحَقُّ بِهَا -

"যার কোনো ভূমি থাকবে। আর তিন বছর পর্যন্ত সে তা অনাবাদী ফেলে রাখবে। এরপর যদি কেউ তা আবাদ করে নেয় তাহলে সে-ই এ ভূমির হকদার।"

২। যে দান সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় না সেই দানের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। নজীর হিসেবে আবু উবায়েদ তাঁর কিতাবুল আমওয়ালে এবং ইয়াহ্ইয়া বিন আদাদ তাঁর খারাজ গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিলাল বিন হারিস মুযানীকে গোটা আকীক উপত্যকা দান করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার একটা বড় অংশ আবাদ করতে পারেননি। এ অবস্থা দেখে হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ জমি তোমাকে এজন্য দান করেননি যে, তুমি নিজেও তা ব্যবহার করবে না, আর অন্যদেরকেও তা ব্যবহার করতে দিবে না। এখন তুমি শুধু এতটুকু জমি রাখ যতটুকু ব্যবহার করতে পারবে। বাকী জমি আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। আমি এগুলোকে মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দেই। বিলাল বিন হারিস (রা) তাতে অসম্মত হলেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে আবার বললেন। অবশেষে যতটুকু জমি তাঁর চাষের আওতায় ছিল ততটুকু রেখে বাকী জমি তাঁর থেকে ফেরত নিয়ে

অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

৩। রাষ্ট্র শুধু 'মাওয়াত' (পতিত) এবং 'খালিসা' (খাস) জমি থেকেই দান করতে পারে। অন্যথায় এক ব্যক্তির ভূমি ছিনিয়ে নিয়ে অপর ব্যক্তিতে দান করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই অথবা মূল মালিকদের মাথার উপর অনাহুত আর এক ব্যক্তিকে জায়গীরদার বা জমিদার হিসেবে বসিয়ে দিয়ে এবং তাকে মালিকানা অধিকার দান করে তার অধীনে মূল মালিকদেরকে চাষাবাদকারী হিসেবে গণ্য করার অধিকারও সরকারের নেই।

৪। রাষ্ট্র শুধু তাদেরই জমি দান করতে পারে যারা সত্যিকার অর্থে জনসাধারণের সামষ্টিক কল্যাণের জন্য কোনো উল্লেখ্যযোগ্য খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকে। অথবা যার সাথে এ ধরনের কোনো সেবামূলক কাজ সংশ্লিষ্ট রয়েছে অথবা যাকে দান করা কোনো না কোনোভাবে জনস্বার্থের জন্য সমীচীন মনে করা হবে। এখন রইলো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যে ওইসব রাজকীয় দান যা খোশামোদ প্রিয় ও তোষামোদকারীদেরকে দেয়া হয়, অথবা ওইসব দান যা অত্যাচারী ও উৎপীড়করা জনস্বার্থ বিরোধী কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য দান করে থাকে। এসব দান কোনো অবস্থাতেই বৈধ দানের পর্যায়ে আসতে পারে না

জমিদারীর শরয়ী নীতি

শেষোক্ত দুটি মূল নীতির ভিত্তি হলো রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর খেলাফতে রাশেদা কর্তৃক অনুসৃত কর্মপদ্ধতি। ইমাম আবু ইউসুফ (র) তাঁর কিতাবুল খারাজে বিষয়টি এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

"ন্যায় পরায়ণ শাসকের অধিকার আছে, যে সম্পদের কোনো মালিক নেই এবং যার কোনো উত্তরাধিকারও নেই, এমন সম্পদ তিনি এমন লোককে দান বা উপঢৌকন হিসেবে দিতে পারেন, ইসলামের খেদমতে যার অবদান আছে। সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রশাসন যে ব্যক্তিকে কোনো ভূখণ্ড দান করবেন তা ফেরত নেবার অধিকার কারো নেই। কিন্তু কোনো ভূমি কোনো শাসক কারো থেকে ছিনিয়ে এনে অন্যকে দান করলে তা হবে এক জনের জিনিস আত্মসাৎ করে অন্যকে দান করার শামিল।"

এরপর তিনি আবার লিখেছেন ঃ

"অতএব শাসক যে ধরনের ভূমি দান করতে পারেন বলে আমি উল্লেখ করেছি, তার থেকে যে ভূমিই ইরাক, আরব, আল জিবাল ও অন্যান্য এলাকায় ন্যায়পরায়ণ ও সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসক কাউকে দান করে থাকেন, পরবর্তী খলীফাগণের পক্ষে তাদের থেকে সে জমি ফিরিয়ে আনা অথবা তাদের দখল থেকে তা বের করে আনা, যে ভূমি এতদিন তাদের দখলে ছিল, হালাল নয়; চাই তারা এ সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হোক অথবা ওয়ারিস থেকে কিনে থাকুক।"

অবশেষে অধ্যায়টি সমাপ্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"অতএব এসব দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও জমি দান করেছেন এবং তাঁর পরে খলীফাগণও দান করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যাকেই জমি দান করেছেন, তার মধ্যে কল্যাণ নিহিত ছিল দেখেই দান করেছেন। যেমন কোনো নওমুসলিমের মন জয় করা অথবা জমি আবাদযোগ্য করা। এভাবে খোলাফতে রাশেদাও যাকে জমি দান করেছেন, ইসলামে তার কোনো না কোনো উত্তম খেদমত দেখে অথবা ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলায় তা কোনো কাজে আসবে মনে করেই করেছেন অথবা এতে কল্যাণ নিহিত আছে বলে করেছেন।" (কিতাবুল খারাজ ৩২-৩৫ পৃঃ)

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়গীরদারীর মূল অবস্থান কি? একজন শাসক কি পরিমাণ জায়গীর দিতে পারেন ও বিলোপ করতে পারেন? আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদের এসব প্রশ্নের উত্তর প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবু ইউসুফ দিয়েছেন। ইমাম সাহেবের এ জবাবের সারমর্ম হলো—রাষ্ট্রের তরফ থেকে ভূমি দান করা তো স্বস্থানে একটি বৈধ কাজ। কিন্তু সকল ভূমি দানকারী এক রকম নয়, আবার সকল ভূমি গ্রহণকারীও এক সমান নয়। এক রকম দান ন্যায় পরায়ণ, দীনদার, সত্যপথের পথিক ও আল্লাহভীরু শাসকগণ করে থাকেন। তারা ইনসাফের দৃষ্টিতে দীন ও মিল্লাতের সঠিক খাদেমদেরকে দান করেন। অথবা অন্তত এমন লোকদেরকে দান করেন যারা হিতাকাংখী ও কল্যাণকামী। এমন উদ্দেশ্যে দান করেন যার ফলাফল সামষ্টিকভাবে দেশ ও জাতিই ভোগ করে থাকে। আর তারা এমন সম্পদ থেকে দান করে থাকেন যার থেকে দান করা তাঁর জন্য বৈধ। দ্বিতীয় প্রকার দান হলো—যা অত্যাচারী, স্বৈরাচারী ও স্বার্থপূজারী শাসকগণ অসৎ উদ্দেশ্যে অসৎ লোকদের দান করে থাকে। তারা অন্ধভাবে এমন সম্পদ থেকে দান করে যা দেয়ার অধিকার তাদের নেই। এ দুটি দুই বিপরীত ধরনের দান। আর এ দুই প্রকার দানের হুকুম একরকম নয়। প্রথম দান বৈধ। এ দানকে বহাল রাখাই ইনসাফের দাবী। আর দ্বিতীয় প্রকারের দান অবৈধ এবং ইনসাফের দাবী হলো তা বাতিল করা। যে ব্যক্তি এই উভয় দানকে একই পাল্লায় ওজন করে সে বড়ই যালেম।

মালিকানা অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

এসব সাক্ষ্য ও নজির সেই গোটা সময়ের কার্যক্রমের নমুনা পেশ করে যখন কুরআনের মূল উদ্দেশ্য স্বয়ং কুরআন বাহক মহানবী (সা) এবং তাঁর সরাসরি ছাত্রগণ নিজেদের কথা ও কাজে প্রতিফলিত করেছিলেন। এই নমুনা অবলোকন করার পর কারো পক্ষে এই সন্দেহ প্রকাশ করার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না যে, ভূমিকে ব্যক্তিমালিকানা হতে বের করে সামষ্টিক মালিকানায় নিয়ে আসাই ছিল ইসলামের মূলনীতি, বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীত এই নমুনা থেকে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জমি থেকে লাভবান হওয়ার স্বাভাবিক ও সঠিক পন্থা কেবল এই

যে, তা জনগণের ব্যক্তিমালিকানায় থাকবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) অধিকাংশ সময়ে শুধু সাবেক মালিকানাকেই বহাল রাখেননি বরং যেসব অবস্থায় তিনি সাবেক মালিকানা বাতিল ঘোষণা করেছেন সেখানেও আবার নতুনভাবে ব্যক্তিমালিকানা সৃষ্টি করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য মালিকানাহীন ভূমির উপরে নতুন মালিকানা প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দিয়েছেন এবং সরকারী মালিকানাধীন ভূমি জনগণের মধ্যে বন্টন করে তাদেরকে মালিকানার অধিকার দান করেছেন। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাবেক মালিকানা ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র একটি অনুপেক্ষণীয় নিকৃষ্ট পন্থা হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়নি, বরং একটি সঠিক নীতি হিসেবেই এ ব্যবস্থাকে বহাল রাখা হয়েছে এবং ভবিষ্যতের জন্যও এ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) মালিকানা অধিকারের মর্যাদা সম্পর্কে যেসব হুকুম দিয়েছেন সেগুলো এ কথার অতিরিক্ত প্রমাণ। বিভিন্ন বরাতে ইমাম মুসলিম (র) এই রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমর (রা)-এর ভগ্নিপতি সাঈদ বিন যায়েদ (রা)-এর বিরুদ্ধে এক মহিলা মারওয়ান বিন হাকামের সময়ে দাবী উত্থাপন করেছেন যে, তিনি তার জমির একটি অংশ জবরদখল করে নিয়েছেন। জবাবে সাঈদ (রা) মারওয়ানের আদালতে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা এই যে, "আমি তার জমি কিভাবে ছিনিয়ে নিতে পারি! যেখানে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুবারক জবানে বলতে শুনেছি ঃ

مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ اِلَى سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও দখল করে নেবে (কিয়ামতের দিন) সাত তবক জমি হার বানিয়ে তার ঘাড়ে লটকিয়ে দেয়া হবে।"

ইমাম মুসলিম (র) হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও আয়েশা (রা)-এর সূত্রেও এই একই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন—(মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল মুজারাআ, বাবু তাহরীমিয যুলমি ওয়া গাসাবিল আরদি)। ইমাম আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী বিভিন্ন সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, "কোন অধিকার ছাড়া (মালিকের অনুমতি না নিয়ে) অন্যের জমি চাষাবাদকারীর কোনো প্রাপ্য নেই।"

রাফে' বিন খাদীজ (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ

مَنْ زَرَعَ فِىْ اَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهٗ مِنَ الزَّرْعِ شَيْئٌ وَلَهٗ نَفَقَتُهٗ -

"কোন ব্যক্তি অন্যের জমি তার অনুমতি ছাড়া চাষাবাদ কররেল ঐ ক্ষেতের ফসলের উপর তার কোনো অধিকার থাকতে পারে না অবশ্য তার (চাষাবাদের) খরচ তাকে দিয়ে দিতে হবে।"

(ইবনু মাজাহ, তিরমিযী)

উরওয়া বিন যুবায়ের (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই মর্মে একটি মোকদ্দমা দায়ের করা হলো যে, এক ব্যক্তি এক আনসারীর জমিতে খেজুর গাছ লাগিয়েছে। এ মোকদ্দমার রায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) ফায়সালা দিলেন—এসব খেজুর গাছ উপড়িয়ে ফেলে দেয়া হবে এবং জমি মূল মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হবে। (আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এসব নির্দেশ কিসের সাক্ষ্য দেয়? এ কথার অর্থ কি এই যে, ভূমির ব্যক্তি মালিকানা কোনো ক্ষতিকর জিনিস ছিল যার মূলোৎপাটন করাই ছিল ইসলামের উদ্দেশ্য? আর, অনুপেক্ষণীয় মনে করে বাধ্য হয়ে ব্যক্তিমালিকানাকে সহ্য করা হয়েছে? অথবা তা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, এটা ছিল সম্পূর্ণ একটি বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত অধিকার যার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে?

৩. ইসলামী ব্যবস্থা এবং একক মালিকানা

ব্যাপারটি এখন ভিন্ন দিক থেকেও দেখা দরকার। ইসলামের বিধানসমূহ পরস্পর বিপরীত বা সংঘর্ষশীল নয়। ইসলামের হেদায়াত ও আইন-কানুনের প্রতিটি জিনিস এর সার্বিক ব্যবস্থার সাথে এমন সুসামঞ্জস্যশীল যে, এক বিভাগের আইন অন্যান্য বিভাগের আইন কানুনের সাথে খাপ খেয়ে যায়। এটা হলো এমন এক সৌন্দর্য—যাকে আল্লাহ তায়ালা, এ দীন যে তাঁরই তরফ থেকে আসা, তার একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ সাব্যস্ত করেছেন। আমরা যদি মেনে নেই যে, শরীয়াতে ভাগচাষ নাজায়েয, এবং শরীয়াত প্রণয়নকারী জমির মালিকানাকে নিজে চাষাবাদ করা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে চান এবং নিজের কাছে বিদ্যমান চাষাবাদের অতিরিক্ত জমি হয় কাউকে বিনামূল্যে দিয়ে দিবে অথবা বেকার ফেলে রাখবে, তবে সামান্য চিন্তা করলেই একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ হুকুম ইসলামের অন্যান্য মূলনীতি ও আইন কানুনের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় এবং একে ইসলামী ব্যবস্থায় ঠিকভাবে স্থাপনের জন্য ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত এবং অনেক ক্ষেত্রে সংশোধন আনয়ন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈপরীত্যের কিছু স্পষ্ট নমুনা দেখুন ঃ

(১) ইসলামী ব্যবস্থায় মালিকানার অধিকার শুধুমাত্র শক্তিমান পুরুষ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, নারী, শিশু, রুগ্ন এবং বৃদ্ধরাও এ অধিকার প্রাপ্ত হয়। ভাগচাষ যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহলে তাদের সকলের জন্য কৃষি মালিকানা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে।

(২) ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের আলোকে একজন মানুষের মৃত্যুর পর যেভাবে তার সম্পদ অনেক লোকের মধ্যে বন্টিত হয়, ঠিক সেভাবে কোনো কোনো সময় অনেক মৃত ব্যক্তির সম্পদও এক ব্যক্তির নিকট জমা হয়ে যেতে পারে। এখন এটা কত আশ্চর্যের কথা যে, ইসলামের উত্তরাধিকার আইন তো এক ব্যক্তিকে শত সহস্র একর জমির মালিক বানিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিমালিকানা যদি নিজে চাষাবাদ করা পর্যন্ত সীমিত হয় তাহলে এ আইন শত সহস্র একর জমির মালিকের জন্য এই নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ছাড়া বাকী সব জমির মালিকানা হতে লাভবান হওয়াকে হারাম করে দেয়।

(৩) ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী আইন যে কোনো ধরনের বৈধ জিনিসের ক্ষেত্রে মানুষের উপর এরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করেনি যে, সে সর্বাধিক একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই তা খরিদ করতে পারবে এবং এই সীমার বেশী খরিদ করার অধিকার তার নেই। বেচা-কেনার এই সীমাহীন অধিকার যেমন সকল বৈধ জিনিসের ব্যাপারে আছে—তেমনি জমির ব্যাপারেও সে অধিকার মানুষের রয়েছে। কিন্তু একথা অত্যন্ত

বিস্ময়কর মনে হয় যে, দেওয়ানী আইন অনুযায়ী এক ব্যক্তি তো তার ইচ্ছামত যে কোনো পরিমাণ জমি ক্রয় করতে পারবে, কিন্তু কৃষি আইনানুযায়ী সে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী ভূমির মালিকানার ফল ভোগ করার অধিকার পাবে না।

(৪) ইসলাম কোনো প্রকার মালিকানার উপরই পরিমাপ ও পরিমাণগত দিক থেকে কোনো সীমা নির্ধারণ করেনি। বৈধ উপায়ে বৈধ জিনিসের মালিকানার ক্ষেত্রে যখন এর সাথে সংশ্লিষ্ট শরয়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালিত হতে থাকে তখন তা অধিক পরিমাণে রাখা যায়। টাকা-পয়সা, জীব-জন্তু, ব্যহারের জিনিসপত্র, বাড়ীঘর, যানবাহন, মোটকথা কোনো জিনিসের ব্যাপারেই আইনত মালিকানার পরিমাণের উপর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। তাহলে শেষ পর্যন্ত শুধু কৃষি সম্পদের এমন কী বিশেষত্ব রয়েছে যার কারণে এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে শরীয়তের মনোভাব হবে ব্যক্তিমালিকানাকে পরিমাণের দিক থেকে সীমিত করা, অথবা লাভবান হওয়ার সুযোগ সুবিধা ছিনিয়ে নিয়ে একটি বিশেষ সীমার অধিক মালিকানাকে ব্যক্তির জন্য অকেজো করে দেয়া।[৭]

(৫) জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইসলাম দয়ামায়া ও দানশীলতাকে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় হক আদায় করার পর আর কোনো ব্যাপারেই আমরা দেখি না যে, ইসলাম ইহসান ও দানশীলতাকে মানুষের উপর অবশ্যকরণীয় করেছে। উদহারণস্বরূপ যে ব্যক্তি যাকাত পরিশোধ করে তাকে ইসলাম তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা পয়সা গরীব দুঃখীদের দান করার জন্য উৎসাহিত করে; কিন্তু এ দান খয়রাতকে তার উপর ফরয করে না এবং এ কথাও বলে না যে, অভাবীদের ঋণ হিসেবে অথবা মুজারাবাতের ভিত্তিতে টাকা পয়সা দিয়ে তার ব্যবসায়ে শরীক হওয়া হারাম, বরং দান শুধু দানের আকারেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত 'বাড়ী' থাকলে অথবা এমন একটি বড় বাড়ী যদি থাকে যাতে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা আছে তাহলে এ ধরনের অতিরিক্ত বাড়ী ও বাড়ীর অতিরিক্ত জায়গা, যাদের বাড়ীঘর নেই তাদেরকে নিস্বার্থভাবে ব্যবহার করতে দেয়াকে ইসলাম খুবই উৎসাহিত করে। কিন্তু অনিবার্যভাবেই তা বিনামূল্যে দিয়ে দিতে হবে এবং বাড়ীভাড়া দেয়া হারাম এমন কথা ইসলাম বলেনি। তদ্রূপ অতিরিক্ত কাপড় চোপড়, থালা বাসন, যানবাহন ইত্যাদির ব্যাপারেও এই একই কথা। এসব জিনিস ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দানশীলতার মনোভাব নিয়ে নিস্বার্থভাবে দিয়ে দেয়াকে অবশ্যই পছন্দ করা হয়েছে,

---

৭. এখানে ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, ইসলামের মৌলিক বিধান তো তাই যা আমি উপরে বর্ণনা করেছি। অবশ্য কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি জমির সর্বোচ্চ মালিকানার সীমা নির্ধারণের প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহলে সেই অবস্থা বিরাজমান থাকা পর্যন্ত সাময়িকভাবে তা করা যেতে পারে। কিন্তু এ ধরনের কোন সিদ্ধান্তের কারণে ইসলামের মৌল বিধানে কোন স্থায়ী পরিবর্তন হতে পারে না। সামনে অগ্রসর হয়ে এ বিষয়ের উপর আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো।

কিন্তু তা ফরয করে দেয়া এবং বিক্রি করা ও ভাড়ায় দেয়া হারাম করা হয়নি। এখন কৃষিজাত জমির ব্যাপারে এমন কী ঘটলো যার কারণে এ ব্যাপারে ইসলাম এর এই সাধারণ মৌল নীতিকে পরিহার করে এর উৎপাদনের উপর যাকাত আদায় করার পরও তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি অবশ্যম্ভাবী রূপে অপরকে বিনামূল্যে দিয়ে দিতে বাধ্য করবে এবং অংশীদারী অথবা মুজারাবাতের নীতিমালা অনুযায়ী কোনো কারবার অবশ্যই করতে পারবে না?

(৬) ইসলামী আইন ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প কারখানা ও অর্থনৈতিক কারবারের প্রতিটি বিভাগে মানুষকে অবাধ অনুমতি দিয়েছে যে, সে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের নীতি অনুযায়ী অপরের সাথে কাজ কারবার করতে পারবে। এক ব্যক্তি অন্যকে নিজের টাকা পয়সা দিয়ে ঠিক করে নিতে পারে যে, সে এই টাকা দিয়ে কারবার করবে; যদি লাভ হয়, তাহলে এর অর্ধেক অথবা এক-চতুর্থাংশের মালিক অর্থ সরবরাহকারী হবে। এক ব্যক্তি কাউকে নিজের পুঁজি কোনো দালানকোঠা রূপে, কিংবা কোনো মেশিন কি ইঞ্জিন হিসেবে, কোনো মোটর অথবা নৌকা বা জাহাজরূপে দিতে পারে এবং বলতে পারে যে, তুমি এগুলো কাজে লাগাও। এতে যা লাভ হবে তার এত অংশ আমাকে দিবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি নিজের পুঁজি জমির আকারে অন্যকে দিয়ে কোনো সংগত কারণে এ কথা বলতে পারবে না যে, এতে যে ফসল উৎপন্ন হবে তার এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক অংশের মালিক আমি হবো।

৪. কৃষি জমির সীমা নির্ধারণ

প্রশ্ন ঃ জনৈক স্থানীয় আলিম দুটি প্রশ্ন করেছেন। মেহেরবানী করে প্রশ্ন দুটির জবাব দেবেন।

(১) কৃষি সংস্কার প্রসংগে জায়গীর ফেরত নেবার ব্যাপারে নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত নেবার পক্ষে দলীল পেশ করুন। বিশেষ করে, যেখানে হযরত যুবায়ের রাযিআল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ (সা) চাবুক নিক্ষেপের মাধ্যমে নির্দেশিত সমগ্র এলাকার জমি দিয়েছিলেন।

(২) কৃষকদের উচ্ছেদের ব্যাপারে তো একথা সুস্পষ্ট যে, ফসল ফলার আগে তাদেরকে বেদখল করা যাবে না। কিন্তু এছাড়া তাদেরকে জমি থেকে বেদখল করার কোনো কারণ দেখি না। যদি অন্য কোনো পথ থাকে তাহলে দলীল সহকারে পেশ করবেন।

আর একজন প্রশ্ন করেছেন, কুরআন পড়ে জানা যায়, দুনিয়ার সৃষ্ট বস্তুগুলো থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির উপকৃত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে সাধারণের উপকারার্থে জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে সোপর্দ করে দিলে তা কুরআনের উদ্দেশ্যের যথার্থ বাস্তবায়ন বলে মনে হয়।

জবাব ঃ প্রথম প্রশ্নটির ব্যাপারে নীতিগতভাবে একথা জেনে রাখা উচিত যে, এক ব্যক্তি জমি কিনে বা উত্তরাধিকার সূত্রে জমির মালিকানা লাভ করে যেভাবে জমির ওপর মালিকানাস্বত্ব কায়েম করে, সরকার প্রদত্ত জায়গীরের ওপর জায়গীরদারের মালিকানাস্বত্ব ঠিক তেমনভাবে কায়েম হয়ে যায় না। জায়গীরের ব্যাপারে সরকার সব সময় পুনর্বিবেচনা করার অধিকার রাখে। কোনো দান অসংগত বিবেচিত হলেই সরকার তা বাতিল করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারী পদক্ষেপ সংশোধনের উর্ধে নয়।

হাদীস ও আছার গ্রন্থগুলো এর কয়েকটি নজির পাওয়া যায়। আবইয়ায ইবনে হাম্মাল মাযনীকে (রা) নবী (সা) মারিব এলাকায় এমন একটি জমি দিয়েছিলেন যেখানে থেকে লবণ বের হতো। পরে লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহকে সেখানে একটি বিরাট লবণের খনির অস্তিত্বের সন্ধান দিলো, তখন তিনি এ ধরনের জমি ব্যক্তিমালিকানায় দেয়া সামাজিক স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনা করে পূর্বের আদেশ বাতিল করে দেন। এ থেকে কেবল একথাই জানা যায় না যে, সরকারী দান সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে, বরং এই সংগে একথাও জানা যায় যে, কাউকে সংগত সীমার বেশী দেয়া

সামষ্টিক স্বার্থ বিরোধী, আর এই পর্যায়ে কাউকে কিছু দান করা হয়ে থাকলে তা পুনর্বিবেচনা করা যোতে পারে। আর একটি রিওয়ায়েত থেকেও একই কথা জানা যায়। তাতে বলা হয়েছে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) হযরত তালহা (রা)-কে একটি জমি দান করার ফরমান লিখে দেন। কিন্তু এই ফরমানে তিনি কয়েকজন সাহাবার সাক্ষ্য নিতে বলেন। তাদের মধ্যে হযরত উমর (রা) এর নামও ছিল। হযরত তালহা (রা) হযরত উমরের (রা) কাছে গেলে তিনি এই ফরমানে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন ঃ

اَهٰذَا كُلُّهٗ لَكَ دُوْنَ النَّاسِ -

এতগুলো জমি একা তোমাকে দেয়া হবে অন্য সবাইকে বঞ্চিত করে? (দেখুন কিতাবুল আমওয়াল লি আবী উবাইদ, পৃঃ ২৭৫-৭৬)

হযরত যুবায়ের (রা) প্রসংগে বলা যায়, যে সময় নবী করীম (সা) তাকে জমি দেন, তখন বিপুল পরিমাণ জমি অনাবাদী পড়ে ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে তখন এই জমিগুলো আবাদ করার সমস্যাই ছিল মুখ্য। তাই সে আমলে তিনি এইসব অনাবাদী জমির বিরাট বিরাট খন্ড লোকদেরকে দিয়েছিলেন।

জমি বেদখল করার ব্যাপারে সরকার এমন ধরনের আইন প্রণয়ন করার অধিকার রাখে যার মাধ্যমে একথা নিশ্চিত করে দেয়া যায় যে, যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া মালিক কখনো কোনো কৃষককে বেদখল করতে পারবে না। এটা নাজায়েয হবার দলীল কি? যদি কোনো 'নাস' [আলাহ ও রাসূলের (সা) নির্দেশ]-এর বিরোধী না হয়, তাহলে এ অনুমতি ইমামের সেইসব ইখতিয়ারের আওতাভুক্ত হয়ে যায়, যা তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করা হয়েছে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে, লোকদের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি কায়েম করা এবং সামষ্টিক ফিতনার পথরোধ করার জন্য বর্তমানে আমাদের দেশের জনগণের বৃহত্তর অংশের জীবন ধারণ যেখানে একমাত্র জমির ওপর নির্ভরশীল, সেখানে মালিকদেরকে এত অবাধ ও ব্যাপক ক্ষমতা দান করা কোনোক্রমেই জনস্বার্থের অনুকূল নয়, যার ফলে তারা নিজেদের খেয়ালখুশী মতো যে কোনো কৃষককে সংগত কারণ ছাড়াই যে কোনো সময় জমি থেকে বেদখল করতে পারে। এর অর্থ দাঁড়াবে, কোনো কৃষক কখনো কোথাও নিশ্চিন্তে বসতে পারবে না। এভাবে লাখো লাখো কৃষিজীবী মানুষের জীবন সবসময় দোদুল্যমান ও ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে।

কুরআন অধ্যয়নের পর অদ্ভুত ফলশ্রুতি আপনি পেশ করেছেন। কুরআন থেকে বের করেছেন মালিকানা ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে সোপর্দ করে দিতে হবে। আমি খুবই খুশী হতাম যদি জানতে পারতাম কুরআনের কোন্ কোন্ আয়াত থেকে এগুলো বের হয়েছে। আপনি আমার 'মাসআলায়ে মিলকিয়াতে যমীন' বইটির প্রথম দুটি অধ্যায় সেই আলিম সাহেবের সামনে রাখুন, যাতে তিনি সেখানে যে প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে, তার

পুনরাবৃত্তি না করেন। অথবা সেই প্রশ্নগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে চাইলে, অন্তত সেখানে তার যে জবাব দেয়া হয়েছে, তার সাথে কোন্ কোন্ ব্যাপারে তিনি একমত নন, তা জানিয়ে দিতে পারেন। এভাবে আমার ও তাঁর অনেকটা সময় অপচয়ের হাত থেকে বাঁচবে।[৮]

৮. তরজমানুল কুরআন, জুন-১৯৫১।

৫. বর্গাচাষ পদ্ধতি এবং ইসলামের সুবিচার নীতি[৯]

জওয়াব ঃ (১) উৎপন্ন ফসল থেকে জমি মালিক ও ভাগচাষী আনুপাতিক হারে অংশ বন্টন করে নেবেন ভাগের এ পদ্ধতিটি নীতিগতভাবে ঠিক। যেমন ধরুন মালিকের $\frac{২}{৫}$ এবং চাষীর $\frac{৫}{৩}$ অংশ। কিন্তু এ ব্যাপারে ইনসাফের তাগিদে অবশ্যই প্রত্যেক চাষীকে এমন পরিমাণ জমি দিতে হবে যাতে তার মানবিক প্রয়োজন পূর্ণ হয়। উপরন্তু আনুপাতিক অংশ নির্ধারণ করার সময় প্রচলিত ধারা প্রতি নজর না দিয়ে, ইনসাফের প্রতি নজর রেখে দেখতে হবে, ফসল উৎপাদনে জমির মালিকও চাষীর যথার্থ অংশ (Contribution) কতটুকু? এ ব্যাপারে কোনো বিশ্বজনীন আইন কানুন বানানো সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যেক এলাকার কৃষির অবস্থা এক রকম নয়। তবে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, জমির মালিক যদি কেবল জমি দিয়ে থাকেন এবং হাল, বীজ ও মেহনত সব যদি হয় চাষীর, তাহলে এ অবস্থায় $\frac{২}{৫}$ ও $\frac{৩}{৫}$ ভাগটা ইনসাফভিত্তিক হবে না। যাই হোক, জমি মালিকরা নিজেদের ব্যাপারটিকে কেবল শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করে নেবেন, তা যথেষ্ট নয়; বরং তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে খোলা মনে, যথার্থ ইনসাফ কায়েম করার উদ্দেশ্যে।

(২) অবশ্যই জমির মালিকের তদারক করার অধিকার আছে। মালিক দেখতে পারেন ফসল ভাগ করার পূর্বে চাষী সম্মিলিত অংশ থেকে অবৈধভাবে কিছু গ্রাস করে ফেলছে কিনা; অথবা কৃষক হিসেবে সে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে কিনা। কিন্তু এই তদারকী ব্যবস্থা এত বেশী অগ্রসর না হওয়া উচিত, যার ফলে চাষী কেবলমাত্র কর্মচারী বা মজুরে পরিণত হয়ে যায় এবং মালিকের তদারকী কর্মচারীরা পুরোপুরি নিজেদের হুকুম অনুযায়ী তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। নীতিগতভাবে একজন চাষী মালিকের কর্মচারী বা মজুর নয়; বরং কারবারের ভাগীদার। আর একথা মেনে নিয়েই তার সাথে ব্যবহার করা উচিত। চাষীদের পক্ষ থেকে আমি যেসব অভিযোগ পেয়েছি, তার মধ্যে এ অভিযোগও আছে যে, জমিদার ও তার কর্মচারীরা হরহামেশা তাদের মাথার ওপর সওয়ার হয়ে থাকে এবং তাদের প্রত্যেকটি কাজে হস্তক্ষেপ করে। এ পদ্ধতির সংশোধনই আমার বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য।

---

৯. জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে ঃ তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৫০ ই.।

৬. অধিকারভুক্ত সম্পদ ব্যয়ের সীমা

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ
وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ـ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۚ وَمَنْ كَانَ
غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ
اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ـ (النساء : ٥ ـ ٦)

"আর তোমাদের যে ধন সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের মাধ্যমে পরিণত করেছেন, তা নির্বোধদের হাতে তুলে দিয়োনা তবে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা কর এবং সদুপদেশ দাও।[৮]

আর এতীমদের পরীক্ষা করতে থাক, যতদিন না তারা বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছে যায়।[৯] তারপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে যোগ্যতার সন্ধান পাও, তাহলে তাদের সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করে দাও।[১০] তারা বড় হয়ে নিজেদের অধিকার দাবী করবে, এ ভয়ে কখনো ইনসাফের সীমানা অতিক্রম করে তাদের সম্পদ তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলোনা। এতীমদের যে অভিভাবক সম্পদশালী হবে সে যেন পরহেজগারী অবলম্বন করে (অর্থাৎ অর্থ গ্রহণ না করে) আর যে গরীব হবে সে যেন প্রচলিত পদ্ধতিতে খায়।[১১] তারপর তাদের সম্পদ যখন তাদের হাতে সোপর্দ করতে যাবে তখন তাতে লোকদেরকে সাক্ষী বানাও। আর হিসাব নেবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"

৮. এ আয়াতটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে একটি পরিপূর্ণ বিধান দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে ঃ অর্থ জীবন যাপনের একটি মাধ্যম। যে কোনো অবস্থায়ই তা ক্রটিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে তমদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এবং শেষ পর্যন্ত নৈতিক ব্যবস্থাকেও ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। কোনো ব্যক্তির নিজের সম্পদের ওপর তার মালিকানা অধিকার থাকে ঠিকই। কিন্তু তা এতো বেশী সীমাহীন নয় যে, যদি সে ঐ সমস্ত অধিকার সঠিকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা না রাখে এবং তার ক্রটিপূর্ণ ব্যবহারের কারণে সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেয় তারপরও তার কাছ থেকে ঐ অধিকার হরণ করা যাবে না। মানুষের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা অবিশ্য পূর্ণ হতে হবে। তবে মালিকানা অধিকারের অবাধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যি এ বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়া উচিত যে, এ ব্যবহার নৈতিক ও তমদ্দুনিক

জীবন এবং সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিকর হতে পারবে না। এ বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক সম্পদ-সম্পত্তির মালিককে ক্ষুদ্র পরিসরে এদিকে অবশ্যি নজর রাখতে হবে যে, নিজের সম্পদ সে যার হাতে সোপর্দ করছে সে তা ব্যবহারের যোগ্যতা রাখে কিনা। আর বৃহত্তর পরিসরে এটা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যে, যারা নিজেদের সম্পদ ব্যবহারের যোগ্যতা রাখে না অথবা যারা অসৎ পথে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যবহার করছে, তাদের ধন সম্পত্তি সে নিজের পরিচালনাধীনে নিয়ে নেবে এবং তাদের জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেবে।

৯. অর্থাৎ যখন তারা বালেগ হতে থাকে তখন তাদের বুদ্ধি-জ্ঞান কি পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে তা দেখতে হবে এবং তারা নিজেদের বিষয়াদি আপন দায়িত্বে পরিচালনা করার যোগ্যতা কতটুকু অর্জন করেছে সে দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখতে হবে।

১০. ধন সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য দুটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, সাবালকত্ব আর দ্বিতীয়টি যোগ্যতা অর্থাৎ অর্থসম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা। প্রথম শর্তটির ব্যাপারে উম্মতের ফকীহগণ একমত। দ্বিতীয় শর্তটির ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির মত হচ্ছে এই যে, সাবালক হবার পরও যদি এতীমের মধ্যে 'যোগ্যতা' না পাওয়া যায়, তাহলে তার অভিভাবককে সর্বাধিক আরো সাত বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর 'যোগ্যতা' পাওয়া যাক বা না যাক সর্বাবস্থায় এতীমকে তার ধনসম্পদের দায়িত্ব দিয়ে দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেঈ রাহেমাহুমুল্লাহর মতে ধনসম্পদ এতীমের হাতে সোপর্দ করার জন্য অবশ্যি 'যোগ্যতা' একটি অপরিহার্য শর্ত। সম্ভবত এঁদের মতে এ ব্যাপারে শরীয়তের বিষয় সমূহের ফয়সালাকারী কাযীর শরণাপন্ন হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। যদি কাযীর সামনে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সংশ্লিষ্ট এতীমের মধ্যে যোগ্যতা পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তার বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য তিনি নিজেই কোনো ভালো ব্যবস্থা করবেন।[১০]

---

১০. তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা আন নিসা, আয়াত ৫-৬, টীকা ৮-১০।

সপ্তম অধ্যায়

সুদ

[এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় মওলানা একটি বড় গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাতে যুক্তি, ইতিহাস এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সুদ সমস্যার সকল প্রয়োজনীয় দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সুদ অর্থনৈতিক সুবিধা ও ফায়দা লাভের নিকৃষ্টতম হাতিয়ার। এ গ্রন্থে বাণিজ্যিক সুদ ও অবাণিজ্যিক সুদের মধ্যে পার্থক্য করার ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগিকেও পূর্ণরূপে খন্ডন করা হয়েছে, সুদবিহীন অর্থনীতির একটি প্রাথমিক রূপরেখাও পেশ করা হয়েছে। অর্থনীতির ছাত্রদের জন্যে এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা অত্যন্ত জরুরী। এ অধ্যায়ে আমরা সুদ গ্রন্থটি থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ এবং তাফহীমুল কুরআন ও রাসায়েল মাসায়েল থেকে প্রয়োজনীয় আলোচনা উপস্থাপন করছি। কিন্তু সুদ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য মূল গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা জরুরী —সংকলক]।

১. সুদ সম্পর্কে ইসলামের বিধান[১১]

এবার কুরআন ও হাদীসের আলোকে সুদের পর্যালোচনা করতে চাই। সুদ কি? এর সীমানা কি? সুদ হারাম হবার যেসব বিধান ইসলাম দিয়েছে সেগুলো কোন্ কোন্ ব্যাপারে ও কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? সুদের বিলোপ সাধন করে মানব জীবনের অর্থনৈতিক বিষয়াবলীকে ইসলাম কিভাবে পরিচালনা করতে চায়? এগুলোই হবে আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয়বস্তু।

রিবার অর্থ

কুরআন মজীদে সুদের প্রতিশব্দ হিসেবে 'রিবা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূলে আছে আরবী ভাষায় ر ب و তিনটি হরফ। এর অর্থের মধ্যে বেশী, বৃদ্ধি, বিকাশ, চড়া প্রভৃতি ভাব নিহিত। যেমন, رَبَا (রাবা) অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া ও বেশী হওয়া। رَبَا فُلَانٌ الرَّابِيَةَ - অর্থ সে টিলায় চড়লো। رَبَا فُلَانٌ السَّوِيْقَ অর্থ সে ছাতুর মধ্যে পানি ঢাললো এবং ছাতু ফুলে উঠলো। رَبَا فِي حِجْرِهِ অর্থ সে অমুকের কোলে লালিত পালিত হয়েছে। - اَرْبَى الشَّيْئُ অর্থ জিনিসটি বৃদ্ধি করেছে। رابية (রাবওয়াতুন) অর্থ উচ্চতা। ربوة অর্থ এমন স্থান বা জমি যা ধরাপৃষ্ঠ থেকে উঁচু। কুরআন মজীদে এ শব্দটির মূল থেকে নির্গত শব্দাবলী যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই বৃদ্ধি, উচ্চতা ও বিকাশ অর্থ পাওয়া যায়। যেমন ঃ

فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ - (الحج : ٥)

যখন আমি তার ওপর পানি বর্ষণ করলাম তখন তা সবুজ শ্যামল হয়ে উঠলো এবং শস্য ও ফল দান করতে লাগলো। -আল হজ্জ ঃ ৫

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ط (البقرة : ٢٧٦)

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সদকাকে বৃদ্ধি দান করেন।

-আল-বাকারা ঃ ২৭৬

فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا - (الرعد : ١٧)

যে ফেনপুঞ্জ উপরে উঠে এসেছিল বন্যা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো।

-আর-রা'আদ ঃ ১৭

---

১১. সুদ গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً - (الحاقة : ١٠)

সে তাদেরকে আরো শক্ত করে ধরলো। -আল-হাক্কাহ ঃ ১০

أَنْ تَكُوْنَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبٰى مِنْ أُمَّةٍ ۔ (النحل: ٩٢)

যাতে এক জাতি অন্য জাতি থেকে অগ্রসর হয়ে যায়। -আন-নাহল ঃ ৯২

أَوَيْنٰهُمَآ إِلٰى رَبْوَةٍ - (المومنون: ٥٠)

আমি মরিয়ম ও ঈসাকে একটি উচ্চস্থানে আশ্রয় দান করলাম। -আলমুমিনুন ঃ ৫.

এ ধাতু থেকেই রিবা ربٰو শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, ধন বৃদ্ধি হওয়া এবং আসল থেকে বেড়ে যাওয়া। কুরআনেও এ অর্থটি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَ ذَرُوْا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا .... وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ ۔

আর লোকদের নিকট তোমাদের যা কিছু সুদ অবশিষ্ট (পাওনা) রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও আর যদি তোমরা তওবা করে নাও তাহলে তোমাদের মূলধনটাই (অর্থাৎ প্রদত্ত আসল অর্থ) ফেরত পাবার অধিকার তোমাদের আছে। -আল-বাকারা ঃ ৩৮

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ - (الروم: ٣٩)

যে সুদ তোমরা দিয়েছো এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহর নিকট তার সাহায্যে ধন বৃদ্ধি হয় না। -আর-রূম ঃ ৩৯

এই আয়াতগুলো থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আসল অর্থের উপর যা কিছু বাড়তি হবে তা 'রিবা' আখ্যা পাবে। কিন্তু কুরআন মজীদ ঢালাওভাবে সব রকমের বৃদ্ধিকে হারাম গণ্য করেনি। বৃদ্ধি ব্যবসায়েও হয়। কুরআন একটি বিশেষ ধরনের বৃদ্ধিকে হারাম গণ্য করেছে এবং এ বৃদ্ধিকে 'রিবা' নামকরণ করেছে। ইসলামপূর্ব যুগে আরবী ভাষায় এ বিশেষ পর্যায়ের লেনদেনটিকে ঐ একই নামে অভিহিত করা হতো। কিন্তু তৎকালে লোকেরা 'রিবা'-কে ব্যবসায়ের ন্যায় বৈধ মনে করতো যেমন আধুনিক জাহেলিয়াতে মনে করা হয়। ইসলাম এসে জানিয়ে দিল যে, ব্যবসায়ের ফলে মূলধনের যে বৃদ্ধি হয় তা 'রিবা'র মাধ্যমে বৃদ্ধি থেকে আলাদা। প্রথম ধরনের বৃদ্ধিটি হালাল এবং দ্বিতীয় ধরনের বৃদ্ধিটি হারাম।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْٓا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا - وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا -

(البقرة: ٢٧٥)

সুদখোরদের এহেন পরিণতি হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলেছে, ব্যবসা রিবা (সুদ) সদৃশ; অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং রিবাকে হারাম গণ্য করেছেন।

[আল বাকারা ঃ ২৭৫]

যেহেতু রিবা ছিল একটি বিশেষ ধরনের বৃদ্ধির নাম এবং তা সর্বজন পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিল তাই কুরআন মজীদে এর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। কুরআন এ ব্যাপারে কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছে যে, আল্লাহ রিবাকে হারাম গণ্য করেছেন, কাজেই তোমরা এটি পরিহার কর।

জাহেলী যুগের রিবা

জাহেলী যুগে যে সমস্ত লেন-দেনের ক্ষেত্রে 'রিবা' শব্দটির ব্যবহার হতো হাদীসে তার বিভিন্ন বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

কাতাদাহ বলেন, জাহেলী যুগের রিবা ছিল নিম্নরূপ ঃ এক ব্যক্তি অন্যজনের হাতে কোনো জিনিস বিক্রি করতো এবং মূল্য আদায় করার জন্য তাকে নির্দিষ্ট সময় দিতো। এ সময় অতিক্রান্তের পর যদি সে মূল্য আদায় না করতো, তাহলে তাকে আরো সময় দিতো এবং মূল্য বাড়িয়ে দিতো।

মুজাহিদ বলেন, জাহেলী যুগের রিবা ছিল নিম্নরূপ। এক ব্যক্তি অন্যের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাকে বলতো, যদি তুমি আমাকে অমুক দিন থেকে অমুক দিন পর্যন্ত সময় দাও তাহলে আমি তোমাকে এ পরিমাণ বেশী দেবো। (ইবনে জরীর, ৩য় খন্ড, ৬২ পৃঃ)

আবু বকর জাস্সাস তাঁর নিজস্ব অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বলেন, জাহেলী যুগে লোকেরা ঋণ গ্রহণ করার সময় ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হতো। তাতে বলা হতো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসল মূলধন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশী অর্থ ঋণগ্রহীতাকে আদায় করতে হবে। (আহকামুল কুরআন, ১ম খন্ড)

এ ব্যাপারে ইমাম রাযীর অনুসন্ধান হচ্ছে, জাহেলী যুগে লোকদের মধ্যে একটি বিশেষ নিয়ম প্রচলিত ছিল। তারা এক ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ দিতো এবং তার নিকট থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ আদায় করতো। মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ঋণগ্রহীতার নিকট আসল মূলধন চাওয়া হতো। যদি সে আদায় করতে না পারতো তাহলে আরো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে অবকাশ দেয়া হতো এবং সুদ বাড়িয়ে দেয়া হতো। (তাফসীরে কবীর, ২য় খন্ড, ৩৫১ পৃঃ)

তদানিন্তন আরবে প্রচলিত এ ধরনের লেন-দেনকে আরববাসীরা নিজেদের ভাষায় 'রিবা' নাম দিয়েছিল এবং কুরআন মজীদ একেই হারাম ঘোষণা করেছিল।[১২]

---

১২. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট দেখুন।

ব্যবসা ও রিবার মধ্যে নীতিগত পার্থক্য

ব্যবসা ও রিবার মধ্যে নীতিগত পার্থক্য কি? রিবার বৈশিষ্ট্য কি, যে কারণে তার চেহারা ব্যবসায়ের থেকে ভিন্ন প্রকার দেখায় এবং ইসলাম কেনইবা তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে—এ ব্যাপারগুলো এবার গভীরভাবে চিন্তা করুন।

ব্যবসা বলতে বুঝায়, সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'টি পক্ষ আছে। বিক্রেতা একটি বস্তু বিক্রির জন্য পেশ করে। ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলে এ বস্তুটির একটি মূল্য স্থির করে। এ মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতা বস্তুটি কিনে নিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে বিক্রেতা নিজে পরিশ্রম করে ও অর্থ ব্যয় করে ঐ বস্তুটি তৈরী করেছে অথবা সে কোথাও থেকে বস্তুটি কিনে এনেছে—এ দুটোর যে কোনো একটি অবস্থার অবশ্যি সৃষ্টি হয়। এ উভয় অবস্থায়ই সে বস্তুটি কেনা বা সংগ্রহ করার ব্যাপারে নিজের যে মূলধন খাটিয়েছে তার সাথে নিজের পরিশ্রমের অধিকার সংযুক্ত করে এবং এটিই তার মুনাফা।

অন্যদিকে রিবা বলতে বুঝায়, এক ব্যক্তি নিজের মূলধন অন্য একজনকে ঋণ দেয়। এ সংগে শর্ত আরোপ করে যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণগ্রহীতাকে মূলধনের চেয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশী অর্থ আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে মূলধনের বিনিময়ে মূলধন এবং নির্দিষ্ট সময়ের অবকাশের বিনময়ে বাড়তি অর্থ লাভ করা হয়—পূর্বাহ্নে একটি শর্ত হিসেবে যেটিকে নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। এ বাড়তি অর্থের নাম সুদ বা রিবা। এটি কোনো বিশেষ অর্থ বা বস্তুর বিনিময় নয়, বরং নিছক অবকাশের বিনিময়। যদি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারিত হবার পর ক্রেতার নিকট শর্ত পেশ করা হয় যে, মূল্য আদায় করতে (মনে করুন) এক মাস দেরী হলে মূল্য একটি নির্দিষ্ট হারে বেড়ে যাবে, তাহলে এ বৃদ্ধি সুদের পর্যায়ভুক্ত হবে।

কাজেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে মূলধনের উপর যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়তি অর্থ গ্রহণ করা হয় তাকেই সুদ বলা হয়। সুদের সংজ্ঞা এভাবেই নিরূপিত হয়। তিনটি অংশের একত্র সংযোজনই সুদের উদ্ভব। এক. মূলধন বৃদ্ধি। দুই. সময়ের অনুপাতে বৃদ্ধির সীমা নির্ধারণ। তিন. এগুলোকে শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা। ঋণ সংক্রান্ত যে কোনো লেনদেনের মধ্যে এ তিনটি অংশ পাওয়া গেলে তা সুদী লেনদেনে পরিণত হয়। কোনো সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক কাজে লাগানো অথবা কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য এ ঋণ গৃহীত হোক এবং ঋণগ্রহীতা দরিদ্র বা ধনী যাই হোক না কেন তাতে এর আসল চরিত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না।

ব্যবসা ও সূদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মুনাফার বিনিময় হয় সমান পর্যায়ে। কারণ ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে যে বস্তুটি ক্রয় করে তা থেকে লাভবান হয়। অন্যদিকে বিক্রেতা ঐ বস্তুটি ক্রেতার জন্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে যে পরিশ্রম, বুদ্ধি ও

সময় ব্যয় করে তার পারিশ্রমিকই সে লাভ করে। বিপরীতপক্ষে সুদী লেনদেনে সমান পর্যায়ে মুনাফা বিনিময় হয় না। সুদগ্রহীতা ধনের একটি নির্ধারিত পরিমাণ লাভ করে, যা তার জন্যে অবশ্যি লাভজনক হয়। কিন্তু সুদদাতা কেবলমাত্র সাময়িক অবকাশ লাভ করে, এর লাভজনক হবার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকলে সাময়িক অবকাশ তার জন্য লাভজনক হয় না বরং নিশ্চিত ক্ষতিকর হয়। আর ব্যবসা, শিল্প, কারিগরী বা কৃষিতে খাটাবার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে অবকাশ তার জন্য একদিকে যেমন লাভের সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দেয়, তেমনি অন্যদিকে ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়েও উপস্থিত হয়। কিন্তু ব্যবসায়ে লাভ লোকসান যাই হোক না কেন ঋণদাতা সর্বাবস্থায় তা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা লাভ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সুদী কারবারে এক পক্ষের লাভ ও অন্য পক্ষের লোকসান হয় অথবা এক পক্ষের নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট লাভ এবং অন্যপক্ষের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত লাভ হয়।

দুই ঃ ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে যত বেশী মুনাফা অর্জন করুক না কেন মাত্র একবারই সে তা অর্জন করে। কিন্তু সুদী কারবারে মূলধন দানকারী অনবরত নিজের ধনের বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করতে থাকে এবং সময় অতিক্রান্তের সাথে সাথে এ মুনাফার পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে। তার ধন থেকে ঋণগ্রহীতা যতই লাভবান হোক না কেন তা একটি বিশেষ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু এ মূলধনের বিনিময়ে ঋণদাতা যে মুনাফা অর্জন করে তার কোনো সীমা নেই। তার এ সীমাহীন মুনাফা তার সমস্ত উপার্জন, সমস্ত উপায় উপকরণ ও ধনদৌলত এবং তার যাবতীয় প্রয়োজনকে ছাপিয়ে যাবার পরও শেষ নাও হতে পারে।

তিন ঃ ব্যবসায়ে পণ্য ও তার মূল্যের বিনিময় হবার সাথে সাথেই কারবার শেষ হয় যায়। এর পরে ক্রেতা কোনো পণ্য বা বস্তু বিক্রেতাকে ফেরত দেয় না। কিন্তু সুদী কারবারে ঋণগ্রহীতা মূলধন গ্রহণ করার পর তা ব্যয় করে ফেলে; অতঃপর এ ব্যয়িত বস্তু, পুনর্বার সংগ্রহ করে, তার সাথে সুদের বাড়তি অংশ সংযুক্ত করে, তাকে ফেরত পাঠাতে হয়।

চার ঃ ব্যবসা, শিল্প, কৃষি ও কারিগরীতে মানুষ পরিশ্রম করে ও বুদ্ধি খাটিয়ে তার ফল লাভ করে। কিন্তু সুদী কারবারে সে নিছক নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন খাটিয়ে কোনো প্রকার পরিশ্রম না করে, চিন্তা ও বুদ্ধি শক্তি ব্যবহার না করে, অন্যের উপার্জনের সিংহভাগ দখল করে বসে। পারিভাষিক অর্থে যাকে অংশীদার বলা হয়, যে ব্যক্তি লাভ-লোকসান উভয়তেই অংশীদার থাকে এবং লাভের আনুপাতিক হারে তা থেকে অংশ নেয়, সে তেমন ধরনের অংশীদার নয়; বরং সে হয় এমন একজন অংশীদার, যে লাভ-লোকসান এবং লাভের আনুপাতিক হারের পরোয়া না করে, নিজের নির্ধারিত ও শর্তাবদ্ধ মুনাফার দাবীদার হয়।

রিবা হারাম হবার কারণ

এসব কারণে আল্লাহ ব্যবসা হালাল ও সুদ হারাম করেছেন। এ কারণগুলো ছাড়া সুদ হারাম হবার আরো অনেক কারণ আছে, ইতিপূর্বে আমরা সেগুলো আলোচনা করেছি। সুদ কার্পণ্য, স্বার্থান্ধতা, হৃদয়হীনতা, নিষ্ঠুরতা ও অর্থগৃধ্নুতার অসৎ গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করে। মানুষের মধ্যকার সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার সম্পর্ক ছিন্ন করে। মানুষের মধ্যে ধন সঞ্চয় করে নিছক নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবণতা সৃষ্টি করে। সমাজে ধনের অবাধ গতি ও আবর্তনে বাধা দেয়; বরং ধনের আবর্তনের গতি ঘুরিয়ে বিত্তহীনদের থেকে বিত্তবানদের দিকে ফিরিয়ে দেয়। তার কারণে সমগ্র দেশবাসীর ধন সমাজের একটি শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। এর ফলে সমগ্র সমাজ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণের নিকট এ ব্যাপারটি মোটেই প্রচ্ছন্ন নেই। সুদের এ সকল প্রভাব অনস্বীকার্য। কাজেই এ সত্যটিও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, যে কাঠামোর ভিত্তিতে ইসলাম মানুষের নৈতিক প্রশিক্ষণ, তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সুসংহত করা ও তার অর্থনৈতিক জীবন সংগঠিত করতে চায় সুদ তার প্রতিটি অংশের পূর্ণ পরিপন্থী। নগণ্যতম সুদী কারবার ও তার আপাত সর্বাধিক নিষ্কলুষ অবস্থাও ইসলামের সমগ্র কাঠামো নষ্ট করে দেয়। এ কারণেই আল্লাহ কুরআন মজীদে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সুদ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

اِتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج (البقرة : ٢٧٨ - ٢٧٩)

আল্লাহকে ভয় কর আর লোকদের নিকট তোমাদের যে সুদ পাওনা বাকী রয়ে গেছে সেগুলো ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমান রেখে থাক। আর যদি তোমরা এমনটি না কর, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ কর। –আল বাকারা

সুদ হারামের ব্যাপারে কঠোর নীতি

কুরআন মজীদে বহুবিধ গুনাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে এবং সেগুলোর জন্য কঠোর শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শন করাও হয়েছে। কিন্তু সুদের ন্যায় এতো কঠোর ভাষায় অন্য কোনো গুনাহের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি।[১৩] এজন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র সুদ বন্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) চরম প্রচেষ্টা চালান। তিনি নাজরানের খৃস্টানদের সাথে যে চুক্তি করেন তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখে পাঠান, যদি

---

১৩. এক হাদীসে বলা হয়েছে, সুদের গুনাহ নিজের মায়ের সাথে যিনা করার চাইতেও সত্তর গুণ বেশী। (ইবনে মাজাহ্)

তোমরা সুদী কারবার কর, তাহলে তোমাদের সাথে চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। বনু মুগীরার সুদী লেনদেন আরবে প্রসিদ্ধ ছিল। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সমস্ত পাওনা সুদ বাতিল করে দেন এবং মক্কায় তাঁর নিযুক্ত তহশীলদারদেরকে লিখে পাঠান, যদি তারা (বনু মুগীরা) সুদ গ্রহণ করা বন্ধ না করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। রাসূলে করীম (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা)ও একজন বড় মহাজন ছিলেন। বিদায় হজ্জে রাসূলে করীম (সা) ঘোষণা দিলেন ঃ জাহেলী যুগের সমস্ত সুদ বাতিল করে দেয়া হলো। সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস (রা)-এর সুদ বাতিল করলাম। তিনি এতদূরও বললেন, সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের চুক্তিপত্র লেখক এবং এর ওপর সাক্ষ্যদাতা সবার ওপর আল্লাহর লানত !

এসব বিধানের উদ্দেশ্য কি ছিল? নিছক একটি বিশেষ ধরনের সুদ অর্থাৎ USURY (মহাজনী সুদ) বন্ধ করে দিয়ে বাদবাকী সব রকমের সুদ চালু রাখা এ বিধানগুলোর উদ্দেশ্য ছিল না বরং এর আসল উদ্দেশ্য ছিল, পুঁজিবাদী নৈতিকতা ও চরিত্র, পুঁজিবাদী মানসিকতা, পুঁজিবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করে এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে থাকবে কার্পণ্যের পরিবর্তে বদান্যতা, স্বার্থান্ধতার পরিবর্তে সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ,সুদের পরিবর্তে যাকাত এবং ব্যাংকের পরিবর্তে থাকবে জাতীয় বায়তুলমাল। এ ক্ষেত্রে এমন অবস্থার সৃষ্টিই হবে না যার ফলে কোঅপারেটিভ সোসাইটি, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী ও প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতির প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সর্বশেষে কমিউনিজমের প্রকৃতি বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

২. সুদের প্রয়োজন ঃ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা

এযাবত আমরা বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহ্র নির্দেশনা পেশ করেছি। এবার বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপর কিছু আলোচনা করবো।

সুদ কি যুক্তিসম্মত

সুদ কি যথার্থই একটি যুক্তিসংগত বিষয়? কোনো ব্যক্তি ঋণ বাবদ প্রদত্ত অর্থের উপর সুদ দাবী করলে তাকে কি বুদ্ধিসম্মত বলা যেতে পারে এবং তার এ দাবীটি কি ন্যায়সংগত বলে বিবেচিত হবার যোগ্য? কোনো ব্যক্তি একজনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করলে সে ঋণ বাবদ গৃহীত আসল অর্থ ফেরত দেবার সাথে সাথে তাকে কিছু সুদও প্রদান করবে, এটা কি ইনসাফের দাবী? সর্বপ্রথম এ প্রশ্নগুলোর মীমাংসা হওয়া উচিত। এ প্রশ্নগুলোর মীমাংসা হয়ে গেলে আমাদের আলোচনার অর্ধেক বিষয় আপনাআপনি মীমাংসিত হয়ে যাবে। কারণ সুদ একটি যুক্তিসংগত বিষয় বলে বিবেচিত হলে, সুদ হারাম হবার ব্যাপারটি নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। আর যদি বুদ্ধি ও ইনসাফের দৃষ্টিতে সুদ যুক্তিসংগত প্রমাণিত না হয়, তাহলে মানব সমাজে এ অযৌক্তিক বিষয়টিকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন কোথায় এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে।

ক. ঝুঁকি ও ত্যাগের বিনিময়

এ প্রশ্নের জবাবে আমরা সর্বপ্রথম যে যুক্তিটির সম্মুখীন হই তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজের সঞ্চিত ধনসম্পদ অন্যকে ঋণ দেয় সে বিপদ বরণ করে, ত্যাগ স্বীকার করে, নিজের প্রয়োজন অপূর্ণ রেখে অন্যের প্রয়োজন পূর্ণ করে এবং যে সম্পদ থেকে সে নিজে উপকৃত হতে পারতো তা অন্যের হাতে সোপর্দ করে। ঋণগ্রহীতা নিজের কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করলে তাকে অবশ্যি ঐ সম্পদের ভাড়া আদায় করা উচিত। যেমন বাড়ী, গাড়ী বা আসবাবপত্রের ভাড়া আদায় করা হয়ে থাকে। ঋণদাতা নিজের শ্রমোপার্জিত অর্থ নিজে ব্যবহার না করে তাকে প্রদান করে যে ঝুঁকি বরণ করে নিয়েছে, এ ভাড়া তার বিনিময় হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। আর ঋণগ্রহীতা এ অর্থ কোনো মুনাফা সৃষ্টিকারী কাজে খাটাবার জন্য গ্রহণ করে থাকলে ঋণদাতা অবশ্যি তার নিকট সুদ দাবী করার অধিকার রাখবে। ঋণগ্রহীতা যেখানে অন্যের অর্থ থেকে লাভবান হচ্ছে, সেখানে ঋণদাতা ঐ লাভের ন্যায্য অংশ পাবে না কেন?

ঋণদাতা নিজের অর্থ অন্যের হাতে সোপর্দ করার ব্যাপারে বিপদ বরণ করে নেয় এবং ত্যাগ স্বীকার করে, একথা সত্য; কিন্তু এ বিপদ বরণ ও ত্যাগ স্বীকারের মূল্য

হিসেবে বছরে, ছ'মাসে বা মাসে শতকরা পাঁচ বা দশ ভাগ আদায় করার যৌক্তিকতা কোথায়? বিপদ বরণ করে নেয়ার কারণে সে যুক্তিসংগতভাবে যে অধিকার লাভ করে তা হচ্ছে, সে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কোনো জিনিস বন্ধকস্বরূপ রেখে দিতে পারে অথবা তার কোনো জিনিস নিজের দায়িত্বে নিয়ে তাকে ঋণ দিতে পারে বা তার নিকট থেকে জামানত তলব করতে পারে। এসব কিছুতে সম্মত না হলে তার আদতে বিপদ বরণ না করা এবং ঋণদানে অস্বীকার করা উচিত। কিন্তু বিপদ কোনো ব্যবসার পণ্য নয়, যার কোনো মূল্য দান করা যেতে পারে বা কোনো গৃহ, আসবাবপত্র ও যানবাহন নয়, যার কোনো ভাড়া আদায় করা যেতে পারে। অবশ্য ত্যাগ স্বীকারের ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, ব্যবসায়ে পরিণত না হওয়া পর্যন্তই তা ত্যাগ বলে গণ্য হতে পারে। ত্যাগ স্বীকারের উদ্দেশ্য থাকলে যথার্থ ত্যাগ স্বীকারই করা উচিত এবং এ নৈতিক কাজটির নৈতিক লাভের উপরই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর যদি বিনিময় ও পারিশ্রমিকের প্রশ্ন তোলা হয় তাহলে ত্যাগের কথা না উঠানোই সংগত; বরং সরাসরি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে জানাতে হবে যে ঋণের ব্যাপারে আসল অর্থের বাইরে মাসিক বা বার্ষিক সে যে আর একটি অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে, তার অধিকারী সে হলো কিসের ভিত্তিতে?

এটা কি তার ক্ষতিপূরণ? কিন্তু সে ঋণ বাবদ যে অর্থ দিয়েছে তা ছিল তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সে নিজেও এ অর্থটি ব্যবহার করছিল না। কাজেই এখানে আসলে কোনো 'ক্ষতি' হয়নি এবং এ ঋণদানের জন্য কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারীও সে হতে পারে না।

এটা কি ভাড়া বাবদ প্রাপ্য অর্থ? কিন্তু ভাড়া এমন সব জিনিসের হয়ে থাকে যেগুলোকে ভাড়াটের উপযোগী ও তার জন্য ব্যবহারযোগ্য করার জন্য মানুষ নিজের সময়, অর্থ ও শ্রম নিয়োজিত করে। ভাড়াটের ব্যবহারের কারণে সেগুলো নষ্ট হয়, ভেঙ্গে চুরে যায়, যার ফলে সেগুলোর মূল্য কমে যেতে থাকে। ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যেমন, আসবাবপত্র, গৃহ ও যানবাহনের ক্ষেত্রে একথা যথার্থ এবং এ বস্তুগুলোর ভাড়া আদায় করাও যুক্তিসংগত; কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এ সংজ্ঞা যথার্থ নয়, যেমন গম, ফল ইত্যাদি এবং টাকা পয়সাও এই একই গোত্রভুক্ত। কারণ টাকা পয়সা নিছক বস্তু ও সেবা ক্রয় করার একটি মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই এসব বস্তুর ভাড়ার প্রসঙ্গ অর্থহীন।

কোনো ঋণদাতা বড়জোর এতটুকু বলতে পারে ঃ আমার নিজের অর্থ থেকে আমি অন্যকে লাভবান হবার সুযোগ দিচ্ছি, কাজেই এ লাভে আমারও অংশ রয়েছে। এটা অবশ্যি যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে অভাবী ও বুভূক্ষু ব্যক্তি নিজের অভূক্ত সন্তানদের পেটে দুমুঠো আহার যোগাবার জন্য আপনার নিকট থেকে ৫০ টাকা হাওলাত নিয়েছে, সে কি সত্যিই ঐ টাকা থেকে এমনভাবে 'লাভবান' হচ্ছে, যার ফলে

আপনি তা থেকে নিজের অংশ হিসেবে মাসে মাসে শতকরা ২ টাকা বা ৫ টাকা হারে পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন? লাভবান সে অবশ্যি হচ্ছে এবং তাকে এ সুযোগটি নিঃসন্দেহে আপনিই দিয়েছেন; কিন্তু বুদ্ধি বিবেক, ইনসাফ, অর্থনীতি বিজ্ঞান, ব্যবসা নীতি—কিসের দৃষ্টিতে এ লাভ বা লাভবান হবার সুযোগকে এমন পর্যায়ে আনা যেতে পারে, যার ফলে আপনি তার একটি আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন? ঋণগ্রহীতার বিপদ যতই কঠিন হবে এ মূল্যও ততই বাড়তে থাকবে; তার বিপদকাল যত দীর্ঘ হতে থাকবে আপনার প্রদত্ত এ 'লাভবান হবার সুযোগের' মূল্যও তত মাস ও বার্ষিক হারে বাড়তে থাকবে? একজন অভাবী ও বিপদগ্রস্তকে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থদান করার মতো বিরাট হৃদয়বত্তার অধিকারী যদি আপনি না হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার ঐ অর্থ তার নিকট থেকে ফেরত পাবার ব্যাপারে সর্বপ্রকারে নিশ্চিন্ত হয়ে নিন, তারপরই তাকে ঐ অর্থ ঋণ দিন। এটাই আপনার জন্য যুক্তিসঙ্গত পন্থা। আর যদি ঋণ দিতেও আপনার মন সায় না দেয়, তাহলে তাকে কোনো প্রকারে সাহায্য করবেন না, এও একটা যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু কোনো ব্যক্তির বিপদ-দুঃখ-কষ্ট আপনার জন্য মুনাফা সংগ্রহের সুযোগরূপে গণ্য হবে এবং অভুক্ত পেট ও মৃত্যুপথযাত্রী রোগী আপনার জন্য অর্থ খাটাবার (Investment) ক্ষেত্র বিবেচিত হবে; উপরন্তু মানুষের বিপদ বাড়ার সংগে সংগে আপনার লাভের সম্ভাবনাও বেড়ে যেতে থাকবে, এটা কোন্ ধরনের যুক্তিসংগত ব্যবসা !

'লাভবান হওয়ার সুযোগ দেয়া' যদি কোনো অবস্থায় কোনো আর্থিক মূল্যের অধিকারী হয় তাহলে তা কেবলমাত্র এমন এক অবস্থায় হতে পারে যখন অর্থ গ্রহণকারী তা কোনো ব্যবসায়ে খাটায়। এ অবস্থায় অর্থদানকারী একথা বলার অধিকার রাখে যে, তার অর্থ থেকে অন্য ব্যক্তি যে লাভ কুড়াচ্ছে তার মধ্যে তার ন্যায্য অংশ রয়েছে এবং এ অংশ তার পাওয়া উচিত। কিন্তু বলাবাহুল্য পুঁজি একাকী কোনো মুনাফা সৃষ্টির যোগ্যতা রাখে না। মানুষের শ্রম ও যোগ্যতা তার সাথে যুক্ত হলে তবেই সে মুনাফা দানের যোগ্যতা অর্জন করে। আবার মানুষের শ্রম ও যোগ্যতা তার সাথে যুক্ত হবার সাথে সাথেই সে মুনাফা দান করতে শুরু করে না; বরং মুনাফা দানের জন্য তার একটি মেয়াদের প্রয়োজন হয়। উপরন্তু তার মুনাফা দান নিশ্চিতও নয়—সেখানে ক্ষতি ও দেউলিয়া হবার আশংকাও থাকে। আর লাভজনক হবার ক্ষেত্রে কোন্ সময় কি পরিমাণ মুনাফা দেবে তা পূর্বাহ্নে বলাও সম্ভব হয়না এক্ষেত্রে মানুষের শ্রম ও যোগ্যতা যখন পর্যন্ত ঐ অর্থের ধারে কাছেও পৌছাতে পারেনি তখন থেকেই কেমন করে অর্থদানকারীর মুনাফা শুরু হয়ে যেতে পারে? উপরন্তু মুনাফার হার ও পরিমাণই বা কেমন করে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, যখন পুঁজির সাথে মানুষের মেহনত ও যোগ্যতার মিলনে মুনাফা সৃষ্টি নিশ্চিত নয় এবং কি পরিমাণ মুনাফা সৃষ্টি হবে তাও জানা নেই?

যে ব্যক্তি নিজের অতিরিক্ত সঞ্চিত অর্থ কোনো মুনাফা সৃষ্টিকারী কাজে লাগাতে চায় তার শ্রম বিনিয়োগকারীদের সাথে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন করা এবং একটি স্থিরীকৃত হার অনুযায়ী লাভ ও লোকসানের অংশীদার হওয়া উচিত, এক্ষেত্রে এটিই একমাত্র যুক্তিসংগত পদ্ধতি হতে পারে। বিপরীতপক্ষে আমি যদি এক ব্যক্তির ব্যবসায়ে অংশীদার হবার পরিবর্তে তাকে একশো টাকা ঋণ দিয়ে থাকি এবং তাকে বলি, যেহেতু তুমি এ অর্থ থেকে লাভবান হবে, তাই আমার টাকা যতদিন তোমার ব্যবসায়ে খাটবে ততদিন পর্যন্ত তুমি প্রতিমাসে আমাকে এক টাকা হারে মুনাফা দিতে থাকবে, এটা কোন্ ধরনের যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি হতে পারে? প্রশ্ন হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ পুঁজির পিছনে পরিশ্রম খাটিয়ে তা থেকে মুনাফা অর্জিত হতে শুরু না হয়, ততক্ষণ সেখানে কোন্ ধরনের সঞ্চিত মুনাফা থাকে যা থেকে আমি নিজের অংশ দাবী করার অধিকার রাখি? যদি ঐ ব্যক্তি তার ব্যবসায়ে লাভের পরিবর্তে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে কোন্ বিবেক ও ইনসাফের প্রেক্ষিতে আমি তার নিকট থেকে মাসিক মুনাফা আদায় করার অধিকার রাখতে পারি? যদি তার মুনাফা মাসিক এক টাকার চেয়ে কম হয় তাহলে আমার মাসিক এক টাকা আদায় করার কি অধিকার আছে? আর তার সমগ্র মুনাফাই যদি হয় এক টাকা তাহলে এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সারা মাস নিজের সময়, শ্রম, যোগ্যতা, বুদ্ধি, সামর্থ্য ও নিজের ব্যক্তিগত পুঁজি সবকিছু খাটালো, সে কিছুই পেলো না; অথচ আমি কেবলমাত্র একশো টাকা তাকে দিয়ে চুপচাপ বসে ছিলাম; কিন্তু মুনাফার সবটুকু আমি লুটেপুটে নিয়ে গেলাম, এটা কোন্ ধরনের ইনসাফ? কলুর বলদও যদি সারাদিন ঘানি টানে তাহলে কলুর নিকট কমপক্ষে সে নিজের আহার চাইবার দাবী রাখে, কিন্তু এ সুদীঋণ মানুষকে এমন এক বলদে পরিণত করে, যে কলুর জন্য সারা দিন ঘানি টানবে, কিন্তু আহার তাকে বাইরে কোথাও থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া যায় যে, কোনো ব্যবসায়ী ব্যক্তির মুনাফা ঐ নির্ধারিত অর্থের চেয়ে বেশী হয়, যা ঋণদাতা সুদের আকারে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, তাহলেও বুদ্ধিবৃত্তি, ইনসাফ, ব্যবসা নীতি ও অর্থনৈতিক রীতিনীতি—কোনোকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে একথা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করা যেতে পারে না যে, যারা আসল উৎপাদনকারী, যারা সমাজের প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত ও সংগ্রহ করার জন্য নিজেদের সময় ব্যয় করে, পরিশ্রম করে, মস্তিষ্ক পরিচালনা করে এবং নিজেদের শরীর ও মস্তিষ্কের সমুদয় শক্তি ব্যবহার করে, তাদের সবার লাভ সংশয়যুক্ত ও অনির্দিষ্ট থেকে যাবে, কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের অতিরিক্ত সঞ্চিত অর্থ ঋণ দিয়েছে, একমাত্র তার লাভ নিশ্চিত ও নির্ধারিত হবে। তাদের সবার জন্য ক্ষতির আশংকা রয়েছে, কিন্তু তার জন্য রয়েছে লাভের গ্যারান্টি। সবার লাভের হার বাজারের দামের সাথে উঠানামা করে, কিন্তু সে একাই এমন এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে নিজের জন্য লাভের যে অংক নির্ধারণ করে

নিয়েছে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তা কোনো প্রকার রদবদল ছাড়াই যথানিয়মে পেয়ে যেতে থাকে।*

খ. সহযোগিতার বিনিময়

এ সমালোচনা থেকে একটি কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ সুদকে একটি যুক্তিসঙ্গত বস্তু গণ্য করার জন্য প্রথম পর্যায়ে যেসব যুক্তিকে যথেষ্ট মনে করা হয় একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে সেগুলোর দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তার উপর সুদ আরোপ করার স্বপক্ষে কোনো বুদ্ধিসম্মত যুক্তিই থাকতে পারে না। এমনকি, সুদের সমর্থকগণও এ দুর্বল মামলাটির ব্যাপারে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তবে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যে ঋণ গ্রহণ করা হয়, তার ব্যাপারেও সুদ সমর্থকদের সম্মুখে এ জটিল প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ সুদকে মূলত কোন্ বস্তুর মূল্য মনে করা হচ্ছে? ঋণদাতা নিজের অর্থের সাথে ঋণগ্রহীতাকে এমন কী বাস্তব সত্তামূলক (Substential) জিনিস দেয় যার একটি আর্থিক মূল্যও থাকে এবং মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঐ মূল্য লাভ করার অধিকারী হয়? এ জিনিসটি চিহ্নিত করার জন্য সুদ সমর্থকগণকে যথেষ্ট বেকায়দায় পড়তে হয়েছে।

একদল বলে, সে জিনিসটি হচ্ছে 'লাভবান হবার সুযোগ।' কিন্তু উপরের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, এ 'সুযোগ' কোনো নির্দিষ্ট, নিশ্চিত ও নিত্যকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল্যের স্বত্ব সৃষ্টি করে না; বরং এটি এমন এক অবস্থায় আনুপাতিক লাভের স্বত্ব দান করে, যখন প্রকৃতপক্ষে ঋণ গ্রহণকারী লাভের মুখ দেখে।

দ্বিতীয় দল সামান্য হেরফের করে বলে, সে জিনিসটি হচ্ছে 'অবকাশ'। ঋণদাতা নিজের অর্থের সাথে এ 'অবকাশ' ব্যবহারের জন্য ঋণগ্রহীতাকে দান করে। এ অবকাশের একটি মূল্য রয়েছে এবং এটি দীর্ঘ ও দীর্ঘতর হবার সাথে সাথে এর মূল্যও বেড়ে যেতে থাকে। কোনো ব্যক্তি যেদিন থেকে অর্থ নিয়ে কাজে লাগায়, সেদিন থেকে

---

* এখানে অবশ্যি আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে যে, তাহলে টাকার বিনময়ে জমি বর্গা দেয়াকে কেমন করে বৈধ গণ্য করা যায়? তার অবস্থাও সুদের সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু এ আপত্তি আসলে তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয় যারা আগাম টাকা নির্ধারিত করে জমি বর্গা দেয়। যেমন বিঘাপ্রতি ২০ টাকা বা একরপ্রতি ৫০ টাকা হিসেবে নির্ধারিত করে নেয়াকে যারা বৈধ গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে এ আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে। আমি এ নীতির সমর্থক নই। আমি নিজেও একে সুদের সাথে সামঞ্জস্যশীল মনে করি। কাজেই এ আপত্তির জবাব দেয়া আমার দায়িত্ব নয়। এ ব্যাপারে আমার নীতি হচ্ছে জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে ভাগচাষের সম্পর্কই যথার্থ। অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের কত অংশ কৃষকের ও কত অংশ জমি-মালিকের সে ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হবে। যৌথ কারবারের অংশীদারীত্বের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে। এ ধরনটিকে আমি বৈধ মনে করি। আর জমির ভাড়া সংক্রান্ত বিষয়ে যে অবস্থাটিকে আমি বৈধ মনে করি, আমার 'মাসয়ালায়ে মিলকিয়াতে যমীন' গ্রন্থে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। তার বিরুদ্ধে এ আপত্তি উত্থাপিত হয় না।

শুরু করে যেদিন ঐ অর্থের সাহায্যে প্রস্তুত দ্রব্য বাজারে পৌছে যায় এবং মূল্য আনে ঐ দিন পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত ব্যবসায়ীর নিকট অতীব মূল্যবান। সে যদি এ অবকাশ না পায় এবং মাঝপথেই তার নিকট থেকে অর্থ ফেরত নেয়া হয়, তাহলে আদতে তার ব্যবসা চলতে পারে না। কাজেই যে ব্যক্তি অর্থ ঋণ নিয়ে ব্যবসায় খাটাচ্ছে, তার নিকট এ সময়টি অবশ্যি একটি মূল্য রাখে এবং সে এ মূল্য থেকে লাভবান হচ্ছে। কাজেই অর্থদানকারী এ লাভের অংশ পাবে না কেন? আবার এ সময়ের কমবেশীর কারণে ঋণগ্রহীতার লাভের সম্ভাবনাও কমবেশী হতে থাকে। কাজে সময়ের দীর্ঘতা ও স্বল্পতার ভিত্তিতে ঋণদাতা এর মূল্য নির্ধারণ করবে না কেন?

কিন্তু এখানেও আবার ঐ একই প্রশ্ন দেখা দেয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অর্থদাতার নিকট থেকে ব্যবসায় খাটাবার জন্য অর্থ নিচ্ছে, সে নিশ্চিতরূপে ব্যবসায় লাভ করবে, ক্ষতি হবে না—একথা সে কেমন করে জানলো? উপরন্তু তার লাভও নিশ্চিতরূপে শতকরা একটি নির্দিষ্ট হারে হতে থাকবে, কাজেই তা থেকে অর্থদানকারীকে অবশ্যই শতকরা একটি নির্দিষ্ট হারে অংশ আদায় করা উচিত—একথাই বা সে জানলো কেমন করে? এ ছাড়া যে সময়ে সে ঋণগ্রহীতাকে নিজের অর্থ ব্যবহারের অবকাশ দিচ্ছে ঐ সময় প্রতিবছর ও প্রতিমাসে নিশ্চিতরূপে একটি বিশেষ পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হবে, কাজেই এর একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক বা মাসিক মূল্য স্থিরীকৃত হওয়া উচিত—এ হিসেব জানার জন্য কোন্ ধরনের যন্ত্রই বা তার নিকট আছে, তা আমাদের অবশ্যই জানা উচিত? সুদ সমর্থকদের নিকট এ প্রশ্নগুলোর কোনো সঠিক ও সংগত জবাব নেই। কাজেই আবার সে আগের কথায়ই ফিরে আসতে হয়। অর্থাৎ ব্যবসায়িক ব্যাপারে যদি কোনো জিনিস যুক্তিসঙ্গত হয়ে থাকে, তাহলে তা হচ্ছে একমাত্র লাভ ও লোকসানের ভিত্তিতে অংশীদারীত্ব, নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট হারে যে সুদ চাপিয়ে দেয়া হয় তা নয়।

গ. লাভে অংশীদারিত্ব

আর একদল বলে, মুনাফা অর্জন হচ্ছে অর্থের নিজস্ব গুণ। কাজেই কোনো ব্যক্তি যখন অন্যের সংগৃহীত অর্থ ব্যবহার করে, তখন ঐ অর্থই এমন অধিকার সৃষ্টি করে, যার ফলে অর্থদাতা সুদ চাইতে পারে এবং ঋণগ্রহীতা তা আদায় করতে বাধ্য। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সংগ্রহে সাহায্য করার শক্তি অর্থের রয়েছে। অর্থের সাহায্যে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তার সাহায্য ব্যতিরেকে সে পরিমাণ উৎপন্ন হতে পারে না। অর্থের সাহায্যে উন্নত ধরনের দ্রব্যাদি বেশী পরিমাণে তৈরী হয় এবং তা অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রী হয়; অন্যথায় দ্রব্যও কম উৎপন্ন হয়, তার মানও হয় নিম্ন এবং বাজারে ভালো দামে বিক্রিও হয় না। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, মুনাফা অর্জনের গুণ অর্থের মধ্যে সন্নিহিত রয়েছে। কাজেই কেবল অর্থের ব্যবহারই অর্থদাতার জন্য সুদ লাভের অধিকার সৃষ্টি করে।

কিন্তু অর্থ 'মুনাফা দানের' নিজস্ব গুণে গুণান্বিত প্রথমত এ দাবীটিই দ্ব্যর্থহীনভাবে ভ্রান্ত। যখন কোনো ব্যক্তি অর্থ নিয়ে কোনো ফলদায়ক কাজে লাগায় একমাত্র তখনই তার মধ্যে এ শক্তি সৃষ্টি হয়। কেবল তখনই একথা বলা যেতে পারে যে, অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তি যেহেতু অর্থ ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করছে, কাজেই এ মুনাফা থেকে অর্থদাতাকে অংশ দেয়া উচিত। কিন্তু যে ব্যক্তি রোগীর চিকিৎসা বা মৃতের কাফন দাফনের জন্য ঋণ গ্রহণ করে, তার এ অর্থ কোন্ ধরনের অর্থনৈতিক মূল্য সৃষ্টি করে, যা থেকে ঋণদাতা অংশ গ্রহণ করতে পারে?

উপরন্তু মুনাফাজনক কাজে যে অর্থ লাগানো হয়, তা সবক্ষেত্রেই নিশ্চিতরূপে অধিক মূল্য দান করে না। কাজেই মুনাফাদান অর্থের নিজস্ব গুণ—এ দাবী অর্থহীন। অনেক সময় কোনো কাজে বেশী অর্থ লাগানো হয়, কিন্তু এর ফলে মুনাফা বাড়ার পরিবর্তে কমে যায়। এমনকি, অবশেষে তাতে লোকসান দেখা দেয়। আজকাল কিছুদিন পর পর ব্যবসা জগতে যে অচলাবস্থার (CRISIS) সৃষ্টি হচ্ছে এর কারণস্বরূপ এ কথাই বলা যায় যে, পুঁজিপতিরা নিজেদের ব্যবসায়ে যখন অজস্র অর্থ ঢেলে দিতে থাকে এবং উৎপাদন বেড়ে যেতে থাকে, তখন দ্রব্যের দাম কমতে থাকে, ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে দাম এতো কমে যেতে থাকে যে, পুঁজি বিনিয়োগে কোনো প্রকার লাভের সম্ভাবনা থাকে না।

এ ছাড়াও পুঁজির মধ্যে মুনাফাদানের কোনো শক্তি যদি থেকে থাকে, তাহলে তা বাস্তব রূপ লাভ করার জন্য আরো কয়েকটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল হয়। যেমন, পুঁজি ব্যবহারকারীদের পরিশ্রম, যোগ্যতা, মেধা ও অভিজ্ঞতা ব্যবহারকালীন অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আনুকূল্য এবং সমকালীন বিপদ আপদ থেকে নিরাপত্তা লাভ। এ বিষয়গুলো এবং এ ধরনের আরো বহু বিষয় মুনাফাদানের পূর্বশর্ত। এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি শর্ত না পাওয়া গেলে অনেক সময় পুঁজির সমস্ত মুনাফাদানের ক্ষমতাই শেষ হয়ে যায়; বরং উল্‌টো লোকসানও দেখা দেয়। কিন্তু সুদী ব্যবসায়ে পুঁজি দানকারী ব্যক্তি এসব শর্ত পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে না এবং একথাও স্বীকার করে না যে, ঐ শর্তগুলোর কোনোটির অনুপস্থিতির কারণে তার পুঁজি মুনাফাদানে অক্ষম হলে, সে সুদ গ্রহণ করবে না। সে বরং উলটো দাবী করে, তার পুঁজি ব্যবহার করলেই সে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ লাভের অধিকারী হবে। তার পুঁজি বাস্তবে কোনো প্রকার মুনাফা লাভে সক্ষম হোক বা না হোক, তার এ অধিকারে কোনো পার্থক্য সূচিত হবে না।

অবশেষে যদি একথা মেনেও নেয়া যায় যে, পুঁজির মধ্যে মুনাফা দান করার ক্ষমতা রয়েছে, যার ভিত্তিতে পুঁজি দানকারী মুনাফার অংশীদার হবার অধিকার লাভ করে, তাহলেও প্রশ্ন দেখা দেয়, আপনার নিকট এমন কোনো হিসেব আছে যার ভিত্তিতে আপনি বর্তমানে পুঁজির মুনাফাদান করার ক্ষমতা নির্দিষ্ট করতে পারেন এবং যারা পুঁজি

বিনিয়োগ করে সেই ভিত্তিতে তাদের সুদের হার নির্ধারিত করতে পারেন? আর বর্তমান সময়ের জন্য কোনো হিসেবের ভিত্তিতে সুদের হার নির্ধারণ করা সম্ভবপর বলে যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলেও আমরা একথা বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম যে, ১৯৪৯ সালে যে পুঁজিপতি কোনো ব্যবসা সংস্থাকে ১০ বছর মেয়াদে এবং অন্য একটি সংস্থাকে ২০ বছর মেয়াদে তৎকালীন প্রচলিত হারে সুদীঋণ দিয়েছিলেন, তিনি কিসের ভিত্তিতে একথা জানতে পেরেছিলেন যে, পরবর্তী ১০ ও ২০ বছরে পুঁজির মুনাফা দানের ক্ষমতা অবশ্যই ১৯৪৯ সালের পর্যায়েই থাকবে? বিশেষ করে যখন ১৯৫৯ সালে বাজারে সুদের হার ১৯৪৯ সালের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং ১৯৬৯ সালে তার থেকেও আলাদা হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি একটি সংস্থার সাথে দশ বছরের এবং অন্য একটি সংস্থার সাথে বিশ বছরের চুক্তি করে তাদের নিকট থেকে ১৯৪৯ সালের হার অনুযায়ী নিজের পুঁজির সম্ভাব্য মুনাফার অংশ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন, তাকে আমরা কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে এ অধিকার দান করবো?

ঘ. সময়ের বিনিময়

সর্বশেষ ব্যাখ্যায় একটু বেশী বুদ্ধি প্রয়োগ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দূরের ও ভবিষ্যতের লাভ ও আনন্দের উপর নিকটের ও উপস্থিত লাভ, আনন্দ, স্বাদ ও তৃপ্তিকে অগ্রাধিকার দান করে। ভবিষ্যত যতই দূরবর্তী হয় তার লাভ ও স্বাদ ততই সংশয়পূর্ণ হয় এবং সে অনুপাতে মানুষের দৃষ্টিতে তার মূল্যও কমে যায়। এ নিকটবর্তীর অগ্রাধিকার ও দূরবর্তীর পিছিয়ে পড়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে যেমন ঃ

এক ঃ ভবিষ্যত অন্ধকারের গর্ভে জীবন অনিশ্চিত। কাজেই ভবিষ্যতের লাভ সংশয়পূর্ণ। এর কোনো চিত্রও মানুষের চিন্তাজগতে সুস্পষ্ট নয়। বিপরীতপক্ষে আজকের নগদ লাভ নিশ্চিত। মানুষ স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষও করছে।

দুই ঃ যে ব্যক্তি বর্তমানে কোনো বিষয়ের অভাব অনুভব করছে বর্তমানে তা পূর্ণ হওয়া, ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে পূর্ণ হওয়ার চেয়ে, অনেক বেশী মূল্যবান বিবেচিত হবে, যখন হয়তো সে ঐ বিষয়ের অভাব অনুভব করবে না বা হয়তো অনুভব করতেও পারে।

তিন ঃ যে অর্থ বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে তা কার্যত প্রয়োজনীয় ও কার্যোপযোগী। এ প্রেক্ষিতে তা ঐ অর্থের উপর অগ্রাধিকার রাখে যা আগামীতে কোনো সময়ে অর্জিত হবে।

এসব কারণে আজকের নগদ লাভ ভবিষ্যতের অনিশ্চিত লাভের উপর অগ্রাধিকার রাখে। কাজেই যে ব্যক্তি আজ কিছু অর্থ ঋণ নিচ্ছে, তা অনিবার্যরূপে, আগামীকাল সে ঋণদাতাকে যে অর্থ আদায় করবে, তার চেয়ে বেশী মূল্য পাবার অধিকারী। এ বাড়তি

মূল্যটুকুই হচ্ছে সুদ। ঋণ দেবার সময় ঋণদাতা তাকে যে অর্থ দিয়েছিল, আদায় করার সময় বাড়তি মূল্যস্বরূপ ঐ সুদ আসল অর্থের সাথে মিশে, তার সমান মূল্যে পৌঁছিয়ে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ বিষয়টিকে নিম্নোক্তরূপে অনুধাবন করা যায় ঃ এক ব্যক্তি মহাজনের নিকট গিয়ে একশো টাকা ঋণ চাইলো। মহাজন তার সাথে চুক্তি করলো যে, আজ সে যে ১০০ টাকা দিচ্ছে, এক বছর পর এর পরিবর্তে তাকে ১০৩ টাকা দিতে হবে। এ ব্যাপারে আসলে বর্তমানের ১০০ টাকার বিনিময় মূল্য হচ্ছে ভবিষ্যতের ১০৩ টাকা। বর্তমানের অর্থ ও ভবিষ্যতের অর্থের মনস্তাত্বিক (অর্থনৈতিক নয়) মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তা বাড়তি ৩ টাকার সমান। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ৩ টাকা এক বছর পর আদায়কৃত ১০০ টাকার সাথে যুক্ত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মূল্য ঋণ প্রদান কালে ঋণদাতা প্রদত্ত ১০০ টাকার সমান হবে না।

যে সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার তারীফ না করে পারা যায় না। কিন্তু এখানে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মনস্তাত্বিক মূল্যের যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে, তা আসলে একটি বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সত্যিই কি মানব প্রকৃতি বর্তমানকে ভবিষ্যতের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান মনে করে? তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে অধিকাংশ লোক তাদের সকল উপার্জন আজই ব্যয় করা সংগত মনে করে না কেন? বরং তার একটি অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা পছন্দ করে কেন? সম্ভবত শতকরা একজন লোকও আপনি পাবেন না, যে ভবিষ্যতের চিন্তা শিকেয় তুলে রেখে বর্তমানের আয়েশ-আরাম ও স্বাদ-আহলাদ পূরণ করার জন্য সমুদয় অর্থ দু'হাতে খরচ করাকে অগ্রাধিকার দেবে। অন্ততপক্ষে শতকরা ৯৯ জন লোকের অবস্থা এই যে, তারা আজকের প্রয়োজন অপূর্ণ রেখে আগামীকালের জন্য কিছু না কিছু সঞ্চয় করে রাখতে চায়। কারণ ভবিষ্যতে যেসব ঘটনা সংঘটিত হবে এবং মানুষকে যেসব প্রয়োজনের সম্মুখীন হতে হবে, তন্মধ্যে অনেক সম্ভাব্য ঘটনা ও প্রয়োজনের কাল্পনিক চিত্র মানুষের মানস চোখে ভাসতে থাকে। বর্তমানে যে যে প্রয়োজন মিটিয়ে চলছে ও যে অবস্থার সাথে কোনো না কোনোক্রমে যুঝছে সেগুলোর চেয়ে ঐ সম্ভাব্য ঘটনা ও প্রয়োজনগুলো তার নিকট অনেক বেশী বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। উপরন্তু বর্তমানেও মানুষ যেসব প্রচেষ্টা ও সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে এগুলোরও উদ্দেশ্য তার নিজের উন্নততর ও অধিকতর ভালো ভবিষ্যত ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে? মানুষ আগামী দিনে ভালোভাবে জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যেই তো আজ শ্রম মেহনত করে যাচ্ছে। এমন কোনো নিরেট বোকার সন্ধান পাওয়াও কষ্টকর হবে, যে নিজের ভবিষ্যতকে শ্রীহীন ও দুঃখ দারিদ্র্যে পর্যুদস্ত অথবা কমপক্ষে বর্তমানের তুলনায় শ্রীহীন করার বিনিময়ে নিজের বর্তমানকে সুখী সমৃদ্ধিশালী করা পছন্দ করবে। মূর্খতা অজ্ঞতার কারণে মানুষ এমনটি করতে পারে অথবা কোনো সাময়িক ইচ্ছা কামনার আবেগে অভিভূত হয়ে এহেন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভপর; কিন্তু ভেবে-চিন্তে,

বিচার-বিবেচনা করে কেউ এ কাজ করতে পারে না, অন্তত একে নির্ভুল ও যক্তিসংগত বিবেচনা করতে পারে না।

মানুষ বর্তমানের নিশ্চয়তার বিনিময়ে ভবিষ্যতের ক্ষতি বরদাশত করে নেয়, কিছুক্ষণের জন্য এ দাবীর যথার্থতা স্বীকার করে নিলেও, এ দাবীর ভিত্তিতে যে কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে তা কোনোক্রমেই যথার্থ প্রমাণিত হয় না। ঋণ গ্রহণকালে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তাতে বর্তমানের ১০০ টাকার দাম এক বছর পরের ১০৩ টাকার সমান ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু আজ একবছর পর ঋণগ্রহীতা যখন ঋণ আদায় করতে গেলো তখন প্রকৃত অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌছেছে? এখন বর্তমানের ১০৩ টাকা অতীতের ১০০ টাকার সমান হয়ে গেছে। আর যদি প্রথম বছর ঋণগ্রহীতা ঋণ আদায় করতে সক্ষম না হয় তাহলে দ্বিতীয় বছরের শেষে দু'বছর আগের ১০০ টাকার দাম বর্তমানের ১০৬ টাকার সমান হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে অর্থের মূল্য ও মান নিরূপণের ক্ষেত্রে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এ অনুপাত কি যথার্থ ও নির্ভুল? সত্যিই কি অতীত যতই পুরাতন হতে থাকে বর্তমানের তুলনায় তার দাম ততই বাড়তে থাকে? সত্যিই কি অতীতের প্রয়োজনগুলোর পূর্ণতা এতবেশী মূল্যবান যার ফলে দীর্ঘকাল পূর্বে আপনি যে অর্থ পেয়েছিলেন এবং যা খরচ করার পর বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, তা কালের প্রতিটি মুহূর্ত অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে বর্তমানের অর্থের চেয়ে বেশী মূল্যবান হয়ে যাচ্ছে; এমনকি, একশো টাকা খরচ করার পর যদি পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে তার দাম হবে আড়াইশো টাকার সমান?

সুদের হারের যৌক্তিকতা

বুদ্ধি ও ন্যায়নীতির দিক থেকে সুদকে বৈধ ও সংগত প্রমাণ করার জন্য সর্বসাকুল্যে উপরোক্ত যুক্তিগুলোই পেশ করা হয়। আমাদের ইতিপূর্বেকার আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যুক্তির সাথে এ নাপাক বস্তুটির কোনো দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। সুদ দেয়া-নেয়ার স্বপক্ষে কোনো শক্তিশালী যুক্তিও পেশ করা যেতে পারে না। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এমনিতর একটি অযৌক্তিক বস্তুকে পাশ্চাত্যের পণ্ডিত প্রবর ও চিন্তাশীলগণ সম্পূর্ণ স্বীকৃত ও সুস্পষ্ট বস্তু হিসেবে গণ্য করে নিয়েছেন এবং সুদের যৌক্তিকতাকে যেন একটি স্থিরীকৃত সর্বজনস্বীকৃত সত্য মনে করে সমস্ত আলোচনা সুদের 'ন্যায়সঙ্গত' হার নির্ধারণের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুদ সম্পর্কিত আলোচনার কোথাও সুদ দেয়া-নেয়ার যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতার প্রসংগ দেখা যাবে না; বরং 'সুদের অমুক হারটি অযৌক্তিক ও সীমাতিরিক্ত' কাজেই তা আপত্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য এবং অমুক হারটি 'ন্যায়সঙ্গত' কাজেই তা গ্রহণযোগ্য, এ বিতর্কের মধ্যেই সমস্ত আলোচনা আবর্তিত।

কিন্তু সত্যিই কি সুদের কোনো ন্যায়সঙ্গত হার আছে? যে বস্তুটির নিজের ন্যায়সঙ্গত হবার কোনো প্রমাণ নেই, তার হার যুক্তিসঙ্গত, না অযৌক্তিক, এ প্রসঙ্গ অবতারণার অবকাশ কোথায়? কিছুক্ষণের জন্য আমরা এ আলোচনা না হয় স্থগিতই রাখলাম। এ প্রশ্ন বাদ দিয়ে আমরা মাত্র এতটুকু জানতে চাই, সুদের স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত হার কোন্‌টি? কোনো হারের ন্যায়সঙ্গত ও অন্যায় হবার মাপকাঠি কি? সত্যিই কি বিশ্বজোড়া সুদী ব্যবসায়ে কোনো যুক্তিসঙ্গত (Rational) ভিত্তিতে সুদের হার নির্ধারণ করা হচ্ছে?

এ প্রশ্নের ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে আমরা আবিষ্কার করেছি দুনিয়ায় 'ন্যায়সঙ্গত সুদের হার' নামক কোনো জিনিসের অস্তিত্বই কোনোদিন ছিল না। বিভিন্ন হারকে বিভিন্ন যুগে ন্যায়সঙ্গত গণ্য করা হয়েছে এবং পরে আবার সেগুলোকেই অন্যায় ও অসংগত ঘোষণা করা হয়েছে। বরং একই যুগে বিভিন্ন স্থানের ন্যায়সঙ্গত হারের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেছে। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দু অর্থনীতিবিদ কৌটিল্যের বর্ণনা অনুযায়ী প্রাচীন হিন্দুযুগে বছরে শতকরা ১৫ থেকে ৬০ ভাগ সুদ ন্যায়সঙ্গত মনে করা হতো এবং বিপদাশংকা অত্যধিক হলে এ হার আরও বাড়ানো যেতো। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ও উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় করদ রাজ্যগুলো একদিকে নিজেদের দেশীয় মহাজনবৃন্দ ও অন্যদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকারের সাথে যে আর্থিক লেন-দেন করতো তাতে সাধারণত বার্ষিক শতকরা ৪৮ ভাগ সুদের হারের প্রচলন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯১৪-১৮) ভারত সরকার বার্ষিক শতকরা সাড়ে ৬ ভাগ সুদের ভিত্তিতে যুদ্ধঋণ লাভ করেছিল। ১৯২০ ও ১৯৩০ এর মধ্যবর্তী সময়ে সমবায় সমিতিগুলোর সাধারণ সুদের হার ছিল শতকরা ১২ থেকে ১৫ ভাগ। ১৯৩০ ও ১৯৪০ এর আমলে দেশের আদালতগুলো বার্ষিক শতকরা ৯ ভাগের কাছাকাছি সুদকে ন্যায়সঙ্গত গণ্য করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ডিসকাউন্ট রেট বার্ষিক শতকরা ৩ ভাগ নির্ধারিত হয়েছিল এবং সমগ্র যুদ্ধকালে এ হার বর্তমান ছিল; বরং শতকরা পৌনে তিন ভাগ সুদেও ভারত সরকার ঋণ লাভ করেছিল।

এ তো গেলো আমাদের এ উপমহাদেশের অবস্থা। ইউরোপের দিকে তাকালে সেখানেও প্রায় একই ধরনের চিত্র দেখা যাবে। ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইল্যাণ্ডে শতকরা ১০ ভাগ সুদের হারকে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত গণ্য করা হয়েছিল। ১৯২০ সালের কাছাকাছি সময়ে ইউরোপের অনেক সেন্ট্রাল ব্যাংক শতকরা ৮/৯ ভাগ সুদ নির্ধারণ করতো। এ আমলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (LEAGUE OF NATIONS) মাধ্যমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যে ঋণ লাভ করেছিল, তার হারও ছিল অনুরূপ। কিন্তু আজ আমেরিকা ও ইউরোপের কোনো বক্তির নিকট সুদের এ হারের কথা বললে সে চিৎকার করে বলতে থাকবে, এটা সুদ নয়, লুটতরাজ। আজ যেদিকে তাকান শতকরা আড়াই

ও ৩ ভাগ সুদের পসরা দেখতে পাবেন। শতকরা ৪ ভাগ হচ্ছে আজকের সর্বোচ্চ হার। আবার কোনো কোনো অবস্থায় ১ ও $\frac{১}{২}$ বা $\frac{১}{৪}$ ভাগ সুদও দেখা যায়। কিন্তু অন্যদিকে দরিদ্র জনসাধারণকে সুদী ঋণদানকারী মহাজনদের জন্য ইংল্যান্ড ১৯২৭ সালে মানি লেন্ডারস এ্যাক্টের মাধমে শতকরা ৪৮ ভাগ সুদ বৈধ গণ্য করেছে। আমেরিকার আদালতগুলো সুদখোর মহাজনদের জন্য বার্ষিক শতকরা ৩০ থেকে ৬০ ভাগ সুদ গ্রহণ করার অনুমতি দান করেছে। এখন আপনি নিজেই বলুন, এর মধ্যে কোন্ হারটি স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত?

আর একটু অগ্রসর হয়ে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, সত্যিই কি সুদের কোনো স্বাভাবিক ও ন্যায়সংগত হার হতে পারে? এ প্রশ্নটি পর্যালোচনা করলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, সুদের হার কেবলমাত্র এমন অবস্থায় সঙ্গতভাবে নির্ধারিত হতে পারে, যখন ঋণগ্রহীতা তার ঋণলব্ধ অর্থ থেকে যে মুনাফা অর্জন করে তার মূল্য নির্ধারিত থাকতো (বা করা যেতো)। যেমন এক বছর পর্যন্ত ১০০ টাকা ব্যবহার করলে তা থেকে ২৫ টাকা মুনাফা লাভ করা যায়, একথা যদি নির্ধারিত হয়ে যায়, তাহলে এ সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় যে, যে ব্যক্তির অর্থ সারাটা বছর ব্যবহার করে এ মুনাফা অর্জিত হলো, সে এ মুনাফা থেকে ৫ টাকা বা আড়াই টাকা অথবা সোয়া এক টাকা পাওয়ার স্বাভাবিক ও ন্যায়সংগত অধিকার রাখে। কিন্তু বলাবাহুল্য, এভাবে যে অর্থ ব্যবহার করা হয়, তার মুনাফা কোনোদিন নির্ধারিত হয়নি এবং হতেও পারে না। উপরন্তু বাজারে সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কখনো ঋণগ্রহীতা ঋণলব্ধ অর্থ থেকে কি পরিমাণ মুনাফা লাভ করছে; এমনকি, কোনো মুনাফা লাভ করছে কিনা, সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয় না। এক্ষেত্রে কার্যত যা কিছু হয় তা হচ্ছে, মহাজনী ব্যবসায়ে ঋণগ্রহীতার অলসতার প্রেক্ষিতে ঋণের মূল্য নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে বাণিজ্যিক সুদের বাজারে ভিন্নতার ভিত্তিতে সুদের হারের উঠানামা হতে থাকে। বুদ্ধি, যুক্তি ও ন্যায়নীতির সাথে এর কোনো দূরতম সম্পর্কও থাকে না।

সুদের হার নির্ধারণের ভিত্তি

মহাজনী ব্যবসায়ে একজন মহাজন সাধারণত দেখে, যে ব্যক্তি ঋণ নিতে এসেছে, সে কত গরীব, ঋণ না পেলে তার দুঃখ ও দুর্দশা কি পরিমাণ বাড়বে? সাধারণত এসবের ভিত্তিতে সে তার সুদের হার পেশ করে। যদি সে কম গরীব হয়, কম টাকা চায় এবং তাকে বাহ্যত বেশী পেরেশান ও চিন্তাকুল না দেখায় তাহলে তার সুদের হার হবে কম। বিপরীতপক্ষে ঋণপ্রার্থী যতই দুর্দশাগ্রস্ত ও বেশী অভাবী হবে, ততই তার সুদের হার বাড়তে থাকবে। এমনকি কোনো অর্ধাহারে অনাহারে দিন যাপনকারী ব্যক্তির পুত্র যদি কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর্যায়ে উপনীত হয়, তাহলে তার জন্য সুদের হার শতকরা চার-পাঁচশো পর্যন্ত পৌছে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক বা

বিস্ময়কর নয়। এ অবস্থায় সুদের 'স্বাভাবিক' হার প্রায়ই এ ধরনের হয়ে থাকে। এর একটি চরমতম দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে ১৯৪৭ সালে অমৃতসর স্টেশনের একটি ঘটনায়। সে বছর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভীতিপ্রদ দিনগুলোতে একদা অমৃতসর স্টেশনে জনৈক শিখ একজন মুসলমানের নিকট থেকে এক গ্লাস পানির 'স্বাভাবিক' মূল্য হিসেবে ৩০০ টাকা আদায় করে। কারণ ঐ মুসলমানের পুত্র পিপাসায় মরে যাচ্ছিল এবং শরণার্থীদের ট্রেন থেকে নীচে নেমে কোনো মুসলমানের পক্ষে পানি আহরণ করা সম্ভবপর ছিল না।

মহাজনী ব্যবসা ছাড়া অর্থনীতির অন্যান্য বাজারে সুদের হার নির্ধারণ ও তা কমবেশী করার ব্যাপারে যেসব ভিত্তির আশ্রয় নেয়া হয় সেগুলো সম্পর্কে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ দুটি ভিন্ন মতের অনুসারী।

একদল বলেন, চাহিদা ও সরবরাহের নীতিই হচ্ছে এর ভিত্তি। যখন অর্থ বিনিয়োগকারীর সংখ্যা কম হয় ও ঋণ দেয়ার মতো অর্থের পরিমাণ বেড়ে যায়, তখন সুদের হার নেমে যায়। এভাবে সুদের হার অনেক বেশী কমে গেলে লোকেরা একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে এবং বেশী সংখ্যক লোক ঋণ নিতে এগিয়ে আসে। অতঃপর যখন অর্থের চাহিদা বাড়তে থাকে এবং ঋণ দেয়ার মতো অর্থের পরিমাণ কমে যেতে থাকে, তখন সুদের হার বাড়তে থাকে, অবশেষে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে, যার ফলে ঋণ গ্রহণের চাহিদা খতম হয়ে যায়।

এর অর্থ কি? পুঁজিপতি সোজাসুজি ও যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসায়ে অংশীদার হয় না এবং তার যথার্থ মুনাফার ন্যায়সঙ্গত অংশ গ্রহণেও রাজী হয় না। বিপরীতপক্ষে সে এক্ষেত্রে আন্দাজ-অনুমান করে দেখে, এ ব্যবসায়ে ব্যবসায়ী কি পরিমাণ মুনাফা অর্জন করবে, সে প্রেক্ষিতে সে নিজের সুদ নির্ধারণ করে এবং মনে করে এ নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ তার পাওয়া উচিত। অন্যদিকে ব্যবসায়ীও আন্দাজ-অনুমান করে দেখে যে, পুঁজিপতির নিকট থেকে সে যে অর্থ নিচ্ছে, তা থেকে সর্বাধিক কি পরিমাণ মুনাফা লাভ করা সম্ভব হবে, কাজেই সে প্রেক্ষিতে সে একটি বিশিষ্ট পরিমাণের অধিক সুদকে অসংগত মনে করে। উভয় পক্ষই আন্দাজ-অনুমানের (SPECULATION) ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। পুঁজিপতি হামেশা ব্যবসায়ে মুনাফার অংক বেশী করেই ধরে, আর ব্যবসায়ী লাভের সাথে সাথে লোকসানের আশংকাও সামনে রাখে। এ কারণে উভয়ের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। ব্যবসায়ী যখন মুনাফা লাভের আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করতে চায়, পুঁজিপতি তখন নিজের পুঁজির দাম বাড়াতে থাকে। এভাবে দাম বাড়াতে বাড়াতে অবশেষে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে, যখন এ ধরনের চড়া সুদে অর্থ ঋণ নিয়ে কোনো ব্যবসায় খাটালে তাতে কোনো প্রকারেই মুনাফার সম্ভাবনা থাকে না। এ পর্যায়ে পুঁজি বিনিয়োগের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং অর্থনৈতিক উন্নতির গতিধারায় অকস্মাৎ ভাটা পড়ে। অতঃপর যখন সমগ্র ব্যবসাজগত পরিপূর্ণ মন্দাভাবে আচ্ছন্ন হয়ে

পড়ে এবং পুঁজিপতি নিজের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করতে থাকে, তখন সে সুদের হার এতদূর কমিয়ে দেয়, যার ফলে ঐ হারে অর্থ বিনিয়োগে ব্যবসায়ী লাভের আশা করে। এ সময় শিল্প-বাণিজ্যের বাজারে পুনর্বার অর্থ সমাগম হতে থাকে। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, পুঁজি ও ব্যবসায়ের মধ্যে যদি ন্যায়সঙ্গত শর্তে অংশীদারীত্বমূলক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে, দুনিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি সুসামঞ্জস্য পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো। কিন্তু আইন যখন পুঁজিপতির জন্য সুদের ভিত্তিতে ঋণদান করার পথ প্রশস্ত করলো, তখন পুঁজি ও ব্যবসায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে জুয়াড়ি মনোবৃত্তির অনুপ্রবেশ ঘটলো এবং এমন জুয়াড়ি পদ্ধতিতে সুদের হার উঠানামা করতে থাকলো, যার ফলে সারা দুনিয়ার অর্থনেতিক ক্ষেত্রে একটা চিরস্থায়ী অলাবস্থার সৃষ্টি হলো।

দ্বিতীয় দলটি নিম্নোক্তভাবে সুদের হারের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে। তাদের বক্তব্য হলো ঃ পুঁজিপতি যখন পুঁজি কাজে লাগানো অধিক পছন্দ করে, তখন সুদের হার বাড়িয়ে দেয়, আবার যখন তার এ ইচ্ছায় ভাটা পড়ে, তখন সুদের হারও কমে যায়। তবে পুঁজিপতি নগদ অর্থ তার নিজের কাছে রাখাকে অগ্রাধিকার দেয় কেন? এর জবাবে তারা বিভিন্ন কারণ দর্শায়। নিজের ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনের খাতে কিছু অর্থ রাখার প্রয়োজন হয়। আবার আকস্মিক প্রয়োজন ও অপ্রত্যাশিত অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যও কিছু অর্থ সংরক্ষিত রাখতে হয়। যেমন, ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনো অস্বাভাবিক খরচ অথবা হঠাৎ সুবিধাজনক সওদার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া। এ দু'টি কারণ ছাড়া তৃতীয় একটি এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই যে ভবিষ্যতে কোনোদিন যখন দাম কমবে বা সুদের হার চড়ে যাবে, তখন এ সুযোগ থেকে লাভবান হবার জন্য পুঁজিপতি তার নিকট যথেষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা সঞ্চিত রাখতে চায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব কারণে অর্থকে নিজের ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য পুঁজিপতির মনে যে আকাঙক্ষার উদ্রেক হয়, তা কি বাড়ে কমে? সুদের হার উঠানামা করার সময় কি তার প্রভাব সুস্পষ্ট হয়? এর জবাবে তারা বলে ঃ অবশ্যি বিভিন্ন ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে কখনো এ আকাংখা বেড়ে যায়, ফলে পুঁজিপতি সুদের হার বাড়িয়ে দেয় এবং ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যেতে থাকে। আবার কখনো এ আকাংখা কমে যায়, তখন পুঁজিপতি সুদের হার কমিয়ে দেয়; ফলে শিল্প-বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে লোকেরা বেশী করে ঋণ নিতে থাকে।

এ মনোহর যুক্তি ও ব্যাখ্যাটির অন্তরালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, ঘরোয়া প্রয়োজন বা ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক প্রয়োজন, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক সব ধরনের অবস্থায় পুঁজিপতি নিজের জন্য যে পরিমাণ পুঁজিকে ব্যবহার উপযোগী রাখতে চায়, তার পরিমাণ হতে পারে, বড় জোর, শতকরা পাঁচ ভাগ। কাজেই প্রথম কারণ দু'টিকে অযথা গুরুত্ব দেয়ার কোনো অর্থ হয় না। পুঁজিপতি যে কারণে নিজের শতকরা ৯৫

ভাগ পুঁজিকে কখনো সিন্দুকে ভরে রাখে, আবার কখনো ঋণ দেয়ার জন্য বাজারে ছাড়ে, তা অবশ্যি তৃতীয় একটি কারণ। এ কারণটির বিশ্লেষণ করলে যে সত্য বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে, পুঁজিপতি নিজের দেশ ও জাতির অবস্থাকে অত্যন্ত স্বার্থগৃধ্নুতার দৃষ্টিতে অবলোকন করতে থাকে। এ সময় নিজের স্বার্থ চরিতার্থতার কিছু লক্ষণ তার সম্মুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠলে তার ভিত্তিতে সে এমন সব অস্ত্র নিজের কাছে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে চায়, যেগুলোর সাহায্যে সমাজের বিভিন্ন সংকট, সমস্যা ও বিপদ-আপদকে ব্যবহার করে সেগুলো থেকে অবৈধ সুবিধা ভোগ করা যায় এবং সমাজের উদ্বেগ-আকুলতা বৃদ্ধি করে নিজের সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা বাড়ানো সম্ভব হয়। এজন্য জীবন জুয়ায় একটা বড় রকমের দাঁও মারার উদ্দেশ্যে সে পুঁজি নিজের জন্য আটক রাখে এবং সুদের হার বাড়িয়ে দেয়, শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে অর্থের প্রবাহ হঠাৎ বন্ধ করে দেয় এবং সমাজের জন্য ডেকে আনে এক মহাবিপদ, যাকে 'মন্দা' (DEPRESSION) বলা হয়ে থাকে। অতঃপর যখন সে দেখে, এ পথে তার পক্ষে হারাম উপায়ে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা সম্ভব তা সে করে ফেলেছে এবং এভাবে অর্থ উপার্জন করা তার পক্ষে আর কোনোক্রমেই সম্ভব নয়; বরং এখন তার ক্ষতির পালা শুরু হয়ে যাবে, তখন তার নীচ মনের অভ্যন্তরে 'অর্থকে নিজের জন্য ব্যবহার উপযোগী রাখার ইচ্ছা' নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং কম সুদের লোভ দেখিয়ে সে ব্যবসায়ীদের তার নিকট রক্ষিত অর্থসম্পদ কাজে লাগাবার জন্য ব্যাপকভাবে আহবান জানায়।

আধুনিক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ সুদের হারের এ দুটি কারণই দর্শিয়ে থাকেন। অবশ্য স্ব স্ব পরিমন্ডলে এ দু'টি কারণ যথার্থ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এর মধ্যে যে কারণটিই যথার্থ হোক না কেন, তা থেকে সুদের 'ন্যায়সঙ্গত' ও 'স্বাভাবিক' হার নির্ধারিত হয় বা হতে পারে কেমন করে? এক্ষেত্রে হয় আমাদেরকে বুদ্ধি, জ্ঞান, ন্যায়ানুগতা ও স্বাভাবিকতার অর্থ ও ধারণা বদলাতে হবে, নতুবা একথা মেনে নিতে হবে যে, সুদ জিনিসটি নিজেই যে ধরনের অন্যায়, তার হারও তার চেয়ে বেশী অন্যায় ও অসংগত কারণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় ও ওঠা-নামা করে।

সুদের অর্থনৈতিক 'লাভ ও তার প্রয়োজন'

সুদ সমর্থকগণ সুদকে একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন এবং ধারণা করছেন যে, এর সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা অনেক কিছু অর্থনৈতিক লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবো। এ দাবীর সমর্থনে যেসব যুক্তি পেশ করা হয়, সেগুলোর সারাংশ নীচে প্রদত্ত হলো ঃ

এক ঃ অর্থনীতির সমস্ত কাজ কারবার পুঁজি সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল। আর নিজেদের প্রয়োজন ও আশা আকাংখার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং আয়ের সমগ্র অংশকে নিজেদের জন্য ব্যয় না করে এর কিছু অংশ সঞ্চয় করা ছাড়া এ পুঁজি

সংগ্রহ সম্ভবপর নয়। পুঁজি সংগ্রহের এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি তার ইচ্ছা-বাসনা ত্যাগ ও আত্মসংযমের কোনো প্রতিদান না পায়, তাহলে সে নিজের প্রয়োজন অপূর্ণ রাখতে ও সম্পদের স্বল্প ব্যবহার করতে উদ্যোগী হবে কেন? এ সুদই তার সেই প্রতিদান। এরই আশায় বুক বেঁধে মানুষ অর্থ বাঁচাতে ও সঞ্চয় করতে প্রবৃত্ত হয়। কাজেই এ সুদকে হারাম গণ্য করা হলে আসলে উদ্বৃত্ত অর্থ সংরক্ষণের পথই রুদ্ধ হয়ে যাবে। অথচ এটিই হচ্ছে পুঁজি সংগ্রহ ও সরবরাহের আসল মাধ্যম।

দুই ঃ সকল মানুষের জন্য নিজের সঞ্চিত সম্পদ সুদের ভিত্তিতে ব্যবসায়ে খাটাবার পথ উন্মুক্ত থাকাই হচ্ছে অর্থনৈতিক কায়-কারবারের দিকে পুঁজি প্রবাহিত হওয়ার সহজতম উপায়। এভাবে সুদের লোভেই তারা অর্থ সঞ্চয় করতে থাকে, আবার সুদের লালসাই তাদেরকে নিজেদের সঞ্চিত অর্থ, অযথা জমা না রেখে, উৎপাদনশীল করার জন্য ব্যবসায়ীর হাতে সোপর্দ করে, একটি নির্ধারিত হার অনুযায়ী সুদ আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ দুয়ারটি বন্ধ করার অর্থ হবে, কেবলমাত্র পুঁজি সঞ্চয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা শক্তিরই বিলুপ্তি নয়, বরং সামান্য যা কিছু সংগৃহীত হবে তাও ব্যবসায়ে খাটানো যাবে না।

তিন ঃ সুদ কেবল পুঁজি সংগ্রহ করে একে ব্যবসায়ের দিকে টেনে আনে না, বরং তার অলাভজনক ও অনুপকারী ব্যবহারেরও পথরোধ করে। আর সুদের হার এমন একটি বস্তু যা সর্বোত্তম পদ্ধতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন প্রস্তাবিত ব্যবসায়ের মধ্য থেকে সবচেয়ে লাভজনক ও মুনাফাদায়ক ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে। এছাড়া দ্বিতীয় এমন কোনো ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়নি, যা বিভিন্ন কার্যকর পরিকল্পনার মধ্য থেকে লাভজনক পরিকল্পনাকে অলাভজনক থেকে এবং অধিক লাভজনককে কম লাভজনক থেকে আলাদা করে অধিক লাভজনকের দিকে পুঁজিকে পরিচালিত করতে পারে। কাজেই সুদের বিলোপ সাধনের ফলে প্রথমত লোকদের অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে পুঁজি ব্যবহার করতে দেখা যাবে, অতঃপর লাভক্ষতির বাছবিচার না করে লাভজনক অলাভজনক সব রকম কাজে তারা পুঁজি বিনিয়োগ করতে থাকবে।

চার ঃ ঋণ মানুষের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের অংগীভূত। ব্যক্তির নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে এর প্রয়োজন দেখা দেয়, ব্যবসায়ী প্রায়ই এর মুখাপেক্ষী থাকে এবং সরকারী কাজকর্মও এর সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। নিছক দান খয়রাত হিসেবে এত ব্যাপকভাবে ও বিপুলাকারে ঋণ সরবরাহ করা কেমন করে সম্ভব? যদি পুঁজিপতিদেরকে সুদের লোভ দেখানো না হয় এবং মূলধনের সাথে সাথে সুদটাও তারা নিয়মিতভাবে পেতে থাকবে, এ নিশ্চয়তা তাদেরকে দান না করা হয়, তাহলে তারা খুব কমই ঋণ দিতে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে ঋণ দেয়া বন্ধ হয়ে গেলে সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের উপর

এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। এক দরিদ্র ব্যক্তি নিজের দুঃসময়ে মহাজনের নিকট থেকে ঋণ লাভ করে। এক্ষেত্রে সুদের লোভ না থাকলে তার আত্মীয়ের লাশ বিনা কাফন দাফনে পড়ে থাকবে এবং কেউ তার দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে না। এক ব্যবসায়ী নিজের দৈন্য ও সংকটকালে প্রয়োজনের সাথে সাথেই সুদে ঋণ লাভ করে এবং এভাবে তার কাজ চলতে থাকে। এ দুয়ারটি বন্ধ হয়ে গেলে কতবার যে সে দেউলিয়া হবে তা কল্পনাই করা যায় না। রাষ্ট্রের ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়। সুদী ঋণের সাহায্যেই রাষ্ট্রের প্রয়োজন পূর্ণ হয়। অন্যথায় প্রতিদিন তাকে কোটি কোটি টাকা ঋণ দান করবে এমন দাতা হাতেম কোথায় পাওয়া যাবে?

সুদ কি যথার্থ প্রয়োজনীয় ও উপকারী?

এবার আমরা উপরোল্লিখিত 'লাভ' ও 'প্রয়োজনগুলো' বিশ্লেষণ করে দেখবো, এগুলো যথার্থই লাভ ও প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত কিনা অথবা নিছক শয়তানী প্রতারণা।

এ ব্যাপারে প্রথম ভুল ধারণা হচ্ছে, অর্থনৈতিক জীবনের জন্য ব্যক্তির স্বল্প ব্যয় ও অর্থ সঞ্চয়কে একটি প্রয়োজনীয় ও লাভজনক বিষয় মনে করা হয়েছে। অথচ আসল ব্যাপার এর সম্পূর্ণ উল্টো। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূল অন্যত্র প্রোথিত রয়েছে। মানুষের একটি দল সমষ্টিগতভাবে জীবন যাপনের যেসব উপকরণ তৈরী করতে থাকবে তা অতি দ্রুত বিক্রী হতে থাকবে, এর ফলে পণ্য উৎপাদন ও বাজারের চাহিদা পূরণের কাজ চক্রাকারে ভারসাম্য বজায় রেখে দ্রুততার সাথে চলতে থাকবে। এভাবেই অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি আসতে পারে। এ অবস্থা কেবল তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন লোকেরা সাধারণভাবে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও কর্মরত অবস্থায় যে পরিমাণ ধনসম্পদ তাদের অংশে আসে তা ব্যয় করতে অভ্যস্ত হয় এবং এতটা প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হয়, যার ফলে তাদের নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা হয়ে গেলে দলের অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবান লোকদের নিকট তা হস্তান্তর করে, ফলে তারাও অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে নিজেদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে পারে। কিন্তু এর বিপরীত পক্ষে এখানে যা শিখানো হচ্ছে তা হচ্ছে এই যে, যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ পৌঁছে গেছে তাকে কৃপণতা অবলম্বন করতে হবে (যাকে আত্মসংযম ও ইচ্ছা বাসনার কোরবানী প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে), নিজের সংগত প্রয়োজনের একটা বড় অংশ পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বেশী বেশী করে অর্থ সঞ্চয় করার চেষ্টা করতে হবে। এর ফলে পুঁজি একত্রিত হয়ে শিল্প ও ব্যবসার উন্নতি বিধানে নিয়োজিত হবে। কিন্তু আসলে এর ফলে একটি বড় রকমের ক্ষতি হবে। তা হচ্ছে এই যে, বর্তমানে বাজারে যে পণ্য মওজুদ রয়েছে তার একটি বড় অংশ অবিক্রীত থেকে যাবে। কারণ যাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই ক্রয়-ক্ষমতা কম ছিল তারা অক্ষমতার কারণে অনেক পণ্য কিনতে পারেনি;

আর যারা প্রয়োজন পরিমাণ পণ্য কিনতে পারতো তারা সক্ষমতা সত্ত্বেও উৎপাদিত পণ্যের একটা বড় অংশ ক্রয় করেনি। আবার যাদের নিকট প্রয়োজনের চেয়ে বেশী ক্রয় ক্ষমতা পৌছে গিয়েছিল তারা তা অন্যের নিকট হস্তান্তর করার পরিবর্তে নিজের নিকট আটক রেখেছিল। এখন যদি প্রতিটি অর্থনৈতিক আবর্তনের ক্ষেত্রে এ ধারা অব্যাহত থাকে এবং প্রয়োজন পরিমাণ ও প্রয়োজনের অধিক পরিমাণ ক্রয় ক্ষমতার অধিকারীরা নিজেদের এ ক্ষমতার বৃহত্তর অংশ উৎপাদিত পণ্য ক্রয়ে ব্যবহার না করে এবং কম ক্রয় ক্ষমতার অধিকারীদেরকেও না দেয়, বরং একে আটক করে সঞ্চয় করতে থাকে, তাহলে এর ফলে প্রতিটি আবর্তনে দলের অর্থনৈতিক উৎপাদনের বিরাট অংশ অবিক্রীত থেকে যেতে থাকবে। পণ্যের চাহিদা কম হবার কারণে উপার্জনও কমে যাবে। উপার্জন কম হলে আমদানীও কমে যাবে। আর আমদানী কম হয়ে গেলে ব্যবসায় পণ্যের চাহিদা আরো বেশি কমে যেতে থাকবে। এভাবে কয়েক ব্যক্তির অর্থ সঞ্চয় প্রবণতা বহু ব্যক্তির অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে পরিণত হবে। অবশেষে এ অবস্থা ঐ অর্থ সঞ্চয়কারীদের জন্যও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। কারণ যে অর্থের সাহায্যে উৎপন্ন দ্রব্যাদি কেনার পরিবর্তে সে তাকে যক্ষের ধনের মতো আগলিয়ে রেখেছে এবং তিলে তিলে বাড়িয়ে চলছে পণ্যদ্রব্য তৈরী করার জন্য, অবশেষে ঐ পণ্যদ্রব্য তৈরী হলে তা কিনবে কে?

এ বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যাবে, যেসব কারণে ব্যক্তি নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয় না করে সঞ্চয় করে রাখতে উদ্যোগী হয় সে কারণগুলো দূর করাই হচ্ছে আসল অর্থনৈতিক প্রয়োজন সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণার্থে এক দিকে এমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দুঃসময়ে আর্থিক সাহায্য লাভ করতে পারে; এভাবে লোকেরা নিজেদের উপার্জিত অর্থ জমা করার প্রয়োজন অনুভব করবে না, অন্যদিকে সঞ্চিত অর্থের উপর যাকাত আরোপ করতে হবে, এর ফলে মানুষের মধ্যে অর্থ জমা করার প্রবণতা কমে যাবে। এর পরও যে অর্থসম্পদ সঞ্চিত হতে থাকবে তা থেকে অবশিষ্ট অর্থের আবর্তনে যারা কম অংশ পেয়েছে তাদেরকে একটি অংশ দিতে হবে। কিন্তু এর বিপরীতপক্ষে এখানে সুদের লোভ দেখিয়ে মানুষের প্রকৃতিগত কার্পণ্যকে উস্কানী দেয়া হচ্ছে এবং যারা কৃপণ নয় তাদেকেও অর্থ ব্যয় করার পরিবর্তে সঞ্চয়ের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

অতপর এ ভুল পদ্ধতিতে সামষ্টিক স্বার্থের বিরুদ্ধে যে পুঁজি একত্রিত হয় তাকে অর্থ উৎপাদনকারী কারবারের দিকে আনা হলেও সুদের ভিত্তিতে আনা হয়। সামষ্টিক স্বার্থের উপর এটি দ্বিতীয় দফা অত্যাচার। এ সঞ্চিত অর্থ যদি এমন এক শর্তে ব্যবসায়ে খাটানো হতো যেখানে অর্জিত মুনাফার হার অনুযায়ী পুঁজিপতিও তার অংশ লাভ করতো তাহলেও কোনো প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু এ সঞ্চিত অর্থ এমন এক শর্তে বাজারে ছাড়া হচ্ছে যার ফলে ব্যবসায়ে লাভ হোক বা না হোক এবং কম মুনাফা হোক বা বেশী

মুনাফা, তাতে পুঁজিপতির কিছু আসে যায় না, সে তার নির্ধারিত হার অনুযায়ী মুনাফা অবশ্যি পেতে থাকবে। এভাবে সামষ্টিক অর্থব্যবস্থাকে দু'দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। একদিকে টাকা উপার্জন করে তা ব্যয় না করা ও জমা করে রাখার ক্ষতি এবং অন্যদিকে যে টাকা জমা করে রাখা হয়েছিল তা সামষ্টিক অর্থ-ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হলেও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায়ে শামিল না হয়ে ঋণ আকারে সমগ্র সমাজের শিল্প ও ব্যবসায়ের ঘাড়ে চেপে বসেছে এবং প্রচলিত আইন তাকে নিশ্চিত মুনাফার জামানত দান করেছে। এ ভ্রান্ত ব্যবস্থাপনা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যার ফলে সমাজের বিপুল সংখ্যক লোক তাদের ক্রয় ক্ষমতা, সামগ্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যাদি ক্রয়ের কাজে ব্যবহার করার পরিবর্তে তা সঞ্চিত করে ক্রমান্বয়ে সুদ ভিত্তিক ঋণের আকারে সমাজের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে চলছে। এ পরিস্থিতি সমাজকে মহাসংকটের সম্মুখীন করেছে। প্রতি মুহূর্তে তার সুদ ও ঋণের বোঝা বেড়ে যাচ্ছে। যেক্ষেত্রে বাজারে তার উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কম, ক্রেতার সংখ্যা কম, লাখ লাখ কোটি কোটি লোক নিজেদের অক্ষমতা ও অর্থ না থাকার দরুন তা কিনতে পারছে না এবং হাজার হাজার লোক নিজেদের ক্রয়ক্ষমতাকে বেশী সুদে ঋণ দেয়ার জন্য সঞ্চিত রেখে তা কেনার ব্যাপারে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, সেক্ষেত্রে এ বর্ধিত ঋণ ও সুদ সে কিভাবে পরিশোধ করবে?

সুদের উপকারিতা ও লাভজনক দিক সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, এর চাপে ব্যবসায়ী পুঁজির যত্রতত্র অযথা ও অলাভজনক ব্যবহার না করে অধিকতর লাভজনক কাজে তা ব্যবহার করে। বলা হয়ে থাকে, সুদের হার অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে নীরবে ব্যবসায়ের পথ নির্দেশ করার মহাদায়িত্ব পালন করে এবং এরই বদৌলতে পুঁজি এর চলার সম্ভাব্য সকল পথের মধ্য থেকে ছাঁটাই-বাছাই করে সবচাইতে লাভজনক ব্যবসায়ে নিজেকে নিয়োজিত করে। কিন্তু এ সুন্দর কথার পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিলে এর আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সুদের প্রথম কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, এর বদৌলতে 'উপকার' ও 'লাভ' এর সমস্ত ব্যাখ্যাই পরিত্যাক্ত হয়েছে এবং ঐ শব্দগুলোর কেবল একটিমাত্র অর্থই রয়ে গেছে, তা হচ্ছে 'অর্থনৈতিক উপকার' ও 'বস্তুগত লাভ'। এভাবে পুঁজি বিরাট একাগ্রতা লাভে সক্ষম হয়েছে। প্রথমে অর্থনৈতিক লাভ ছাড়া অন্য ধরনের লাভের পথেও পুঁজির আনাগোনা হতো। কিন্তু এখন তার লক্ষ্য একটিমাত্র পথের দিকে। অর্থাৎ যে পথে অর্থনৈতিক লাভ ও সুবিধা নিশ্চিত, একমাত্র সে পথেই তার গতি নিয়ন্ত্রিত। অতঃপর তার দ্বিতীয় কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, সামজের লাভ বা স্বার্থোদ্ধার নয় বরং কেবলমাত্র পুঁজিপতির লাভ ও সীমিত স্বার্থোদ্ধারকেই সে পুঁজির লাভজনক ব্যবহারের মানদন্ডে পরিণত করেছে। পুঁজির হার স্থির করে দেয় যে, পুঁজি এমন একটি কাজে ব্যবহৃত হবে যা পুঁজিপতিকে বার্ষিক শতকরা ৬ বা এর চেয়ে বেশী হারে মুনাফা দিতে সক্ষম। এর চেয়ে কম মুনাফাদানকারী কোনো কাজে পুঁজি

খাটানোর কোনো যৌক্তিকতাই নেই। এখন মনে করুন, পুঁজির সামনে দু'টো পরিকল্পনা পেশ করা হলো। একটা পরিকল্পনা হলো এমন কতকগুলো আবাসিক গৃহ নির্মাণের, যেগুলো আরামদায়ক হবার সাথে সাথে গরীব লোকেরা কম ভারায় নিতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি হলো একটি বিরাট জাঁকালো প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের। প্রথম পরিকল্পনাটি শতকরা ৬ ভাগের কম মুনাফাদানের আশা দেয়, আর দ্বিতীয়টি দেয় এর চেয়ে বেশী। অন্য কোনো অবস্থায় অজ্ঞতাবশত প্রথম পরিকল্পনাটির দিকে পুঁজির প্রবাহিত হবার সম্ভাবনা ছিল বা অন্ততঃপক্ষে এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টার দিকে সে ঝুঁকবে তা নিয়ে তাকে যথেষ্ট সংশয় দোলায় দুলতে হতো। কিন্তু সুদের হারের এমনি মাহাত্ম্য যে, এর নির্দেশে পুঁজি কোনো প্রকার দ্বিধা না করে সুড়সুড় করে দ্বিতীয় পরিকল্পনাটির দিকে অগ্রসর হয় এবং প্রথম পরিকল্পনাটিকে নির্দয়ভাবে পিছনে নিক্ষেপ করে। তার দিকে একবার ফিরেও তাকায় না। উপরন্তু সুদের হার ব্যবসায়ীকে এমনভাবে বাধ্য করে যার ফলে সে নিজের মুনাফাকে সব সময় পুঁজিপতি নির্ধারিত মুনাফার সীমারেখা থেকে উচ্চে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এজন্য সে যে কোনো নৈতিকতা বিরোধী পদ্ধতি অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয় না। যেমন, মনে করুন এক ব্যক্তি একটি চলচ্চিত্র কোম্পানী গঠন করলো। এ কোম্পানীতে সে যে পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করেছে তার সুদের হার হচ্ছে বছরে শতকরা ৬ ভাগ। এ ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যি এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যার ফলে তার লাভের হার শতকরা ৬ ভাগের চেয়ে বেশী হয়। নৈতিক পবিত্রতার অধিকারী ও তত্ত্ব-জ্ঞান সমৃদ্ধ কোনো চিত্র নির্মাণে যদি তার এ উদ্দেশ্য সফল না হয়, তাহলে অবশ্যি সে উলংগ ও অশ্লীল চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হবে এবং এমনভাবে এর বিজ্ঞাপন ছড়াতে ও প্রপাগান্ডা করতে থাকবে যার ফলে মানুষ আবেগে ফেটে পড়বে এবং যৌন উত্তেজনার প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয়ে হাজার হাজার লাখো লাখো মানুষ প্রেক্ষাগৃহের দিকে ছুটবে।

সুদের সাহায্য ছাড়া যেসব লাভ ও উপকার সাধিত হওয়ার কোনো উপায় নেই সেগুলোর আসল চেহারা উপরে বিবৃত হলো। এখন সুদের সাহায্য ছাড়া যেসব প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই সেগুলোর কিছু বিশ্লেষণ আমরা করতে চাই। নিঃসন্দেহে ঋণ মানুষের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের নিজের ব্যক্তিগত অভাব পূরণে ঋণের প্রয়োজন হয়; আবার শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজ কারবারেও সব সময় এর প্রয়োজন দেখা দেয় এবং রাষ্ট্রসহ সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান এর মুখাপেক্ষী থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা ঠিক নয় যে, সুদ ছাড়া ঋণ সংগ্রহ করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আসলে সুদকে আইনসংগত গণ্য করার কারণে ব্যক্তি থেকে নিয়ে রাষ্ট্র পর্যন্ত সকল পর্যায়ের সুদ ছাড়া এক পয়সাও ঋণ লাভ করা কারোর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সুদকে হারাম গণ্য করে অর্থনীতির সাথে সাথে ইসলাম নির্দেশিত নৈতিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করলে আজই দেখা যাবে ব্যক্তিগত

অভাব, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক প্রয়োজনের সকল ক্ষেত্রে সুদবিহীন ঋণ পাওয়া যাচ্ছে; বরং অনেক ক্ষেত্রে দানও পাওয়া যাবে। ইসলাম কার্যত এর প্রমাণ পেশ করেছে। শত শত বছর ধর মুসলমান সমাজ সুদ ছাড়াই উত্তম পদ্ধতিতে নিজেদের যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজ-কারবার চালিয়ে এসেছে। সুদ-ব্যবস্থা লাঞ্ছিত আজকের এ ঘৃণিত যুগের পূর্বে মুসলমান সমাজ কোনোদিন কল্পনাই করতে পারতো না যে, সুদবিহীন ঋণ লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভব না হওয়ার কারণে কোনো মুসলমানের লাশ কাফন-দাফন করা সম্ভব হয়নি; বা ব্যবসায়িক প্রয়োজন অনুযায়ী 'কর্জে হাসানা' না পাওয়ার কারণে মুসলমানদের শিল্প-বাণিজ্য কৃষি দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে অথবা মুসলমানরা তাদের সরকারকে সুদবিহীন ঋণ দিতে রাজী না হওয়ায় কোনো মুসলিম সরকার জনকল্যাণমূলক কাজে বা জিহাদে অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হয়নি। কাজেই 'কর্জে হাসানার' পরিকল্পনা কার্যকর হবার যোগ্য নয় এবং ঋণের সমগ্র প্রাসাদটিই সুদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, এ দাবী কোনো প্রকার যুক্তি ভিত্তিক নয়। আমরা নিজেদের শত শত বছরের কার্যধারার মাধ্যমে একে ভ্রান্ত প্রমাণ করে এসেছি।

৩. সুদের বিপর্যয়

فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝ (البقرة : ٢٧٥ - ٢٧٦)

"কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এই নসীহত পৌঁছে যায় এবং ভবিষ্যতে সুদখোরী থেকে সে বিরত হয়, সেক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়েছে তা তো খেয়ে ফেলেছেই এবং এ ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ হয়ে গেছে। আর এই নির্দেশের পরও যে ব্যক্তি আবার এই কাজ করে, সে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত ও বিকশিত করেন। আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ দুষ্কৃতিকারীকে পছন্দ করেন না।"

একথা বলা হয়নি যে, যা কিছু সে খেয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন, বরং বলা হয়েছে তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে থাকছে। এই বাক্য থেকে জানা যায়, "যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই" বাক্যের অর্থ এ নয় যে, যা কিছু ইতিপূর্বে খেয়ে ফেলেছে তা মাফ করে দেয়া হয়েছে; বরং এখানে শুধুমাত্র আইনগত সুবিধার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে সুদ খেয়ে ফেলেছে আইনগতভাবে তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হবে না। কারণ তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হলে মামলা মোকদ্দমার এমন একটা ধারাবাহিকতা চক্র শুরু হয়ে যাবে যা আর শেষ হবে না। তবে সুদী কারবারের মাধ্যমে যে ব্যক্তি অর্থসম্পদ সংগ্রহ করেছে নৈতিক দিক দিয়ে তার অপবিত্রতা পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি তার মনে যথার্থই আল্লাহর ভীতি স্থান লাভ করে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অর্থনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিভংগি যদি সত্যিই পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেই এই হারাম পথে উপার্জিত ধনসম্পদ নিজের জন্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে এবং যাদের অর্থসম্পদ তার কাছে আছে তাদের সন্ধান লাভ করার জন্য নিজস্ব পর্যায়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে। হকদারদের সন্ধান পাবার পর তাদের হক ফিরিয়ে দেবে। আর যেসব হকদারের সন্ধান পাবে না তাদের সম্পদগুলো সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা করবে। এই কার্যক্রম তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। তবে যে ব্যক্তি তার পূর্বেকার সুদলব্ধ অর্থ যথারীতি ভোগ করতে থাকে, সে যদি তার এই হারাম খাওয়ার শাস্তি লাভ করেই যায়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এই আয়াতে এমন একটি অকাট্য সত্যের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যেমন সত্য তেমনি অর্থনৈতিক ও তমদ্দুনিক দিক দিয়েও সত্য। যদিও অপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, সুদের মাধ্যমে অর্থ বৃদ্ধি হচ্ছে এবং দান খয়রাতের মাধ্যমে অর্থসম্পদ কমে যাচ্ছে, তবুও আসল ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান হচ্ছে এই যে, সুদ নৈতিক, আধ্যাত্মিত ও তমদ্দুনিক উন্নতির কেবল প্রতিবন্ধকতাই নয়, বরং অবনতির সহায়ক। বিপরীতপক্ষে দান খয়রাতের (কর্জে হাসানা বা উত্তম ঋণ) মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি এবং তমদ্দুন ও অথনীতি সবকিছুই উন্নতি ও বিকাশ লাভ করে।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সুদ আসলে স্বার্থপরতা, কৃপণতা, সংকীর্ণতা, নির্মমতা ইত্যাকার অসৎ গুণাবলীর ফল এবং এই গুণগুলোই সে মানুষের মধ্যে বিকশিত করে। অন্যদিকে দানশীলতা, সহানুভূতি, উদারতা ও মহানুভবতা ইত্যাদি গুণাবলীই দান খয়রাতের জন্ম দেয় আর নিয়মিত দান খয়রাত করতে থাকলে এই গুণগুলি মানুষের মধ্যে লালিত ও বিকশিত হতে থাকে। এমন কে আছে যে, এই উভয় ধরনের নৈতিক গুণাবলীর মধ্য থেকে প্রথমগুলিকে নিকৃষ্ট ও শেষেরগুলিকে উৎকৃষ্ট বলবে না?

তমদ্দুনিক দিক দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিঃসন্দেহে একথা বুঝতে সক্ষম হবে যে, যে সমাজের লোকেরা পরস্পরের সাথে স্বার্থবাদী আচরণ করে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লাভ ছাড়া নিস্বার্থভাবে অন্যের কোনো কাজ করে না, একজনের প্রয়োজন ও অভাবকে অন্যজন নিজের মুনাফা লুন্ঠনের সুযোগ মনে করে তা থেকে পুরোপুরি লাভবান হয় এবং ধনীদের স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে, সে সমাজ কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। সে সমাজের লোকেদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কের পরিবর্তে হিংসা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা ও অনাগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তার বিভিন্ন অংশ হামেশা বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। অন্যান্য কারণগুলো যদি এই অবস্থার সহায়ক হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এহেন সমাজের বিভিন্ন অংশের পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যাওয়াটাও মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। অন্যদিকে যে সমাজের সামষ্টিক ব্যবস্থাপনা পরস্পরের প্রতি সাহায্য সহানুভূতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যার সদস্যরা পরস্পরের সাথে ঔদার্যপূর্ণ আচরণ করে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের প্রয়োজন ও অভাবের সময় আন্তরিকতার সাথে ও প্রশস্ত মনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং একজন সমর্থ ও সক্ষম ব্যক্তি তার একজন অক্ষম ও অসমর্থ ভাইকে সাহায্য অথবা কমপক্ষে ন্যায়সংগত সহায়তার নীতি অবলম্বন করে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই পারস্পরিক প্রীতি, কল্যাণাকাঙক্ষা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এ ধরনের সমাজের অংশগুলি একটি অন্যটির সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত থাকবে। সেখানে আভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিরোধ ও সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কোনো

সুযোগই পাবে না। পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সাহায্য সহযোগিতার কারণে সেখানে উন্নতির গতিধারা প্রথম ধরনের সমাজের তুলনায় অনেক বেশী দ্রুত হবে।

এবার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করা যাক। অর্থনীতির বিচার সুদী লেন দেন দুই ধরনের হয়। এক. অভাবীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যয়ভার বহন করার জন্য বাধ্য হয়ে ঋণ গ্রহণ করে। দুই. পেশাদার লোকেরা নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী, কৃষি ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করার জন্য ঋণ গ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রথম ধরনের ঋণটি সম্পর্কে সবাই জানে, এর ওপর সুদ আদায় করার পদ্ধতি মারাত্মক ধ্বংসকর। দুনিয়ায় এমন কোনো দেশ নেই যেখানে মহাজনরা ও মহাজনী সংস্থাগুলো এই পদ্ধতিতে গরীব শ্রমিক, মজুর, কৃষক ও স্বল্প আয়ের লোকদের রক্ত চুষে চলছে না। সুদের কারণে এই ধরনের ঋণ আদায় করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, বরং অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারপর এক ঋণ আদায় করার জন্য দ্বিতীয় ঋণ এবং তারপর তৃতীয় ঋণ, এভাবে ঋণের পর ঋণ নিতে থাকে। ঋণের মূল অংকের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী সুদ আদায় করার পরও মূল অংক যেখানকার সেখানেই থেকে যায়। শ্রমিকদের আয়ের বৃহত্তম অংশ মহাজনের পেটে যায়। তার নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ দিনান্তে তার নিজের ও সন্তান পরিজনের পেটের আহার যোগাতে সক্ষম হয় না। এ অবস্থায় কাজের প্রতি শ্রমিক ও কর্মচারীদের আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে এবং একদিন তা শূন্যের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। কারণ তাদের মেহনতের ফল যদি অন্যেরা নিয়ে যেতে থাকে, তাহলে তারা কোনোদিন মন দিয়ে ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে পারে না। তারপর সুদীঋণের জালে আবদ্ধ লোকরা সর্বক্ষণ এমন দুর্ভাবনা ও পেরেশানির মধ্যে জীবন কাটায় এবং অভাবের কারণে তাদের জন্য সঠিক খাদ্য ও চিকিৎসা এমনই দুর্লভ হয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের স্বাস্থ্য কখনো ভালো থাকে না। প্রায়ই তারা রোগ-পীড়ায় জর্জরিত থাকে। এভাবে সুদী ঋণের নীট ফল এই দাঁড়ায় ঃ গুটিকয় লোক লাখো লোকের রক্ত চুষে মোটা হতে থাকে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতির অর্থ উৎপাদন সম্ভাব্য পরিমাণ থেকে অনেক কমে যায়। পরিণামে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্তচোষারাও নিষ্কৃতি পায় না। কারণ, তাদের স্বার্থগৃধ্নুতা সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ধনিক সমাজের বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্ষোভ, ঘৃণা ও ক্রোধ লালিত হতে থাকে। তারপর একদিন কোনো বিপ্লবের তরংগাভিঘাতে ক্ষোভের আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে। তখন এই যালেম ধনিক সমাজকে তাদের অর্থসম্পদের সাথে প্রাণ সম্পদও বিসর্জন দিতে হয়।

আর দ্বিতীয় ধরনের সুদীঋণ সম্পর্কে বলা যায়, ব্যবসায়ে খাটাবার জন্য একটি নির্দিষ্ট সুদের হারে এই ঋণ গ্রহণ করার ফলে যে অসংখ্য ক্ষতি হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এখানে বিবৃত করছি।

এক. যে কাজটি প্রচলিত সুদের হারের সমান লাভ উৎপাদনে সক্ষম নয়, তা দেশ ও

জাতির জন্য যতই প্রয়োজনীয় ও উপকারী হোক না কেন, তাতে খাটাবার জন্য অর্থ পাওয়া যায় না। আবার দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক উপকরণ একযোগে এমন সব কাজের দিকে দৌড়ে আসে, যেগুলি বাজারে প্রচলিত সুদের হারের সমান বা তার চেয়ে বেশী লাভ উৎপাদন করতে পারে, সামগ্রিক দিক দিয়ে তাদের প্রয়োজন বা উপকারী ক্ষমতা অনেক কম অথবা একেবারে শূন্যের কোঠায় থাকলেও।

দুই. ব্যবসা, শিল্প বা কৃষি সংক্রান্ত যেসব কাজের জন্য সুদে টাকা পাওয়া যায়, তাদের কোনো একটিতেও এ ধরনের কোনো গ্যারান্টি নেই যে, সব সময় সব অবস্থায় তার মুনাফা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ, যেমন শতকরা পাঁচ, ছয় বা দশ অথবা তার ওপরে থাকবে এবং এর নীচে কখনো নামবে না। মুনাফার এই হারের গ্যারান্টি তো দূরের কথা, সেখানে নিশ্চিত্য মুনাফা হবে, কখনো লোকসান হবে না, এরও কোনো নিশ্চয়তা নেই। কাজেই যে ব্যবসায়ে এমন ধরনের পুঁজি খাটানো হয়, যাতে পুঁজিপতিকে একটি নির্ধারিত হার অনুযায়ী মুনাফা দেয়ার নিশ্চয়তা দান করা হয়ে থাকে, তা কখনো ক্ষতি ও আশাংকামুক্ত হতে পারে না।

তিন. যেহেতু মূল ঋণদাতা ব্যবসায়ের লাভ লোকসানে অংশীদার হয় না, কেবলমাত্র মুনাফার অংশীদার হয় এবং তাও আবার একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দেয়ার ভিত্তিতে মূলধন দেয়, তাই ব্যবসায়ের ভালো-মন্দের ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ থাকে না। সে চরম স্বার্থপরতা সহকারে কেবলমাত্র নিজের মুনাফার ওপর নজর রাখে। যখনই বাজারে সামান্য মন্দাভাব দেখা দেয়ার আশংকা হয়, তখনই সে সবার আগে নিজের টাকাটা টেনে নেয়ার চিন্তা করে। এভাবে কখনো নিছক তার স্বার্থপরতা সুলভ আশংকার কারণে সত্যি সত্যিই বাজারে মন্দাভাব সৃষ্টি হয়। কখনো অন্য কোনো কারণে বাজারে মন্দাভাব সৃষ্টি হয়ে গেলে পুঁজিপতির স্বার্থপরতা তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের সূচনা করে।

সুদের এ তিনটি ক্ষতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অর্থনীতির সাথে সামান্যতম সম্পৃক্তি রাখে এমন কোনো ব্যক্তি এগুলো অস্বীকার করতে পারবেন না। এরপর একথা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, যথার্থই সুদ অর্থনৈতিক সম্পদ বাড়ায় না, বরং কমায়।

এবার দান খয়রাতের অর্থনৈতিক প্রভাব ও ফলাফলের কথায় আসা যাক। সমাজের সচ্ছল লোকেরা যদি নিজেদের অবস্থা ও মর্যাদা অনুসারে নিঃসংকোচে নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নেয়, এরপর তাদের কাছে যে পরিমাণ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তা গরীবের মধ্যে বিলি করে দেয়, যাতে তারাও নিজেদের প্রয়োজনের জিনিসপত্র কিনতে পারে, তারপরও যে টাকা বাড়তি থেকে যায় তা ব্যবসায়ীদের বিনা সুদে ঋণ দেয় অথবা অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে লাভ-লোকসানে শরীক হয়ে যায় অথবা সমাজ ও সমষ্টির সেবায় বিনিয়োগ করার জন্য সরকারের হাতে সোপর্দ করে দেয়, তাহলে এহেন সমাজে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি

চরম উন্নতি লাভ করবে, সমাজের সাধারণ লোকদের সচ্ছলতা বেড়ে যেতে থাকবে এবং সুদী অর্থব্যবস্থা ভিত্তিক সমাজের তুলনায় সেখানে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে যাবে, একথা কেউ সামান্য চিন্তাভাবনা করলে সহজেই বুঝতে পারবে।

সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তার মৌলিক প্রয়োজনের চেয়ে বেশী অংশ পেয়েছে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই সুদে টাকা খাটাতে পারে। কোনো ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই যে অংশটা পায় কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয় আল্লাহর দান। আর আল্লাহর এই দানের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকশের পদ্ধতি হচ্ছে, আল্লাহ যেভাবে তাঁর বান্দাকে দান করেছেন বান্দাও ঠিক সেভাবেই আল্লাহর অন্য বান্দাদেরকে তা দান করবে।[১৫]

---

১৫. মূল ঃ তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৭৫-২৭৬, টীকা ৩১৯-৩২০।

৪. সুদমুক্ত অর্থনীতি বিনির্মাণ

বর্তমান যুগের একটি উন্নতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষম এমন একটি সুদবিহীন অর্থ-ব্যবস্থা বাস্তবে গড়ে তোলা সম্ভব কিনা, এ প্রশ্নটিই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়।

কয়েকটি বিভ্রান্তি

এ ব্যাপারে বরং বাস্তব সংশোধনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে যেসব বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন মানুষের মনকে আলোড়িত করে এ প্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে সেগুলোর জবাব দেয়া প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে প্রথম ও প্রধান বিভ্রান্তিটি থেকেই আমাদের পূর্বোল্লেখিত প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে। এ বইতে আমাদের ইতিপূর্বেকার যুক্তিভিত্তিক আলোচনায় সুদের ভ্রান্তি ও ক্ষতিকারক দিকটি সুস্পষ্ট করা হয়েছে। অন্যদিকে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি থেকে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সব রকমের সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এ দুটো কথা স্বীকার করে নেয়ার পর—"সুদ ছাড়া অর্থনৈতিক কাজ কারবার পরিচালনা করা কি সম্ভব?" এবং "সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা কি বাস্তবে গড়ে তোলা যায়?"—এ জাতীয় প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। এ থেকে তো পরোক্ষভাবে একথা বলারই চেষ্টা করা হয় যে, খোদার খোদায়ীর মধ্যে ভুল হওয়া একটি অনিবার্য ব্যাপার এবং এতে এমন সত্যও আছে, যা কার্যকর ও বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভবপর নয়। এভাবে আসলে প্রকৃতি ও তার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করা হয়। এর অর্থ দাঁড়ায়, আমরা এমন একটি পচনশীল বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি যেখানে আমাদের অনেক প্রকৃত প্রয়োজনকে জুড়ে দেয়া হয়েছে ভুল ও দুষ্কর্মের সাথে এবং অনেক কল্যাণের দরজা জেনে বুঝেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অথবা এর চেয়েও আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে আমরা এর এ অর্থ গ্রহণ করতে পারি যে, প্রকৃতির বক্রতা এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে, যার ফলে প্রকৃতির নিজের বিধান যাকে ভুল বলে, তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায়, তা কল্যাণকর, অপরিহার্য ও কার্যকর হয় এবং তার বিধান যাকে নির্ভুল বলে, তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় তা অকল্যাণকর ও অকার্যকর হয়।

সত্যিই কি আমরা নিজেদের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকৃতির স্বভাব ও মেজাজ সম্পর্কে এ ধরনের কুধারণা সৃষ্টির কোনো অবকাশ পাই? প্রকৃতি ভাঙার সহায়ক ও গড়ার শত্রু, একথা কি সত্য? একথা সত্য হলে বস্তুর ভালো

ও মন্দ, কল্যাণকর ও অকল্যাণকর এবং ভুল ও নির্ভুলের সব আলোচনা শিকেয় তুলে দিতে হবে। সোজা কথায় আমাদের জীবনক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। কারণ এরপর এ দুনিয়ায় আমাদের জন্য আর কোনো আশার আলো থাকে না। কিন্তু আমাদের এবং এ বিশ্ব জগতের প্রকৃতি যদি এ কুধারণার শিকার হতে না চায়, তাহলে আমাদের অবশ্যি এ বিশেষ চিন্তা পদ্ধতি পরিহার করতে হবে যে, "অমুক বস্তুটি খারাপ হলেও তার সাহায্যেই কার্যোদ্ধার হয়" এবং "অমুক বস্তুটি সত্য ও ন্যায়সঙ্গত হলেও তা কার্যকর হওয়া সম্ভব নয়।"

আসলে দুনিয়ায় যে পদ্ধতি একবার প্রচলিত হয়ে যায় মানুষের যাবতীয় কাজ কারবার লেনদেন তার সাথে জড়িত হয়ে পড়ে এবং ঐ পদ্ধতি পরিবর্তন করে অন্য পদ্ধতি প্রচলন করা কঠিন বলে মনে হতে থাকে। ভালো মন্দ, ভুল নির্ভুল যাই হোক না কেন প্রত্যেকটি প্রচলিত পদ্ধতির এই একই অবস্থা। প্রচলিত পদ্ধতিটি প্রচলিত বলেই সহজ মনে হয়। অন্যদিকে অপ্রচলিত পদ্ধতিটি অপ্রচলিত এবং প্রচলিত পদ্ধতি পরিবর্তন করে তাকে প্রচলিত করতে হবে বলেই তা কঠিন মনে হয়। কিন্তু অবুঝ লোকেরা এটা না বুঝে মনে করে, প্রচলিত ভুলটাই সহজ ও স্বাভাবিক; মানুষের যাবতীয় কাজ কারবার এরই ভিত্তিতে সহজে চলতে পারে এবং এ ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় বিভ্রান্তিটি হচ্ছে, পরিবর্তন কঠিন হবার আসল কারণগুলো লোকেরা বুঝে না। ফলে তারা পরিবর্তনের পরিকল্পনা অবাস্তব ও কার্যকর যোগ্য নয় বলে উড়িয়ে দেয়। প্রচলিত কোনো ব্যবস্থা পরিবর্তনের পরিকল্পনাকে অবাস্তব ও কার্যকরযোগ্য নয় বলে উড়িয়ে দেয়া আসলে মানবিক প্রচেষ্টাবলীর সম্ভাবনাসমূহ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণেরই ফল, এ দুনিয়ারই কোনো কোনো এলাকায় ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা কায়েম করার ন্যায় চরম বিপ্লবাত্মক পরিকল্পনাও কার্যকর করা হয়েছে। কাজেই এক্ষেত্রে সুদ রহিত করে যাকাতের সংগঠন কায়েম করার ন্যায় ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়—একথা বলা কোনোক্রমেই শোভা পায় না। তবে একথা ঠিক, প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে নতুন ব্যবস্থায় জীবন গড়ে তোলা রহীম করীমের ন্যায় যে কোনো সাধারণ লোকের কাজ নয়। এ কাজ কেবল তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে দুটো শর্ত পাওয়া যায় ঃ

এক ঃ যারা যথার্থই পুরাতন ব্যবস্থা পরিহার করেছে এবং যে পরিকল্পনা অনুযায়ী জীবনের সমগ্র ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করার লক্ষ্য গৃহীত হয়েছে, তার উপর আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

দুই ঃ যারা অনুকরণ প্রবৃত্তির পরিবর্তে ইজতিহাদী প্রবৃত্তির অধিকারী। যারা নিছক

প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিটুকুর অধিকারী নয়, যা পুরাতন ব্যবস্থাকে তার পূর্বের পরিচালকদের ন্যায় দক্ষতা সহকারে পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট, বরং এমন বিশেষ পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী যা বিধ্বস্ত পথরেখাগুলো পরিহার করে নতুন পথরেখা তৈরী করার জন্য প্রয়োজন।

এ দুটো শর্ত যাদের মধ্যে পাওয়া যায় তারা কমিউনিজম, নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাদের ন্যায় চরম বিপ্লবাত্মক মতবাদগুলোর একদেশদর্শী পরিকল্পনা-সমূহও কার্যকর করতে পারে। আর যাদের মধ্যে এই শর্ত দুটো পাওয়া যায় না তারা ইসলামের একান্ত ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনাও কার্যকর করতে পারে না।

এ ব্যাপারে আরো একটি ছোটখাটো বিভ্রান্তির অপনোদন হওয়া উচিত। গঠনমূলক সমালোচনা ও সংস্কারমূলক পরিকল্পনার জবাবে যখন কাজের নীল নক্শা চাওয়া হয় তখন অবস্থা দেখে মনে হয় যেন কাগজের পিঠেই পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ এবং লোকেরা খাতার পাতাকেই কাজের ক্ষেত্র বলে মনে করে। অথচ কাজের আসল ক্ষেত্র হচ্ছে জমিন। কাগজের উপর করার মতো কাজ নিতান্ত সীমাবদ্ধ। তা হচ্ছে, কেবল যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে প্রচলিত ব্যবস্থার গলদ, ক্ষতি ও অকল্যাণসমূহ দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরা এবং এর স্থলে যে ব্যবস্থা আমরা কার্যকর করতে চাই তার যৌক্তিকতা বলিষ্ঠভাবে সপ্রমাণ করা। এরপর কাজের সাথে যেসব বিষয়ের সম্পর্ক, কাগজের পিঠে সেগুলো সম্পর্কে বড়জোর এতটুকুন করা যেতে পারে যে, পুরনো ব্যবস্থার ভুল পদ্ধতিগুলো কিভাবে নির্মূল করা যেতে পারে, এবং সে স্থলে নতুন পরিকল্পনাগুলো কিভাবে কার্যকর করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মানুষের সামনে একটা সাধারণ চিন্তা ও ধারণা তুলে ধরা। তবে এ ব্যাপারটির বিস্তারিত রূপ কি হবে, এর ছোটখাটো ও খুঁটিনাটি পর্যায়গুলো কি হবে এবং প্রত্যেক পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানের উপায় কি হবে—এসব বিষয় কোনো ব্যক্তি পূর্বাহ্নে অবহিত হতে পারে না এবং এ প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়াও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমান ব্যবস্থার ভ্রান্তি সম্পর্কে যদি আপনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয়ে থাকেন এবং মনে করে থাকেন যে, সংশোধনের প্রস্তাব যথার্থই ন্যায়সঙ্গত তাহলে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসুন এবং এমন সব লোকের হাতে কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করুন যারা ঈমানী শক্তি ও ইজতিহাদী বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী। তারপর বাস্তব ক্ষেত্রে যেখানে যে সমস্যা দেখা দেবে সেখানেই তার সমাধানও হয়ে যাবে। যে কাজ কার্যক্ষেত্রে হাতে কলমে করার মতো তা কাগজের পিঠে আঁচড় কেটে কেমন করে করা যেতে পারে?

এ বিস্তারিত আলোচনার পর একথা বলার কোনো প্রয়োজন থাকে না যে, এ অধ্যায়ে আমি যা কিছু পেশ করবো তা সুদবিহীন অর্থনীতির কোনো বিস্তারিত রূপরেখা হবে না, বরং তা হবে সুদকে সামগ্রিক অর্থনীতি থেকে রহিত করার বাস্তব কাঠামো কি হতে

পারে এবং সুদ রহিত করার চিন্তা উদয়ের সাথে সাথে, আপাতদৃষ্টিতে মানুষের সামনে যেসব বড় বড় সমস্যা দেখা দেয় সেগুলো কিভাবে সমাধান করা যেতে পারে, তার একটা সাধারণ চিন্তা।

সংস্কারের পথে প্রথম পদক্ষেপ

আগের অধ্যায়গুলোয় সুদ সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সুদের প্রচলন আইনগতভাবে বৈধ হবার কারণেই সামগ্রিক অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাবতীয় গলদ ও অনিষ্টকারিতা সৃষ্টি হয়েছে। সুদের দুয়ার উন্মুক্ত থাকার পর কোনো ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে 'কর্জে হাসানা' বা সুদমুক্ত ঋণ দেবে কেন? সে একজন ব্যবসায়ীর সাথে লাভ লোকসানে শরীক হতে যাবে কেন? সে তার জাতির প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য আন্তরিক সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে যাবে কোন্ স্বার্থে? কেনইবা সে নিজের সঞ্চিত পুঁজি মহাজন ও পুঁজিপতির নিকট সোপর্দ করবে না—যেখান থেকে ঘরে বসে বসেই সে একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফা লাভের আশা রাখে? মানুষের অসৎ প্রবৃত্তি ও প্রবণতাগুলোকে উদ্দীপিত ও উদগ্র করার পথ উন্মুক্ত করে দেবার পর নিছক বক্তৃতা, উপদেশ ও নৈতিক আবেদনের মাধ্যমে সেসবের অগ্রগতি ও অনিষ্টকারিতা বন্ধ করার আশা করা যেতে পারে না। আবার এখানে কেবল একটি অসৎ প্রবণতাকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়ার মধ্যেই ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর থেকেও অগ্রসর হয়ে আমাদের প্রচলিত আইন তার সাহায্যকারীর দায়িত্ব নিয়েছে এবং আমাদের রাষ্ট্র ও সরকার স্বয়ং এই অসৎ প্রবণতাটির ভিত্তিতে সমগ্র অর্থব্যবস্থা পরিচালনা করেছে। এ অবস্থায় কিছু আংশিক পরিবর্তন ও ছোটখাটো সংশোধনের মাধ্যমে এর যাবতীয় অনিষ্টকারিতার গতিরোধ কেমন করে সম্ভবপর হতে পারে? একটিমাত্র পথেই এর গতিরোধ করা যেতে পারে, তা হচ্ছে, যে পথে অনিষ্টকারিতা আসছে প্রথমে সে পথটিই বন্ধ করতে হবে।

যারা মনে করে প্রথমে একটি সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা তৈরী হয়ে যাবে, তারপর সুদ আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে অথবা আইন করে বন্ধ করা হবে, তারা আসলে ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দিতে চায়। যতদিন আইনগতভাবে সুদের প্রচলন থাকবে, দেশের আদালতগুলো সুদী চুক্তিপত্রের স্বীকৃতি দিয়ে বলপূর্বক সেগুলো প্রবর্তন করবে এবং পুঁজিপতিদের জন্য সুদের লোভ দেখিয়ে—প্রতি গৃহ থেকে অর্থ সঞ্চিত করা, অতঃপর সুদের ভিত্তিতে তা ব্যবসায়ে খাটাবার পথ উন্মুক্ত থাকবে, ততদিন কোনো সুদবিহীন অর্থব্যবস্থার অস্তিত্ব লাভ ও অগ্রগতি কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। কাজেই সুদ রহিত হবার ব্যাপারটি যদি প্রথমে একটি অর্থব্যবস্থা তৈরী হয়ে যথেষ্ট উন্নত, শক্তিশালী ও সংগঠিত হওয়া এবং বর্তমান সুদী অর্থব্যবস্থার স্থলাভিষিক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করার শর্ত

সাপেক্ষ হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, কিয়ামত পর্যন্ত সুদ রহিত হবার কোনো উপায়ই দেখা দেবে না। এ কাজ করতে গেলে প্রথম পদক্ষেপেই আইনগতভাবে সুদ রহিত করতে হবে। অতঃপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুদবিহীন অর্থব্যবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং যেহেতু আবশ্যকতা আবিষ্কারের জননী সেহেতু স্বতঃস্ফূর্তভাবে এর জন্যে সবদিকে ও সবক্ষেত্রে অগ্রসর হবার ও ছড়িয়ে পড়ার পথ প্রশস্ত হতে থাকবে।

মানব প্রকৃতির যেসব অসৎ প্রবণতা সুদের জন্ম দিয়েছে সেগুলোর শিকড় এত গভীরে প্রবেশ করে আছে এবং তাদের দাবী এতই শক্তিশালী যে অসম্পূর্ণ ও খাপছাড়া কার্যক্রম এবং সাদামাটা কৌশল অবলম্বন করে কোনো সমাজ থেকে এ আপদটি দূর করা সম্ভব হয় না। এজন্য ইসলাম যেসব কৌশল ও উপায় অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছে সেসব পুরোপুরি অবলম্বন করতে হবে এবং যে ধরনের তৎপরতা সহকারে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম মুখর হতে বলেছে সে ধনের তৎপরতা অবলম্বন করতে হবে। ইসলাম সুদী ব্যবসায়ের কেবলমাত্র নৈতিক নিন্দাবাদ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং এইসাথে একদিকে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী তাকে হারাম গণ্য করে তার বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা সৃষ্টি করে এবং অন্যদিকে যেখানে ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে দেশীয় আইনের সাহায্য তাকে নিষিদ্ধ করে, সকল সুদের চুক্তি বাতিল করে, সুদ দেয়া নেয়া, সুদের দলিল লেখা ও তাতে সাক্ষী হওয়াকে ফৌজদারী অপরাধ ও পুলিশের হস্তক্ষেপযোগ্য গণ্য করে এবং কোথাও সামান্য শাস্তির মাধ্যমে এ কারবার বন্ধ না হলে অপরাধীকে হত্যা ও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করারও শাস্তি দেয়। তৃতীয় দিকে ইসলাম যাকাতকে ফরয তথা অবশ্যিপালনীয় কর্তব্য হিসেবে গণ্য করে এবং সরকারী পরিচালনাধীনে তা উসূল ও বন্টনের ব্যবস্থা করে একটি নতুন অর্থব্যবস্থার ভিত্ গড়ে তোলে। এসব উপায় অবলম্বন করার সাথে সাথে সে শিক্ষা, অনুশীলন ও প্রচার প্রপাগান্ডার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চিন্তা ও কর্মের সংশোধনও করে। এর ফলে তাদের মনের সুদখোরী প্রবণতা স্তিমিত হয়ে যায় এবং এর পরিবর্তে এমনসব প্রবণতা ও গুণাবলী সে স্থান অধিকার করে, যেগুলোর মাধ্যমে সমাজের অভ্যন্তরে সহানুভূতি ও বদান্যতাপূর্ণ সহযোগিতার প্রবণতা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারায় ন্যায় প্রবাহিত হতে থাকে।

সুদ রহিত করার সুফল

যথার্থ গুরুত্ব ও আন্তরিকতা সহকারে সুদকে রহিত করতে চাইলে এ পথে এবং এভাবেই সবকিছু করতে হবে। সুদকে আইনগতভাবে রহিত করে দিলে এবং এইসাথে যাকাত উসূল ও বন্টনের সামগ্রিক ব্যবস্থা গৃহীত হলে, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি বড় বড় সুফল দেখা দেবে।

এর প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুফল হবে, ধন সংগৃহীত হবার বর্তমান

বিপর্যয়মূলক অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে একটি সঠিক, সুস্থ ও কল্যাণকর অবস্থার সৃষ্টি হবে।

বর্তমান অবস্থায় নিম্নোক্তভাবে ধন সংগৃহীত হয় ঃ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেক মানুষের স্বভাবজাত কার্পণ্য ও ধন সঞ্চয় প্রবণতাকে কৃত্রিম উপায়ে চরম পর্যায়ে বাড়িয়ে দেয়। অতপর ভীতি ও লোভের অস্ত্র ব্যবহার করে তাদের আয়ের স্বল্পতম অংশ ব্যয় ও সর্বাধিক অংশ সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাদেরকে এই বলে ভয় দেখায় যে, যদি তোমরা এখন সঞ্চয় না কর তাহলে দুর্দিনে সমগ্র সমাজে তোমাদের সাহায্যকারী কেউ থাকবে না, তখন এ সঞ্চিত ধন তোমাদের কাজে লাগবে। তাদেরকে এই বলে লোভ দেখায় যে, ধন সঞ্চয় করলে এর বিনিময়ে তোমরা সুদ পাবে। এ দ্বিমুখী আন্দোলনের মুখে সমাজের প্রায় সকল ব্যক্তিই, যারা নিজেদের প্রয়োজনের চাইতে সামান্য পরিমাণ বেশী আয় করে, ব্যয় কমিয়ে সঞ্চয় বাড়াতে ভীষণভাবে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ফলে বাজারে পণ্যদ্রব্যাদির বিক্রয় ও চাহিদা সম্ভাব্য পরিমাণ থেকে অনেক কমে যায়। পণ্যদ্রব্যের আমদানী যে পরিমাণ কমে যায় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সম্ভাবনাও ঠিক সেই পরিমাণে কমে যায় এবং ধন ও পুঁজি সংগৃহীত হবার সুযোগও কমে যেতে থাকে। এভাবে কয়েক ব্যক্তির সঞ্চয় বেড়ে যাবার কারণে সামগ্রিক ধনের পরিমাণ কমে যায়। এক ব্যক্তি এমন পদ্ধতিতে নিজের সঞ্চিত ধনের পরিমাণ বাড়াতে থাকে যার ফলে হাজার হাজার লোকের ধন উপার্জনের যোগ্যতাই খতম হয়ে যায়, এক্ষেত্রে তাদের সঞ্চয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

বিপরীতপক্ষে যখন সুদ রহিত করা হবে এবং যাকাত সংগঠন কায়েম করে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এইমর্মে নিশ্চয়তা দান করা হবে যে, দুর্দিনে তার সাহায্যের যথাযোগ্য ব্যবস্থা রয়েছে, তখন কার্পণ্য ও ধন সঞ্চয়ের প্রকৃতিবিরোধী কারণ, প্রবণতা ও উদ্যম খতম হয়ে যাবে। লোকেরা নিজেরা মুক্তহস্তে ব্যয় করবে এবং অভাবীদেরকে যাকাতের মাধ্যমে দান করে তাদের ক্রয়ক্ষমতা এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যার ফলে তারা অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হবে। ফলে শিল্প বাণিজ্য বেড়ে যাবে, কাজ কর্ম ও উপার্জন বেড়ে যাবে এবং আয় বেড়ে যাবে। এ পরিবেশে শিল্প ও ব্যবসায়ের নিজস্ব মুনাফা এত বেশী বেড়ে যাবে যায় ফলে আজকের ন্যায় তাদের বাইরের পুঁজির এত বেশী মুখাপেক্ষী হতে হবে না। উপরন্তু তারা যে পরিমাণ পুঁজির অভাব অনুভব করবে বর্তমান অবস্থার তুলনায় তা অনেক বেশী সহজে সংগৃহীত হতে পারবে। কারণ তখন সঞ্চয়ের কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে না, যেমন কেউ কেউ মনে করে থাকেন। বরং তখনো কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের জন্মগত স্বভাবসিদ্ধ কারণে অর্থ সঞ্চয় করে যেতে থাকবে। আবার অনেক লোক বরং বেশীর ভাগ লোক আয়বৃদ্ধি ও সমাজের সাধারণ সমৃদ্ধির কারণে উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করতে বাধ্য হবে। তখন এ সঞ্চয়ের পেছনে কোনো

প্রকার কার্পণ্য, লোভ বা ভয় কার্যকর থাকবে না, বরং তার একমাত্র কারণ হবে এই যে, লোকেরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করবে। ইসলামের বিভিন্ন বৈধ ব্যয়ক্ষেত্রে মুক্তহস্তে ব্যয় করার পরও তাদের নিকট বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকবে। এ উদ্বৃত্ত অর্থ গ্রহণ করার মতো কোনো অভাবী লোকও থাকবে না। কাজেই এ অবস্থায় তারা এগুলো ঘরে ফেলে রাখবে এবং ভালো ও উপযুক্ত শর্তে নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ও প্রকল্পে, দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে এবং প্রতিবেশী দেশেও বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত হবে।

এর দ্বিতীয় সুফল এই দেখা দেবে যে, সঞ্চিত ধন জমাটবদ্ধ হবার পরিবর্তে আবর্তিত হতে থাকবে এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী অনবরত সাহায্য পৌছাতে থাকবে। বর্তমান ব্যবস্থায় ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগের পেছনে একমাত্র সুদের লোভই কার্যকর থাকে। কিন্তু এ জিনিসটিই আবার এর পুঞ্জিভূত হবার কারণেও পরিণত হয়। কারণ ধন সাধারণত সুদের হার অধিক হবার অপেক্ষায় বসে থাকে। উপরন্তু এ জিনিসটিই আবার ধনের প্রকৃতি ও মেজাজকে কারবারের প্রকৃতি ও মেজাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যখন কারবার পুঁজির চাহিদা পেশ করে, তখন পুঁজি অসম্মতি প্রকাশ করে, আর বিপরীত অবস্থায় পুঁজি কারবারের পেছনে দৌড়াতে থাকে এবং নিম্নতম শর্তে যে কোনো ভালো মন্দ কাজে লাগতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু যখন আইনগতভাবে সুদের দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে, বরং উলটো যাবতীয় সঞ্চিত ধনের উপর বছরে শতকরা আড়াই ভাগ হিসেবে যাকাত আদায় করা হবে, তখন ধনের এ অপ্রকৃতিস্থতার অবসান ঘটবে। সে নিজেই পুঞ্জিভূত ও অলস থাকার পরিবর্তে কোনো যুক্তিসঙ্গত শর্তে দ্রুত কোনো না কোনো কারবারে লাগার ইচ্ছা প্রকাশ করবে।

এর তৃতীয় সুফলটি হবে এই যে, ব্যবসায়িক অর্থ ও ঋণ বাবত অর্থ উভয়ের খাত সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। বর্তমান ব্যবস্থায় পুঁজির অধিকাংশ, বরং প্রায় সমগ্র অংশই সংগৃহীত হয় ঋণের আকারে। অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো মুনাফাজনক কাজের জন্যে বা অমুনাফাজনক কাজের জন্যে অথবা কোনো সাময়িক প্রয়োজনে বা দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের জন্যে অর্থ গ্রহণ করুক না কেন, সর্বাবস্থায়ই একটি নির্ধারিত সুদভিত্তিক ঋণের শর্তেই তা লাভ করা সম্ভব হয়। কিন্তু সুদ নিষিদ্ধ হয়ে যাবার পর ঋণের খাত কেবলমাত্র অমুনাফাজনক কাজ বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিছক সাময়িক প্রয়োজনের জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে। এ অবস্থায় কর্জে হাসানার নীতির ভিত্তিতে এর ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে। আর অন্যান্য খাতে, যেমন শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভজনক প্রকল্পগুলোতে ঋণের পরিবর্তে মুযারাবাত বা লাভভিত্তিক অংশীদারিত্বের (profit sharing) ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করা হবে।

সুদবিহীন অর্থব্যবস্থায় এ দুটো বিভাগ কিভাবে কাজ করবে, এখন আমি সংক্ষেপে এ আলোচনা করবো।

সুদবিহীন অর্থব্যবস্থায় ঋণ সংগ্রহের উপায়

প্রথমে ঋণের ব্যাপারে আসা যাক। কারণ লোকেরা সবচেয়ে বেশী ভয় করছে যে, সুদ নিষিদ্ধ হয়ে গেলে ঋণ পাওয়া যাবে না। কাজেই আমরা প্রথমে একথা প্রমাণ করবো যে, এই অপবিত্র প্রতিবন্ধকতাটি (সুদ) দূর হয়ে যাবার পর ঋণ লাভের পথ কেবল অনিরুদ্ধই থাকবে না, বরং বর্তমানের তুলনায় তা অধিকতর সহজ ও উন্নততর হবে।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ

বর্তমান ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণের একটিই মাত্র পথ আছে। সে পথটি হচ্ছে, দরিদ্র ব্যক্তি পুঁজিপতি ও মহাজনের নিকট থেকে এবং সম্পদশালী ব্যক্তি ব্যাংক থেকে সুদীঋণ গ্রহণ করতে পারে। এ অবস্থায় তারা যে কোনো উদ্দেশ্যে যে কোনো পরিমাণ ঋণ পেতে পারে। তবে মহাজন ও ব্যাংকারকে নিয়মিত সুদ আদায় ও আসল প্রত্যর্পণের গ্যারান্টি দিতে হবে। সে কোনো পাপ কাজ করার জন্যে, কোনো অপ্রয়োজনীয় কাজে অথবা বিপুল ব্যয়ের জন্যে বা যথার্থই কোনো প্রয়োজন পূরণের উদ্দশ্যে ঋণ নিয়ে থাক না কেন। বিপরীতপক্ষে কোনো ব্যক্তির গৃহে যদি অর্থাভাবে কোনো মৃতের দাফন কাফনও আটকে থাকে, তাহলেও পুঁজিপতি ও ব্যাংকারকে নিয়মিত সুদ আদায় ও আসল প্রত্যর্পণের নিশ্চয়তা বিধান না করা পর্যন্ত সে কোথাও থেকেও একটি পয়সা ঋণ লাভ করতে পারবে না। উপরন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় দরিদ্রের বিপদ ও ধনীর পুত্রদের বখাটেপনা উভয়টাই পুঁজিপতিদের আয়ের উত্তম সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এক্ষেত্রে স্বার্থপরতার সাথে সাথে এমন চরম হৃদয়হীনতার পরিচয় দেয়া হয় যার ফলে সুদী ঋণের জালে আটকা পড়া ব্যক্তি সুদ পরিশোধ বা আসল প্রত্যর্পণের ব্যাপারে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। যার কাছ থেকে সুদ ও আসল আদায় করার দাবী জানানো হচ্ছে, সে প্রকৃতপক্ষে কোন্ বিপদের মধ্যে অবস্থান করছে, তা তলিয়ে দেখার মতো মানসিকতা কারোর নেই। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ লাভ করার জন্যে বর্তমান ব্যবস্থা যে সুযোগ সুবিধা দান করেছে, এ হচ্ছে তার আসল রূপ। এবার ইসলাম সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা ও যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে এ প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করবে তা অনুধাবন করা যাক।

প্রথমত এ ব্যবস্থায় অমিতব্যয়িতা ও পাপবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে ঋণ গ্রহণের দুয়ার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। কারণ এখানে সুদের লোভে অপ্রয়োজনীয় ঋণ দানকারীর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। এ অবস্থায় ঋণ সম্পর্কিত যাবতীয় লেনদেন

স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেবলমাত্র সঙ্গত প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং বিভিন্ন সময় ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ সঙ্গত মনে হবে, কেবল সেই পরিমাণই দেয়া-নেয়া হবে।

উপরন্তু এ ব্যবস্থায় যেহেতু ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণদাতার কোনো প্রকার লাভ বা সুবিধা গ্রহণের অবকাশ থাকবে না, তাই ঋণ বাবদ গৃহীত অর্থ প্রত্যার্পণের পথও অধিকতর সহজ হবে। সর্বনিম্ন আয়ের অধিকারী লোকেরাও ছোট ছোট কিস্তিতে অতি সহজে ও দ্রুত ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হবে। যে ব্যক্তি কোনো জমি, গৃহ বা সহায় সম্পত্তি বন্ধক রাখবে, তার এ বন্ধকী সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেয়া অধিকতর সহজ ও দ্রুত হবে। কারণ তার সম্পত্তির খাতে লব্ধ আয় সুদের খাতে জমা না হয়ে ঋণ বাবদ গৃহীত অর্থ পরিশোধের খাতে জমা হবে। এভাবে অতি দ্রুত ও সহজে তার ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। এতগুলো সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যদি ঘটনাক্রমে কারোর ঋণ পরিশোধ সম্ভব না হয়, তাহলে রাষ্ট্রের বায়তুলমাল তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং বায়তুলমাল থেকে তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়া হবে। এমনকি, কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি নিজের কোনো সহায় সম্পত্তি না রেখেই মারা যায়, তাহলেও তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব বায়তুলমালের উপর বর্তাবে। এসব কারণে সচ্ছল ও ধনী লোকদের জন্যে নিজের অভাবী প্রতিবেশীকে সাহায্য করা বর্তমান ব্যবস্থার ন্যায় এতটা কঠিন ও বিরক্তিকর ঠেকবে না।

এরপরও কোনো ব্যক্তি তার পাড়া প্রতিবেশীদের নিকট থেকে ঋণ লাভে সক্ষম না হলে বায়তুলমালের দুয়ার তার জন্যে অবশ্যি খোলা থাকবে। সেখান থেকে সে সহজে ঋণ লাভ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বায়তুলমালের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে সর্বশেষ উপায় হিসেবে। ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পরস্পরকে ঋণ দেয়া ইসলামী সমাজে ব্যক্তিবর্গের জন্যে অপরিহার্য কর্তব্যরূপে চিহ্নিত। কোনো সমাজের ব্যক্তিবর্গের নিজেদের এ ধরনের নৈতিক দায়িত্বসমূহ নিজেরাই উপলব্ধি করা ও তা পালন করতে উদ্যোগী হওয়া সংশ্লিষ্ট সমাজের সুস্থতারই লক্ষণ। যদি দেখা যায়, কোনো গ্রাম, পল্লী বা জনবসতির কোনো অধিবাসী তার প্রতিবেশীদের নিকট থেকে ঋণ পাচ্ছে না বলে বাধ্য হয়ে বায়তুলমালের শরণাপন্ন হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে সেখানকার নৈতিক পরিবেশ বিকৃত হয়ে গেছে। কাজেই এ ধরনের কোনো ঘটনা বায়তুলমালে পৌঁছার পর কেবলমাত্র ঋণ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির প্রয়োজন পূর্ণ করলেই চলবে না, বরং সাথে সাথেই নৈতিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিভাগকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং কাল বিলম্ব না করে ঐ জরাগ্রস্ত জনবসতিকে রোগমুক্ত করার প্রতি নজর দিতে হবে, যেখানকার অধিবাসীরা প্রয়োজনের সময় তাদের এক প্রতিবেশী ভাইকে কোনো প্রকার সাহায্য করতে সক্ষম হয়নি। এ ধরনের কোনো

ঘটনার খবর একটি সৎ ও সুস্থ নৈতিক ব্যবস্থায় এমন আলোড়ন ও অস্থিরতা সৃষ্টি করবে, যেমন একটি বস্তুবাদী ব্যবস্থায় কলেরা বা মহামারীর ঘটনা অস্থিরতা ও আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ সংগ্রহ করার জন্যে ইসলামী ব্যবস্থায় আর একটি পদ্ধতি অবলম্বিত হতে পারে। তা হচ্ছে, সকল ব্যবসায়ী কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্যে যেসব আইনগত অধিকার নির্ধারিত থাকবে, অপরিহার্য প্রয়োজনের সময় তাদেরকে ঋণ দেয়ার অধিকারটিও তার অন্তর্ভুক্ত হবে। উপরন্তু সরকার নিজেও নিজের উপর এ দায়িত্বটি চাপিয়ে নেবেন এবং উন্মুক্ত হৃদয়ে তাদের এ অধিকার আদায়ের চেষ্টাও করবেন। এ ব্যাপারটির কেবল নৈতিক চরিত্রটাই মুখ্য নয়, বরং এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চরিত্রও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিজের কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্যে সুদবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করলে কেবলমাত্র যে একটি নেকী অর্জিত হবে তা নয়, বরং যেসব কারণে কর্মচারীরা দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, দুরবস্থা, শারীরিক কষ্ট ও বস্তুগত ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয় সেগুলোর মধ্যে থেকে একটি বড় কারণ দূরীভূত হবে। এসব বিপদ থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারলে তারা নিশ্চিন্ত হবে। এর ফলে তাদের কর্মক্ষমতা বেড়ে যাবে। তাদের নিশ্চিন্ততা তাদেরকে অনিষ্টকর ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জীবন দর্শন থেকেও বাঁচাবে। স্থূল দৃষ্টিতে হয়তো এর ফল কিছুই নাও দেখা যেতে পারে; কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করলে যে কেউ অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারবে যে, সামগ্রিকভাবে কেবল সমগ্র সমাজই নয়, বরং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক পুঁজিমালিক ও কারখানা মালিক এবং প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ লাভবান হবে তা সুদের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান হবে, যা আজকের বস্তুবাদী ব্যবস্থায় নিছক নির্বুদ্ধিতাজনিত সংকীর্ণমনস্কতার কারণে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ

এরপর ব্যবাসায়ীদের নিত্যকার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যেসব ঋণের প্রয়োজন হয় তার আলোচনায় আসা যাক। বর্তমানে এ উদ্দেশ্যে ব্যাংক থেকে সরাসরি স্বল্পমেয়াদী ঋণ (SHORT TERMS LOAN) নেয়া হয় অথবা হুন্ডী (BILLS OF EXCHANGE) ভাঙ্গানো হয়।[১] উভয় অবস্থায় ব্যাংক তার উপর সামান্য পরিমাণ সুদ নিয়ে থাকে। এটি

---

১. ইসলামী ফিকাহয় এ বস্তুটির জন্য 'সাফাতাজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়। এটি একটি পারিভাষিক শব্দ। এর পদ্ধতি হচ্ছে, যেসব ব্যবসায়ী পরস্পরের মধ্যে লেনদেন করে এবং ব্যাংকের সাথেও কারবার করে তারা নগদ অর্থ আদায় না করেও বিপুল পরিমাণ পণ্য পরস্পর থেকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে এবং এক মাস দু'মাস বা চার মাসের জন্যে দ্বিতীয় পক্ষকে হুন্ডি লিখে দেয়। যদি দ্বিতীয় পক্ষ নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে, তাহলে অপেক্ষা করে এবং যথাসময়ে ঋণ আদায় হয়ে যায়।

ব্যবসায়ের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন যাকে বাদ দিয়ে আজ কোনো কাজই চলতে পারে না। তাই ব্যবসায়ীরা সুদ রহিত করার কথা শুনে সর্বপ্রথম যে দুশ্চিন্তা কবলিত হয়, তা হচ্ছে এ অবস্থায় নিত্যকার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ঋণ পাবে কোথা থেকে? সুদের লোভ না দেখালে ব্যাংক ঋণ দেবে কেন আর হুন্ডিই বা ভাঙিয়ে দেবে কেন?

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে ব্যাংকে সকল আমানত (DEPOSITS) বিনা সুদেই জমা থাকে এবং যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরাও তাদের লাখ লাখ টাকা বিনা সুদেই জমা রাখে সে ব্যাংক তাদেরকে বিনা সুদে ঋণ দেবে না কেন এবং তাদের হুন্ডিই বা ভাঙিয়ে দেবে না কেন? সে যদি সোজা পথে এতে সম্মত না হয়, তাহলে ব্যবসা আইনের সাহায্যে তার নিজের গ্রাহকদেরকে (CUSTOMERS) এ সুবিধা দেবার জন্যে তাকে বাধ্য করা হবে। এটি তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

আসলে এ কাজের জন্যে কেবলমাত্র ব্যবসায়ীদের নিজেদের গচ্ছিত রাখা অর্থই যথেষ্ট হতে পারে। তবুও প্রয়োজন হলে অন্য খাত থেকেও ব্যাংক এজন্য কিছু অর্থ ব্যবহার করতে পারে। মোটকথা নীতিগতভাবে এ কথা স্বীকার করে নিতেই হবে যে, যে ব্যক্তি সুদ নিচ্ছে না, সে সুদ দেবে না। তা ছাড়া নিত্যকার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিনা সুদে ঋণ পেতে থাকা সামগ্রিক অর্থনীতির দৃষ্টিতে ব্যবসায়ীদের জন্যে লাভজনকও বটে।

তবে এ লেনদেনের বিনিময়ে সুদ না পেলে ব্যাংক তার খরচপত্র চালাবে কিভাবে? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, চলতি হিসেবের (CURRENT ACCOUNT) সমস্ত অর্থই যেক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট বিনা সুদে জমা থাকবে, সেক্ষেত্রে ঐ অর্থের একটা অংশ বিনা সুদে দেয়া মোটেই ক্ষতিকর হবে না। কারণ এ অবস্থায় হিসেব-নিকেশে ও খাতাপত্র ঘাঁটাঘাটির জন্যে ব্যাংককে যে সামান্য খরচপত্র বহন করতে হবে তা তার নিকট যে পরিমাণ অর্থ জমা হবে তা থেকে গৃহীত লাভের তুলনায় বহুলাংশে কম। তবুও যদি ধরে নেয়া যায় যে, এ পদ্ধতি কার্যকর করা সম্ভব নয়, তাহলে ব্যাংক নিজের পক্ষ থেকে এ ধরনের কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে তার সকল ব্যবসায়ী গ্রাহকদের নিকট থেকে একটি মাসিক বা যান্মাসিক ফী আদায় করতে পারে, যা দিয়ে তার খরচপত্র চালানো সম্ভব। সুদের পরিবর্তে এ ফী হবে তাদের জন্যে অনেক সস্তা। কাজেই তারা সানন্দে এটা আদায় করে দেবে।

কিন্তু মেয়াদ কালের মধ্যে যদি তার অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে সে ঐ হুন্ডিটি ব্যাংকে জমা দেয়, যে ব্যাংকের সাথে তাদের উভয়ের লেনদেন আছে। ব্যাংক থেকে অর্থ উঠিয়ে সে নিজের কাজ সমাধা করে। একে হুন্ডি ভাঙানো বলা হয়।

সরকারের অলাভজনক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে

ঋণের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাতটি সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। সরকারকে সাময়িক দুর্ঘটনার জন্যে, কখনো অমুনাফাজনক রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে, আবার কখনো যুদ্ধের জন্যে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় এসব উদ্দেশ্যে প্রায় সবক্ষেত্রে ঋণ এবং তাও আবার সুদীঋণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থায় এর সম্পূর্ণ উল্টোটাই করা সম্ভব হবে। সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করার সাথে সাথেই দেশের জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের অর্থ ও সম্পদরাশি চাঁদাস্বরূপ এনে সরকারের তহবিলে জমা করে দেবে। কারণ সুদ রহিত করে যাকাত পদ্ধতির প্রচলনের কারণে তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এত বেশী সমৃদ্ধি ও দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে যাবে যে, নিজেদের উদ্বৃত্তের একটি অংশ সরকারকে দান করার ব্যাপারে তারা মোটেই ইতস্তত করবে না। এরপরও প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ না পাওয়া গেলে সরকার ঋণ চাইবে এবং লোকেরা ব্যাপকহারে সরকারকে সুদমুক্ত ঋণ দেবে। কিন্তু এতেও যদি প্রয়োজন পূর্ণ না হয়, তাহলে নিজের কাজ সমাধা করার জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে।

এক ঃ যাকাত ও খুমুসের (যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের নিকট থেকে সংগৃহীত মালে গনীমতের এক পঞ্চমাংশ) অর্থ ব্যবহার করবে।

দুই ঃ সরকারী নির্দেশের মাধ্যমে সকল ব্যাংক থেকে তাদের আমানতলব্ধ অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করবে। এভাবে জবরদস্তি ঋণ গ্রহণ করার অধিকার অবশ্যি সরকারের আছে, যেমন প্রয়োজনের সময় সরকার জনগণকে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে ভর্তি করা (CONSCRIPTIONS) এবং তাদের বাড়ী, গাড়ী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস জোরপূর্বক লাভ করার (REQUISITION) অধিকার রাখে।

তিন ঃ সর্বশেষ উপায় হিসেবে নিজের প্রয়োজন অনুপাতে নোট ছাপিয়েও সরকার কাজ চালাতে পারে। এটি আসলে জনগণের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণেরই নামান্তর হবে। তবে এটি হবে অবশ্যি সর্বশেষ উপায়। যাবতীয় উপায় ও পথ বন্ধ হয়ে গেলে অগত্যা এ পথ অবলম্বন করা যেতে পারে। কারণ এ পথে ক্ষতির ফিরিস্তি দীর্ঘতর।

আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ

আন্তর্জাতিক ঋণের ক্ষেত্রে একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, বর্তমান সুদভিত্তিক অর্থনীতির দুনিয়ায় নিজেদের জাতীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কোথাও থেকে আমরা বিনা সুদে ঋণ পাবো না। এক্ষেত্রে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে বাইরে থেকে

আমাদের কোনো ঋণ গ্রহণ করতে না হয়। অন্তত ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোনো বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ না করা উচিত, যতক্ষণ না আমরা নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে বিনা সুদে ঋণ দিয়ে দুনিয়ার সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি। আর ঋণ দেয়ার ব্যাপারে বলা যেতে পারে, ইতিপূর্বে আমরা যে আলোচনা করে এসেছি তারপর সম্ভবত কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি একথা স্বীকার করতে ইতস্তত করবেন না যে, একবার যদি আমরা সাহস করে নিজেদের দেশে সুদমুক্ত ও যাকাতভিত্তিক সুস্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হই তাহলে নিঃসন্দেহে অতি অল্পদিনের মধ্যে আমাদের আর্থিক অবস্থা এতই সচ্ছল হবে এবং আমরা এতই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবো, যার ফলে আমাদের কেবল বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজনই হবে না তা নয় বরং চারপাশের অভাবী দেশগুলোকে বিনা সুদে ঋণ দিতেও আমরা সক্ষম হবো। যেদিন আমরা দুনিয়ায় এ আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হবো, সেদিনটি আধুনিক যুগের ইতিহাসে কেবল অর্থনৈতিক দিক দিয়েই নয় বরং রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিক দিয়েও হবে একটি বৈপ্লবিক দিন। সেদিন অন্য জাতির সাথে আমাদের সমস্ত লেনদেন হবে সুদবিহীন অর্থব্যবস্থার ভিত্তিতে। এমনকি, সম্ভবত অন্যান্য দেশও একের পর এক নিজেদের মধ্যে সুদ না নেয়ার জন্য চুক্তি সম্পাদন করতে থাকবে। এমনও হতে পারে, বিশ্ব জনমত সুদখোরীর বিরুদ্ধে একবাক্যে ঘৃণা প্রকাশ করবে, যেমন ১৯৪৫ সালে ব্রিটেন উড্সের ব্যাপারে ইংল্যান্ডের জনগণ করেছিল। এটা নিছক কোনো আকাশকুসুম কল্পনা নয়, বরং আজো দুনিয়ার চিন্তাশীল লোকদের মতে আন্তর্জাতিক ঋণের উপর সুদ চাপিয়ে দেয়ার কারণে দুনিয়ায় রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত মন্দ ও ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। এ পথ পরিহার করে সমৃদ্ধিশালী দেশগুলো যদি নিজেদের উদ্বৃত্ত অর্থ অনুন্নত ও দুর্দশাগ্রস্ত দেশগুলোকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্যে ব্যয় করে এবং এজন্যে আন্তরিক ও সহানুভূতিপূর্ণ প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে এর দ্বিবিধ সুফল পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক ও তমদ্দুনিক দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক তিক্ততা বৃদ্ধি পাবার পরিবর্তে প্রীতি ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একটি দুর্দশাগ্রস্ত ও দেউলিয়া দেশের রক্ত শোষণ করার তুলনায় একটি ধনী দেশের সাথে ব্যবসা করা অনেক বেশী লাভজনক প্রমাণিত হবে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এ জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনার কথা চিন্তা করছেন এবং যাদের বলার ক্ষমতা আছে তারা বলেও যাচ্ছেন। কিন্তু কেবল চিন্তা ও বলাতেই কাজ হবে না। এজন্য এমন একটি প্রজ্ঞাসম্পন্ন জাতির প্রয়োজন, যে প্রথমে নিজের ঘরে সুদের অস্তিত্ব বিলোপ করে দেবে, অতঃপর সামনে অগ্রসর হয়ে আন্তর্জাতিক লেনদেনকেও অভিশাপের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে নিজের প্রচেষ্টা শুরু করবে।

লাভজনক কাজে পুঁজি বিনিয়োগ

ঋণের পর আর একটি বিষয়ের পর্যালোচনা প্রয়োজন। সে বিষয়টি হচ্ছে, আমাদের অভিপ্রেত অর্থব্যবস্থায় ব্যবসায়িক অর্থনীতির স্বরূপ কি দাঁড়াবে। এ ব্যাপারে আমি পূর্বেই কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছি। তা হচ্ছে, সুদ রহিত করার কারণে, লোকদের জন্যে পরিশ্রম ও ঝুঁকি উভয়টিকে এড়িয়ে, নিরাপত্তা ও নির্দিষ্ট মুনাফার গ্যারান্টি সহকারে কোনো কাজে নিজেদের পুঁজি বিনিয়োগ করার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যাকাত প্রবর্তনের কারণে তাদের জন্যে নিজেদের ধন সম্পদ কোনো কাজে না লাগিয়ে সিন্দুকে আবদ্ধ রাখা এবং যক্ষের ন্যায় তা আগলে বসে থাকারও পথ বন্ধ হয়ে যাবে। উপরন্তু একটি যথার্থ ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার বর্তমান থাকার কারণে লোকদের বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার কোনো সুযোগ থাকবে না। তাদের উদ্বৃত্ত আয় তারা এভাবে নষ্ট করতে পারবে না। অতঃপর যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয় করে তাদেরকে অবশ্যি নিম্নোক্ত তিনটি পথের মধ্য থেকে যে কোনো একটি পথ বেছে নিতে হবে।

এক ঃ যদি সে আরো বেশী অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশী না হয় তাহলে তার আয়ের উদ্বৃত্তাংশ কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োগ করবে। এজন্য সে নিজে কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে ঐ অর্থ ওয়াকফ করবে, অথবা জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে চাঁদা দেবে, বা কোনো প্রকার স্বার্থোদ্ধারের প্রত্যাশা না করে, ইসলামী সরকারের হাতে তুলে দেবে। ইসলামী সরকার উন্নয়নমূলক বা জনসেবা ও জাতীয় চরিত্র পুনর্গঠনের কাজে তা ব্যয় করবে। বিশেষ করে, রাষ্ট্রের পরিচালক ও প্রশাসকগণের আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও বুদ্ধিমত্তার উপর যদি জনগণের আস্থা থাকে, তাহলে শেষোক্ত পন্থাটিকে অবশ্যি অগ্রাধিকার দিতে হবে। এভাবে সমাজ সংস্কার ও জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যে সরকার ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিনা চেষ্টায় ও বিনা অর্থব্যয়ে হামেশা বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদ লাভ করতে থাকবে। এজন্য তাদের কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ তো দূরের কথা আসল পরিশোধ করার জন্যেও জনগণের ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দিতে হবে না।

দুই ঃ সে আরো বেশী অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশী নয় ঠিকই, কিন্তু নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ নিজের জন্যে সংরক্ষিত রাখতে চায়, এ অবস্থায় তার অর্থ সে ব্যাংকে আমানত রাখবে। ব্যাংক তা আমানত রাখার পরিবর্তে নিজের উপর ঋণ হিসেবে গণ্য করবে। ব্যাংক তার গচ্ছিত অর্থ যখন সে চাইবে বা চুক্তিতে উল্লেখিত সময়ে ফেরত দেয়ার জামানত দেবে। এইসাথে ঋণ হিসেবে গৃহীত এ অর্থ ব্যবসায়ে খাটিয়ে তা থেকে মুনাফা অর্জন করার অধিকারও ব্যাংকের থাকবে। ঐ মুনাফার কোনো অংশ অবশ্যি আমানতকারদের দিতে হবে না, বরং তা পুরোপুরি ব্যাংকের নিজস্ব

সম্পত্তি হবে। ইমাম আবু হানীফার (র) ব্যবসা মূলত এ ইসলামী নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতো। তাঁর আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও অস্বাভাবিক সুনামের কারণে লোকেরা নিজেদের অর্থের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে তা তাঁর নিকট জমা রাখতো। ইমাম সাহেব এ অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করার পরিবর্তে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং তা নিজের ব্যবসায়ে খাটাতেন। তাঁর ফার্মে পাঁচ কোটি দিরহাম পরিমাণ অর্থ এভাবেই অন্য লোকদের ঋণ বাবদ রক্ষিত অর্থ হিসেবে জমা ছিল। ইসলামের নীতি হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি কারো নিকট কিছু আমানত রাখলে আমানত রক্ষাকারী তা ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু আমানত নষ্ট হয়ে গেলে তার উপর কোনো খেসারতও আরোপিত হয় না।

বিপরীতপক্ষে ঐ অর্থ যদি ঋণ হিসেবে দেয়া হয় তাহলে ঋণগ্রহীতা তা ব্যবহার করার ও তা থেকে লাভবান হবার অধিকার রাখে এবং যথাসময়ে ঋণ আদায় করার দায়িত্বও তার উপর আরোপিত হয়। এ নিয়ম অনুসারে আজো ব্যাংক পরিচালিত হতে পারে।

তিন ঃ যদি সে নিজের উদ্বৃত্ত অর্থ কোনো মুনাফা অর্জনকারী কাজে খাটাতে চায়, তাহলে তা করার একটিমাত্র পথ আছে। তা হচ্ছে, তার উদ্বৃত্ত অর্থ মুযারাবাত (অর্থাৎ লাভ ও লোকসানে সমানভাবে অংশগ্রহণ) ভিত্তিতে মুনাফাজনক কাজে খাটানো। সরকার বা ব্যাংক যে কোনটির তত্ত্বাবধানে এ কাজ বা ব্যবসা চলতে পারে।

সে নিজে যদি এ অর্থ খাটাতে চায়, তাহলে তাকে কোনো ব্যবসায়ে অংশগ্রহণের শর্তাবলী স্থির করতে হবে। সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে লাভ ও লোকসান কি হারে বন্টিত হবে আইনগতভাবে তা নির্ধারণ করতে হবে। এভাবেই যৌথ মূলধনভিত্তিক কোম্পানীতে (JOINT STOCK COMPANY) অংশগ্রহণেও এর একটিমাত্র পথ রয়েছে, অর্থাৎ সোজাসুজি সেখানে কোম্পানীর শেয়ার কিনতে হবে। বণ্ড, ডিবেঞ্চার ও এ ধরনের অন্যান্য বস্তু—যেগুলোর ক্রেতা কোম্পানী থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পেতে থাকে—সেগুলোর আসলে কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।

সরকারের মাধ্যমে অর্থ খাটাতে চাইলে তাকে সরকারের কোনো মুনাফাজনক স্কীমে অংশীদার হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, সরকার কোনো পানি-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা কার্যকর করতে চায়। সরকার তার এ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে জনগণকে তাতে অংশগ্রহণের জন্যে আহবান জানাবে। যেসব লোক, প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক এতে পুঁজি সরবরাহ করবে তারা সরকারের সাথে এতে অংশীদার হয়ে যাবে এবং একটি নির্ধারিত ও স্থিরীকৃত হারে এতে লব্ধ মুনাফার অংশ পেতে থাকবে। লোকসান হলে তার অংশও পুঁজির আনুপাতিক হার অনুযায়ী সরকার ও অন্যান্য অংশীদারদের মধ্যে বন্টিত হবে। একটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সরকার ক্রমান্বয়ে

লোকদের অংশ নিজে কিনে নেয়ার অধিকারও রাখবে। এমনকি, চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পানি বিদ্যুতের যাবতীয় কাজ পুরোপুরি সরকারী মালিকানাধীন এসে যাবে।

কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থার ন্যায় এ ব্যবস্থায়ও সবচেয়ে বাস্তবানুগ ও উপযোগী হবে তৃতীয় পথটি। অর্থাৎ লোকেরা ব্যাংকের মাধ্যমে নিজেদের পুঁজি মুনাফাজনক কাজে বিনিয়োগ করবে। তাই এ সম্পর্কে আমি একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। এর ফলে সুদ রহিত করার পর ব্যাংকিং-এর কারবার কিভাবে চলবে এবং মুনাফা প্রত্যাশী লোকেরা তা থেকে কিভাবে লাভবান হবে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ব্যাংকিং এর ইসলামী পদ্ধতি

ইতিপূর্বে আমি ব্যাংকিং সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি তাতে ব্যাংকিং ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ—একথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না এবং উদ্দেশ্য হতেও পারে না। আসলে ব্যাংকিংও আধুনিক সভ্যতা লালিত বহুবিধ বস্তুর মধ্যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বস্তু। এর মধ্যে কেবলমাত্র একটি অনিষ্টকর শয়তানী বস্তুর অনুপ্রবেশের কারণে এ সমগ্র ব্যবস্থাটিই পুঁতিগন্ধময় হয়ে উঠেছে। এতদসত্ত্বেও এ ব্যবস্থাটি বর্তমান যুগে বৈধ পথে মানবতার বহুবিধ সেবা করে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এর উপকারিতা ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। যেমন, অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠানো ও তা আদায়ের ব্যবস্থা করা, বিদেশের সাথে লেনদেনের সুযোগ সুবিধা দান করা, মূল্যবান বস্তু সংরক্ষণ করা, ঋণপত্র (LETTERS OF CREDIT), ট্রাভেলারস চেক, ড্রাফট প্রভৃতি জারী করা, কোম্পানীর অংশ বিক্রির ব্যবস্থা করা এবং বহুবিধ এজেন্সী সার্ভিস চালু করা, যার ফলে ব্যাংকে সামান্যতম কমিশন দেয়ার ব্যবস্থা করে আজকের যুগের একজন অতি ব্যস্ত ব্যক্তি বহু রকমের ঝামেলা থেকে মুক্তি পায়। এসব কাজ অবশ্যি অব্যাহত থাকতে হবে এবং এজন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকতে হবে। উপরন্তু সমাজের উদ্বৃত্ত অর্থসম্পদ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকার পরিবর্তে একটি কেন্দ্রীয় রক্ষণাগারে (RESERVOIR) সঞ্চিত থাকা এবং সেখান থেকে জীবনের সবক্ষেত্রে, সর্বত্র সব সময় সহজভাবে পৌঁছে যাওয়া ব্যবসা, শিল্প, কৃষি এবং তমদ্দুন ও অর্থনীতির জন্যে অত্যন্ত কল্যাণকর ও আজকের অবস্থার প্রেক্ষিতে একান্ত অপরিহার্য বিবেচিত হবে। এইসাথে সাধারণ লোকদের জন্যেও এটাই সহজতম ব্যবস্থা বলে মনে হয়। তাদের প্রয়োজন পূর্ণ হবার পরও যে সামান্য পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকবে তাকে কোনো মুনাফাজনক কাজে খাটাবার জন্যে তারা নিজেরা পৃথক পৃথকভাবে সুযোগ অনুসন্ধান করার পরিবর্তে এসব অর্থ একটি কেন্দ্রীয় ভান্ডারে জমা করে দেবে এবং সেখানে একটি সন্তোষজনক পদ্ধতিতে সামগ্রিকভাবে তাদের সবার অর্থ কাজে লাগানো এবং তা থেকে

লব্ধ মুনাফা যথাযথভাবে বন্টন করার ব্যবস্থা হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, একনাগাড়ে এবং স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক কাজে ব্যপৃত থাকার কারণে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ও কর্মীবৃন্দ এ বিভাগে এমন একটি দক্ষতা ও সূক্ষ্মদর্শিতা লাভ করে, যা ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত অন্যান্য কর্মীরা লাভ করতে সক্ষম হয় না। এ দক্ষতাপূর্ণ সূক্ষ্মদর্শিতা অবশ্যি একটি অতি মূল্যবান সম্পদ। যদি তা নিছক পুঁজিপতির স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্রে পরিণত না হয়ে ব্যসায়ীদের সাহায্য সহযোগিতায় ব্যবহৃত হয় তাহলে তা অত্যন্ত উপকারী ও কল্যাণকর প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু ব্যাংকিং-এর এসব কল্যাণ ও সুফলকে বিশ্ব মানবতার জন্যে অকল্যাণ, অন্যায়, অনিষ্ট ও বিপর্যয়ে পরিণত করছে যে বস্তুটি, তা হচ্ছে সুদ। আর একটি অনিষ্টকর বস্তু এর সাথে মিশে এ বিপর্যয় ও অনিষ্টকে ভয়াবহ রূপ দিয়েছে। তা হচ্ছে, সুদের চুম্বক আকর্ষণে যেসব পুঁজি বিভিন্ন স্থান থেকে এসে ব্যাংকে কেন্দ্রীভূত হয়, তা কার্যত কতিপয় স্বার্থ-শিকারী পুঁজিপতির সম্পদে পরিণত হয়ে যায় এবং তারা অত্যন্ত গর্হিত মানবতাবৈরী ও সমাজ বিরোধী পদ্ধতিতে সেগুলো ব্যবহার করে। ব্যাংকিংকে এ দুটো দোষ থেকে মুক্ত করতে পারলে তা একটি পবিত্র কাজে পরিণত হয়ে যাবে এবং মানব সমাজ ও সভ্যতার জন্যে বর্তমান অবস্থার তুলনায় অনেক বেশী উপকারী ও কল্যাণকর হবে। সুদখোরীর পরিবর্তে এ পবিত্র পদ্ধতিটি যদি পুঁজিপতি ও সুদখোর মহাজনদের জন্যেও আর্থিক দিক দিয়ে অধিকতর লাভজনক প্রমাণিত হয় তাহলেও আশ্চর্যের কিছু নেই।

যারা মনে করে সুদ রহিত হবার পর ব্যাংকের অর্থ সংগ্রহ বন্ধ হয়ে যাবে, তারা বিরাট ভুলের শিকারে পরিণত হয়েছে। তারা মনে করে সুদ পাবার আশা যখন নেই তখন লোকেরা তাদের আয়ের উদ্বৃত্তাংশ ব্যাংকে জমা রাখবে কেন? অথচ তখন সুদ না পেলে কি হবে, মুনাফা পাবার আশা তো থাকবে। আর যেহেতু মুনাফার অংশ অনির্ধারিত ও সীমাহীন থাকবে, তাই সাধারণ সুদের হারের তুলনায় কম মুনাফা পাবার সম্ভাবনা যে পরিমাণ থাকবে, ঠিক সে পরিমাণ সম্ভাবনা থাকবে বেশী এবং যথেষ্ট মোটা অংকের মুনাফা পাবার। এইসাথে ব্যাংক তার সাধারণ কাজগুলোও করে যাবে, যেগুলোর জন্যে বর্তমানে লোকেরা এর শরণাপন্ন হয়ে থাকে। কাজেই নিশ্চিত বলা যায় যে, বর্তমানে যে পরিমাণ ধন ব্যাংকের নিকট আমানত রাখা হয়, সুদ রহিত হবার পরও একই পরিমাণ ধন আমানত রাখা হবে। বরং সে সময় সব রকম ব্যবসায়ের ব্যাপক প্রসারের কারণে মানুষের কাজ-কারবার বেড়ে যাবে, আয়ও আরো বেড়ে যাবে। কাজেই বর্তমান অবস্থার তুলনায় আরো অনেক বেশী পরিমাণ আয়ের উদ্বৃত্তাংশ ব্যাংকে জমা হবে।

এ পুঁজির যে পরিমাণ অংশ কারেন্ট একাউন্ট বা চলতি হিসেবের খাতায় জমা হবে,

তাকে ব্যাংক কোনো মুনাফাজনক কাজে লাগাতে পারবে না, যেমন বর্তমানেও পারে না। তাই এ পুঁজি মূলত দুটো বড় বড় কাজে ব্যবহৃত হবে। এক. প্রতিদিনকার নগদ লেনদেন এবং দুই. ব্যবসায়ীদেরকে বিনা সুদে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দান এবং বিনা সুদে হুন্ডি ভাঙ্গানো।

ব্যাংকে যেসব দীর্ঘমেয়াদী আমানত রাখা হবে, তা অবশ্যি দু'ধরনেরই হবে। এক ধরনের আমানতের মালিকের উদ্দেশ্য কেবল নিজের অর্থের সংরক্ষণ। এ ধরনের লোকদের অর্থ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে ব্যাংক নিজেই ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করবে, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় ধরনের মালিকেরা তাদের অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায়ে খাটাতে চায়। তাদের অর্থ আমানত হিসেবে রাখার পরিবর্তে ব্যাংক-কে তাদের সাথে একটি সাধারণ অংশীদারীত্বের চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে। অতঃপর ব্যাংক এ পুঁজিকে তার অন্যান্য পুঁজিসহ 'মুযারাবাত' (লাভ-লোকসানে সমভাবে অংশগ্রহণ ভিত্তিক) নীতির ভিত্তিতে ব্যবসায়ে, শিল্প প্রকল্পে, কৃষি ফার্মে বেসরকারী ও সরকারের বিভিন্ন মুনাফাজনক কাজে খাটাতে পারবে। এর থেকে সামগ্রিকভাবে দুটো বড় বড় উপকার সাধিত হবে। প্রথমত পুঁজিপতি ও পুঁজি বিনিয়োগকারীর স্বার্থ ব্যবসায়ের স্বার্থের সাথে একাকার হয়ে যাবে। কাজেই ব্যবসায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি তার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকবে এবং যেসব কারণে বর্তমান দুনিয়ার সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি ও চড়ামূল্যের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তা প্রায় সবই খতম হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, পুঁজিপতির অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টি ও ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক ও শৈল্পিক বিচক্ষণতা, যা বর্তমান বিশ্বে পারস্পরিক সংঘর্ষ ও বিরোধে মত্ত রয়েছে; সে সময় অবশ্যি পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে চলবে এবং তাতে সবারই উপকার হবে। অতপর এ পদ্ধতিতে ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করবে, তা দিয়ে নিজের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নির্দিষ্ট অনুপাতে নিজের অংশীদার ও আমানতকারীদের মধ্যে বন্টন করবে। এ ব্যাপারে পার্থক্য কেবল এতটুকুন হবে যে, বর্তমান অবস্থায় অংশীদারদের মধ্যে মুনাফা (DIVIDENDS) বন্টন হয় এবং আমানতকারীদেরকে সুদ দেয়া হয়, আর তখন উভয়কেই মুনাফার অংশ দেয়া হবে। বর্তমানে আমানতকারীরা একটি নির্ধারিত হারে সুদ পেয়ে থাকে, আর তখন কোনো নির্দিষ্ট হার থাকবে না। বরং কম বেশী যে পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হবে সব একই অনুপাতে বন্টিত হবে। বর্তমানে যে পরিমাণ লোকসান ও দেউলিয়া হবার ভয় রয়েছে তখনও তা-ই থাকবে। বর্তমানে বিপদ এবং এর মোকাবিলায় সীমাহীন মুনাফার সম্ভাবনা উভয়টিই কেবলমাত্র ব্যাংকের অংশীদারের জন্যে নির্দিষ্ট। কিন্তু তখন এ দুটো সম্ভাবনা আমানতকারী ও অংশীদার উভয়ের জন্যে সমভাবে বর্তমান থাকবে।

ব্যাংকিং পদ্ধতির আর একটি ক্ষতি নিরসনের জন্যে আমাদেরকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। মুনাফার আকর্ষণে যে অর্থ ব্যাংকে সঞ্চিত হয়, তার সুসংবদ্ধ শক্তির কর্তৃত্ব কার্যত মাত্র গুটিকয়েক ব্যাংকারের হাতে চলে যায়। এ ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং (CENTRAL BANKING) এর সকল কাজ বায়তুলমাল বা স্টেট ব্যাংকের হাতে সোপর্দ করতে হবে। অন্যদিকে আইনের মাধ্যমে সকল প্রাইভেট ব্যাংকের উপর সরকারী দখল ও কর্তৃত্ব এমনভাবে সুদৃঢ় করতে হবে যার ফলে ব্যাংকাররা নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তির অপ্রিয় ব্যবহারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

সুদবিহীন অর্থনীতির যে সংক্ষিপ্ত নকশাটি আমি পেশ করলাম, তা পর্যালোচনা করার পর সুদ রহিত করে সুদমুক্ত অর্থনীতির ভিত্তিতে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারটি আদৌ বাস্তবানুগ নয়, একথা বলার কোনো অবকাশই থাকে না।

৫. অমুসলিম দেশ থেকে অর্থনৈতিক ও শিল্পঋণ গ্রহণ[১]

প্রশ্ন ঃ বর্তমান যুগে যখন এক দেশ অন্য দেশের সংগে সম্পর্ক ছেদ করে উন্নতি করতে পারেনা, তখন কোনো ইসলামী রাষ্ট্র বিদেশের সাথে সম্পর্কিত আর্থিক, সামরিক বাহিনীর জন্য টেকনিক্যাল সাহায্য সামগ্রী অথবা আন্তর্জার্তিক ব্যাংক থেকে সুদের হারে ঋণ গ্রহণ করাকে কি একেবারেই হারাম সাব্যস্ত করবে। তা ছাড়াও বস্তুগত, শিল্প, কৃষি ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে বিরাট ব্যবধান গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্যের উন্নত (Advanced) দেশসমূহ এবং মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষ করে, ইসলামী দেশগুলির মধ্যে অথবা এই আনবিক যুগে Haves FmÄ Haves not দের মধ্যে, যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে তা কি করে দূর করা যাবে?

অধিকন্তু দেশের অভ্যন্তরেও কি সকল ব্যাংকিং এবং ইনস্যুরেন্স (ব্যাংক ও বীমা) ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দেয়ার হুকুম দেওয়া হবে? সুদ, সেলামী, মুনাফা, লাভ, সুনাম (Goodwill) এবং বেচাকেনার দালালী ও কমিশনের জন্য ইজতিহাদ করে কোনো পথ কি বের করা যেতে পারে? ইসলামী দেশগুলি সুদ, মুনাফা, লাভ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে কোনো অবস্থায় ঋণের আদান প্রদান করতে পারে কি?

জবাব ঃ কোনো সময়ই ইসলামী দেশগুলি অমুসলিম দেশের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের পলিসি গ্রহণ করেনি, আজও করবে না। কিন্তু ঋণের অর্থ ঋণ চেয়ে বেড়ানো নয়, তাও আবার তাদের প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে। এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে আজকের যুগের হীনমনা লোকেরাই। কোনো দেশে ইসলামী সরকার কায়েম থাকলে বস্তুগত উন্নতির পূর্বে সে সরকার নিজ জাতির নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের চেষ্টা করবে। নৈতিক অবস্থার সংশোধন বলতে বুঝায়, দেশের শাসক, শাসনযন্ত্র পরিচালনার কর্মচারীবৃন্দ এবং জনগণ ঈমানদার (বিশ্বস্ত) হবে। অধিকার আদায়ের কথা চিন্তা করার পূর্বে নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে ব্রতী ও সচেতন হতে হবে এবং সবার সামনে একটি উন্নত মহান লক্ষ্য থাকবে যার জন্য জান-মাল, সময়-শ্রম এবং যোগ্যতা সবকিছু কুরবানী করার জন্য তারা তৈরী থাকবে। উপরন্তু, শাসকবর্গ জনগণের উপর এবং গোটা জাতি শাসকবর্গের উপর আস্থাশীল থাকবে এবং তারা বুঝবে যে, তাদের শাসকরা তাদেরই কল্যাণের জন্য কাজ করছেন। এ অবস্থা একবার পয়দা হয়ে গেলে

---

১. তরজমানুল কুরআন ঃ নভেম্বর ১৯৬১ ই.।

কোনো জাতির পক্ষে বিদেশ থেকে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণের অবস্থাই সৃষ্টি হতে পারেনা। দেশের মধ্যে ধার্যকৃত ট্যাক্সের শতকরা একশত ভাগই আদায় হবে এবং তার পুরোটাই জাতির উন্নতির কাজে ব্যয়িত হবে, আদায় করার সময়ও কোনো অসততা হবে না এবং ব্যয় করার সময়ও অন্য পথে ব্যয় হবেনা। এর পরও ঋণের প্রয়োজন হলে গোটা জাতি পুঁজির এক বড় অংশ স্বেচ্ছায় চাঁদা আকারে, একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সুদবিহীন ঋণ আকারে এবং এক অংশ লাভক্ষতির ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব গ্রহণ আকারে যোগাড় করে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। আমার অনুমান, দেশে যদি ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে লেনদেনের অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়, তাহলে সম্ভবত খুব শীঘ্রই দেশ অন্যদের থেকে ঋণ গ্রহণ করার পরিবর্তে ঋণ দানের যোগ্যতা অর্জন করবে।

ধরে নেয়া যাক, কোনো অবস্থায় সুদের শর্তে বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ যদি অপরিহার্যই হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করা যদি একান্তই দরকার হয়ে পড়ে এবং এর জন্য দেশের মধ্য থেকে কোনো পুঁজির ব্যবস্থাও না হয়, তাহলে সে অবস্থায় বিদেশ থেকে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু তবু দেশের অভ্যন্তরে সুদের লেনদেন জায়েয হওয়ার কোনো পথ নেই। দেশের মধ্যে সুদের লেনদেন বন্ধ করা যেতে পারে এবং পুরো আর্থিক ব্যবস্থা (Financial system) সুদ ছাড়া চালানো যায়। আমার প্রণীত 'সুদ' বইটিতে আমি এটা প্রমাণ করেছি যে, ব্যাংক ব্যবস্থা সুদ ব্যতীত লভ্যাংশের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেও চালানো যেতে পারে। একইভাবে বীমা ব্যবস্থায়ও এমন সংস্কার করা যেতে পারে, যার দ্বারা অনৈসলামী ব্যবস্থা গ্রহণ না করেও বীমার সকল উপকার হাসিল করা যেতে পারে। দালালী, মুনাফা, সেলামী, কমিশন অথবা সুনাম (Goodwill) ইত্যাদির পৃথক পৃথক শরয়ী মর্যাদা রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবায়িত হলে তখন অবস্থা পর্যালোচনা করে, হয় সাবেক অবস্থাকে বহাল রাখা হবে, অথবা জরুরী সংশোধন করা হবে।

(তরজমানুল কুরআন, খন্ড ৫৭, সংখ্যা ২, নভেম্বর ১৯৬১ ইং)

অষ্টম অধ্যায়

যাকাতের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব

নামাযের পর ইসলামের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ হলো যাকাত। ইবাদতের বেলায় সাধারণত নামাযের পর রোযার নাম নেয়া হয়। ফলে সাধারণ মানুষ নামাযের পরই রোযার স্থান মনে করে আসছে। কিন্তু আমরা কুরআন মজীদ থেকে জানতে পারি, ইসলামে নামাযের পর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব হলো যাকাতের। এ দুটি হলো ইসলামের অট্টালিকার প্রধান স্তম্ভ। এ দুটি ভেংগে পড়লে ইসলামের অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়।

যাকাতের অর্থ

'যাকাত' অর্থ পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা; নিজের অর্থসম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ অভাবী ও মিসকীনদের জন্যে বের করে দেয়াকে যাকাত বলা হয়। এ কাজটাকে যাকাত বলার কারণ হলো, এভাবে যাকাতদাতার অর্থসম্পদ এবং তার নিজের আত্মা পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া অর্থসম্পদ থেকে আল্লাহর বান্দাদের অধিকার বের করে দেয়না, তার অর্থসম্পদ অপবিত্র থেকে যায়। সেইসাথে তার আত্মা থেকে যায় অপবিত্র। কেননা, আল্লাহ যে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, এজন্যে তার অন্তরে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা নাই। তার আত্মা এতোই ছোট, স্বার্থপর এবং অর্থপিচাশ যে, সেই মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেও তার আত্মা কুণ্ঠিত হয়, যিনি আসল প্রয়োজনের চাইতে অধিক ধনসম্পদ দিয়ে তার প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। এমন ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো নেক কাজ করতে পারে এবং নিজের দীন ও ঈমানের খাতিরে কোনো প্রকার ত্যাগ ও কুরবানী করতে পারে, কিছুতেই এমন আশা করা যায়না। তাই, এমন ব্যক্তির আত্মাও নাপাক আর তার সঞ্চিত অর্থসম্পদও নাপাক।

যাকাত নবীগণের সুন্নত

সেই প্রাচীন যামানা থেকেই সকল নবীর উম্মতদের উপর নামায ও যাকাত ফরয ছিলো। কোনো নবীর কালেই দীন ইসলাম এই দুইটি ফরয থেকে মুক্ত ছিলনা। সাইয়েদুনা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর বংশের নবীদের কথা উল্লেখ করার

পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ٥ (الانبياء : ٧٣)

"আমি তাদেরকে জনগণের নেতা বানিয়েছি। তারা আমার হুকুম মোতাবিক জনগণকে পথ প্রদর্শন করতো। আমি তাদের কাছে অহী করেছিলাম কল্যাণমূলক কাজ করার, সালাত কায়েম করার আর যাকাত পরিশোধ করার। তারা ছিলো মূলত আমার একান্ত অনুগত বাধ্যগত।" [আল আম্বিয়া ঃ ৭৩]

সাইয়েদুনা ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ٥ (مريم : ٥٥)

"সে তার স্বজনদেরকে সালাত এবং যাকাতের নির্দেশ দিতো। আর তার মালিকের কাছে সে ছিলো বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।" [সূরা মরিয়াম ঃ ৫৫]

মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর কওমের জন্যে এই বলে দোয়া করেছিলেন, হে প্রভু, আমাদেরকে এই দুনিয়ার কল্যাণও দান কর আর পরকালের কল্যাণও দান কর। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন তা আপনারা জানেন? তিনি বলেছিলেন ঃ

عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ٥ (الاعراف : ١٥٦)

"আমি যাকে চাইবো, আমার আযাবে নিক্ষেপ করবো। তবে সকল জিনিসের উপর আমার রহমত পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। আমি এই রহমতের অধিকার কেবল তাদের জন্যেই লিখে রাখবো, যারা আমাকে ভয় করবে, যাকাত পরিশোধ করবে আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনবে।" [আল আ'রাফ ঃ ১৫৬]

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর (সা) পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যে ঈসা আলাইহিস সালামই ছিলেন শেষ নবী। আল্লাহ তাঁকেও নামাযের সাথে সাথে যাকাতেরও নির্দেশ প্রদান করেন ঃ

وَجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ـ (مريم : ٣١)

"আমি যেখানেই থাকিনা কেন, আল্লাহ আমাকে বরকত দান করেছেন। আর আমি যতোদিন বেঁচে থাকবো, ততোদিন আমাকে সালাত আদায় এবং যাকাত প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন।" [সূরা মরিয়াম ঃ ৩১]

এ থেকে জানা গেলো, প্রথম থেকেই প্রত্যেক নবীর যামানায় দীন ইসলাম নামায এবং যাকাতের এই দুই বড় খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আল্লাহর প্রতি ঈমানওয়ালা কোনো উম্মতকে এই দু'টি ফরয থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, এমন কখনো হয়নি।

এবার দেখুন, রাসূলে করীমের (সা) শরীয়তে এই দু'টি ফরয কিভাবে পরস্পর যুক্ত হয়ে একাকার হয়ে আছে। কুরআন মজীদ খুললেই প্রথমে যে আয়াত কয়টি আপনার চোখে পড়ে সেগুলি কী? সেগুলো হলো ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ- الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ٥ (البقرة : ٢-٣)

"এই কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব। এতে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয় নেই। এ কিতাব সেইসব পরহেযগার লোকদেরকে জীবন যাপনের সঠিক পথ বলে দেয়, যারা গায়েবে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২-৩]

এর পরই ঘোষণা দেয়া হয়েছে ঃ

أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"এই লোকেরাই তাদের প্রভুর দেয়া হিদায়াত লাভ করেছে আর এই লোকদের জন্যেই রয়েছে সাফল্য।" [আল বাকারা ঃ ৫]

অর্থাৎ যাদের মধ্যে ঈমান নেই, যারা সালাত কায়েম করেনা এবং যাকাত দেয় না, তারা হিদায়াতও লাভ করেনি আর তাদের ভাগ্যে সফলতাও জুটবেনা।

এরপর এই সূরার সামনের দিকে গেলে দেখবেন কয়েক পৃষ্ঠা পরই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ

أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ٥ (البقرة : ٤٣)

"সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর (অর্থাৎ জামায়াতের সাথে সালাত আদায় কর)।" [আল বাকারা ঃ ৪৩]

সূরা তাওবায় আল্লাহ তা'আলা কাফির ও মুশরিকদের সংগে যুদ্ধ করবার নির্দেশ দিয়েছেন। ধারাবাহিকভাবে কয়েক রুকু পর্যন্ত যুদ্ধের ব্যাপারেই হিদায়াত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ٥ (توبة : ١١)

"তারা যদি কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করে (অর্থাৎ ফিরে আসে), ঈমান আনে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই হয়ে যাবে।" [আত তাওবা ঃ ১১]

অর্থাৎ শুধুমাত্র কুফর আর শিরক থেকে তাওবা করা এবং ঈমানের ঘোষণা দেয়াই যথেষ্ট নয় বরং তাওবা ও ঈমানের প্রমাণ দিতে হবে। আর সত্যিই তারা কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে বলে তখনই প্রমাণিত হতে পারে, যখন তারা রীতিমতো সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। সুতরাং তারা যদি এই দু'টি বাস্তব কর্মের মাধ্যমে ঈমানের প্রমাণ দেয়, তবেই তারা তোমাদের দীনী ভাই। অন্যথায় তাদেরকে দীনী ভাই মনে করো না এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও বন্ধ করো না।

২. সামাজিক জীবনে যাকাতের স্থান

যাকাত এবং সাদাকা বুঝাবার জন্যে কুরআন মজীদের বিভিন্নস্থানে 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ 'আল্লাহর পথে খরচ করা।' কোনো কোনো স্থানে একথাও বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছুই খরচ কর, তা আল্লাহ 'কর্জ হাসানা' হিসেবে গ্রহণ করেন। এ যেনো তোমরা আল্লাহকে ঋণ প্রদান করছো আর আল্লাহ তোমাদের কাছে ঋণী হয়ে থাকছেন। বহু স্থানে একথাও বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছুই প্রদান করবে, তার প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর। কিন্তু তিনি প্রতিদান কেবল সেই পরিমাণই প্রদান করবেন না যা তোমরা তাঁর পথে খরচ করেছো, বরং তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী প্রদান করবেন।॥ এবার বিষয়টি একটু ভেবে দেখুন।

চিন্তা করে দেখুন, আসমান ও যমীনের মালিক কি আপনাদের মুখাপেক্ষী? (নাউযুবিল্লাহ)। সেই পবিত্র সত্তার কি আপনাদের নিকট থেকে ঋণ নেয়ার প্রয়োজন আছে? সেই রাজাধিরাজ, সীমাহীন ধনভান্ডারের মালিক কি তাঁর নিজের প্রয়োজনে আপনাদের নিকট কিছু ধার চান? মায়াযাল্লাহ, কখনো নয়। আপনারা তো তাঁরই দানে জীবন যাপন করছেন। তাঁর জীবিকা ভোগ করছেন আপনাদের প্রত্যেক ধনী গরীবের কাছে যা কিছু আছে, সব তাঁরই দান। আপনাদের নিজেদের কিছুই নেই। আপনাদের দরিদ্রতম ব্যক্তি থেকে নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী পর্যন্ত সকলেই তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর নিজের জন্যে আপনাদের কাছে হাত পাতার ও ধার করয চাওয়ার কোনো প্রয়োজনই তাঁর নেই এবং থাকতে পারে না। আসলে এটাও আপনাদের প্রতি তাঁর বিরাট দয়া ও মহানুভবতা। তিনি আপনাদের নিজেদের কাজে, আপনাদেরই উপকার ও কল্যাণার্থে ব্যয় করতে বলেন। এই ব্যয়কে তিনি তাঁর নিজের পথের ব্যয় বলেন। তিনি বলেন, এর দ্বারা আমি তোমাদের কাছে ঋণী হই। এর প্রতিদান প্রদান করা আমার কর্তব্য। তোমরা তোমাদের সমাজের অভাবী এবং মিসকীনদের দান কর। সেই গরীবরা এর প্রতিদান কোথা থেকে দেবে? তাদের তো কিছুই নেই। তাই তাদের পক্ষ থেকে এর প্রতিদান আমি দেবো। তোমরা তোমাদের অভাবী আত্মীয় স্বজনকে দান কর। এর বিনিময় তাদের কাছে চেয়োনা। এর বিনিময় আমিই তোমাদের দেবো। তোমরা তোমাদের এতিম, বিধবা, অক্ষম, মুসাফির এবং বিপদগ্রস্ত ভাইদের যা কিছুই দেবে, তা আমার 'হিসাবে' আমার নামে লিখে রেখো। এগুলো তাদের কাছে ফেরত চেয়োনা। এগুলো ফেরত দেবার দায়িত্ব আমার।

তোমাদের দেনা আমি পরিশোধ করবো। তোমরা তোমাদের দুর্দশাগ্রস্ত ভাইদেরকে ধার দাও। তাদের কাছ থেকে সুদ নিওনা। দান ফেরত চেয়ে তাদেরকে লজ্জিত করোনা, বেকায়দায় ফেলোনা। তারা দান ফেরত দিতে না পারলে তাদেরকে সিভিল জেলে পাঠাবেনা। তাদের ঘরদোর, কাপড় চোপড় এবং হাড়িপাতিল ক্রোক করোনা। তাদের সন্তান সন্ততিকে ঘর থেকে বের করে দিওনা। তোমাদের ধার পরিশোধ করার দায়িত্ব তাদের নয়, এ দায়িত্ব আমি নিলাম। তারা যদি 'আসল' শোধ করে দেয়, তবে সুদ পরিশোধ করবো আমি। আর তারা যদি 'আসল'ও শোধ করতে না পারে, তবে আমি 'সুদ আসল' দুটোই পরিশোধ করবো। এভাবে নিজেদের সমাজকল্যাণমূলক কাজে এবং সমাজের মানুষের উপকার ও সাহায্যার্থে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তা থেকে যদিও তোমরাই লাভবান হবে, কিন্তু তা পরিশোধ করার দায় দায়িত্ব আমার। আমি এর পাই-কড়ি পুরো মুনাফাসহ তোমাদেরকে ফেরত দেবো।

আপনারা জানেন মানুষ প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা যালিম এবং জাহিল ظَلُوْمًا جَهُوْلًا হয়ে থাকে। মানুষের দৃষ্টি খুবই সংকীর্ণ। বেশী দূর পর্যন্ত তার নযর যায়না। তার আত্মা খুবই ছোট হয়ে থাকে। তাতে বেশী বড় এবং উঁচু ধারণা খুব কমই খাপ খেয়ে থাকে। মানুষ খুবই স্বার্থপর। কিন্তু নিজের স্বার্থেরও কোনো প্রশস্ত ধারণা তার মগজে উদয় হয় না। মানুষ অত্যন্ত তাড়াহুড়াকারী। خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ (মানুষকে তাড়াহুড়াকারীরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে)। সে প্রতিটি কাজের ফল এবং ফায়দা খুব তাড়াতাড়ি দেখতে চায়। সে সেই ফলাফলকেই ফলাফল এবং সেই ফায়দাকেই ফায়দা মনে করে যেটাকে সে নিজে ফলাফল ও ফায়দা বলে ধারণা করে এবং অবিলম্বে দেখতে পায়। সুদূরপ্রসারী ফলাফল পর্যন্ত তার দৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়না। বড় আকারের যে কল্যাণ ও ফায়দা অর্জিত হয়, যেসব কল্যাণ সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে, মানুষ তা খুব কমই অনুভব করতে পারে, এমনকি, অনেক সময় অনুভব পর্যন্ত করতে পারেনা। এগুলো হলো মানুষের প্রকৃতিগত দুর্বলতা। এই দুর্বলতার ফলে মানুষ সবকিছুতে কেবল নিজের স্বার্থ দেখে থাকে। আবার সেই স্বার্থও খুবই ক্ষুদ্র আকারের, দ্রুত অর্জিত এবং তার নিজের মনমতো হওয়া চাই। সে বলে, আমি যাকিছু উপার্জন করেছি এবং উত্তরাধিকার সূত্রে যাকিছু পেয়েছি, তা আমার; অপর কারো তাতে অংশ নেই। আমার এ অর্থসম্পদ কেবল আমারই প্রয়োজনে, আমারই ইচ্ছেমতো, এবং আমারই আরাম আয়েশ ও ভোগে বিহারে ব্যয় হওয়া উচিত। কিংবা এমন কাজে ব্যয় হওয়া উচিত, যেসব কাজের লাভ অবিলম্বে আমার হাতে ফিরে আসবে। আমি টাকা খরচ করলে তার বিনিময়ে আরো অধিক টাকা আমার হাতে ফিরে আসতে হবে। কিংবা আমার আরাম আয়েশ ও সুখ সুবিধা বাড়তে হবে। অথবা অন্তত আমার নামধাম বাড়তে হবে, খ্যাতি অর্জিত হতে হবে, সম্মান বৃদ্ধি পেতে হবে, উপাধি লাভ করতে হবে, উচ্চাসন লাভ

করতে হবে, মানুষকে আমার সামনে নত হতে হবে এবং লোকমুখে সর্বত্র আমার নাম ছড়িয়ে পড়তে হবে। এর কোনোটিই যদি আমি লাভ করতে না পারি, তবে কেন আমি টাকা খরচ করবো? আমার পাশে যদি কোনো এতীম না খেয়ে মরে, কোনো নিঃস্ব অভুক্ত থাকে, তাতে আমার কি? তাদের আহার যোগাবার দায়িত্ব আমি নেবো কেন? এ দায়িত্ব ছিল তার বাপের। তার উচিত ছিল সন্তানদের জন্যে কিছু রেখে যাওয়া, কিংবা জীবনবীমা করে যাওয়া। আমার প্রতিবেশী কোনো বিধবার যদি দুঃখে দিন কাটে, তাতে আমার কি? তার জন্যে চিন্তা করে যাওয়া উচিত ছিল তার স্বামীর। কোনো প্রবাসী যদি নিঃসম্বল হয়ে পড়ে, তবে তাতে আমার কি যায় আসে? সে পুরো পাথেয় যোগাড় না করে বোকার মতো কেন ঘর থেকে বের হয়েছে? কেউ যদি দুরবস্থায় পড়ে থাকে, পড়ুকগে। তাকেও আল্লাহ্ তা'আলা আমার মতো হাত পা দিয়েছেন। উপার্জন করে নিজের প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব তার। আমি কেন তাকে সাহায্য করবো? আমি দিলে তাকে ঋণ দেবো এবং আসলের সাথে সূদও আদায় করে নেবো। কেননা আমার টাকা তো আর বিনাশ্রমে উপার্জিত হয়নি। আমি যদি আমার টাকা দিয়ে বাড়ী তৈরী করি, গাড়ি কিনি, কিংবা কোনো লাভজনক কাজে খাটাই, তাতে আমার কিছুনা কিছু লাভ আসবে। সেও তো আমার টাকা দিয়ে কোনো না কোনোভাবে লাভবান হবে। তবে কেন আমি সেই লাভের অংশ আদায় করবনা?

এ ধরনের স্বার্থপর মানসিকতার কারণে ধনশালী ব্যক্তি তার ধনস্তূপের উপর বিষধর সাপের মতো ফণা তুলে বসে থাকে। আর খরচ যদি করেও, তবে কেবল নিজের স্বার্থেই করে। যেখানে সে নিজের স্বার্থ দেখবেনা, সেখানে তার পকেট থেকে একটি পয়সাও বের হবেনা। কোনো গরীবকে যদি সে সাহায্য করেও, সেটা কিন্তু সাহায্য নয়; বরং এর মাধ্যমে আসলে সে তাকে লুট করে নেয়। এবং যে পরিমাণ দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশী উসূল করে নেয়। কোনো মিসকীনকে যদি কিছু দেয়, তবে তাকে নিজের অনুগ্রহের উসীলায় আধমরা করে ছাড়ে এবং তাকে এতোটা অপমানিত লাঞ্ছিত ও নাজেহাল করে ছাড়ে যে, তার মান ইজ্জতকে সম্পূর্ণ ধূলিস্যাত করে দেয়। তার মধ্যে সামান্য আত্মসম্মান বোধটুকুও অবশিষ্ট থাকতে দেয়না। জাতীয় কোনো সেবামূলক কাজে অংশ নেবার আগেই সে দেখে নেয়, তাতে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ কী পরিমাণ অর্জিত হবে? যেসব কাজে তার ব্যক্তিগত কোনো লাভ দেখবেনা, সেগুলো সব তার সাহায্য থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে।

এরূপ নিকৃষ্ট মানসিকতার পরিণতি কি দাঁড়ায়? এর অশুভ পরিণতি কেবল সমাজ জীবনের জন্যেই ধ্বংসকর নয়; বরং সেই ব্যক্তিটির জন্যেও ক্ষতিকর, যে নিজের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও অজ্ঞতার কারণে এটাকে নিজের জন্যে লাভজনক মনে করছে। মানুষের মধ্যে যখন এ ধরনের মানসিকতা কাজ করে, তখন একদিকে জাতির যাবতীয় সম্পদ

গুটিকতক লোকের হাতে এসে পুঞ্জিভূত হয়ে পড়ে। অপরদিকে অসংখ্য বনিআদম সম্পূর্ণ সহায় সম্পদহীন হয়ে পড়ে। সম্পদশালী লোকেরা অর্থের জোরে জোঁকের মতো চুষে চুষে সম্পদের পাহাড় গড়তে থাকে। গরীবদের অবস্থা দিন দিন খারাপ থেকে আরো খারাপ হতে থাকে। যে সমাজে দারিদ্র্য সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, সে সমাজ হাজারো রকমের অন্যায় এবং বিকৃতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তার দৈহিক কাঠামো ভেংগে পড়ে। তার মধ্যে রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সে সমাজে কাজ করা এবং সম্পদ উপার্জন করার শক্তি কমে যেতে থাকে। মূর্খতা ও নিরক্ষরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন ব্যাপক আকার ধারণ করে। সে সমাজের লোকেরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে অপরাধমূলক কাজ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হাইজ্যাক, লুটতরাজ, এবং চুরি ডাকাতির মতো নিকৃষ্ট অপরাধেও তারা নিমজ্জিত হয়। তখন সে সমাজে এক সাধারণ ও সর্বব্যাপী অশান্তি দেখা দেয়। অর্থশালীদেরকে হত্যাযজ্ঞের শিকার হতে হয়। লুটতরাজ ও বিভিন্ন রকম সন্ত্রাসের শিকার হতে হয়। শেষ পর্যন্ত তারা এমনভাবে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যে, পৃথিবীতে তাদের চিহ্নটুকুও আর অবশিষ্ট থাকেনা।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে, আসলে আমরা যে সমাজে বাস করি, তার কল্যাণ ও উন্নতির সাথেই আমাদের কল্যাণ ও উন্নতি জড়িত। আপনি যদি আপনার অর্থসম্পদ থেকে আপনার ভাইদের সাহায্য করেন, তবে তা আবর্তিত হয়ে বহু কল্যাণ সাথে নিয়ে আপনার কাছেই ফিরে আসবে। কিন্তু আপনি যদি সংকীর্ণ দৃষ্টির বশবর্তী হয়ে তা নিজের কাছেই জমা করে রাখেন কিংবা কেবল নিজের ব্যক্তিস্বার্থেই ব্যয় করেন, তবে শেষ পর্যন্ত তা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে বাধ্য। যেমন ধরুন, আপনি যদি একটি এতীম শিশুকে প্রতিপালন করেন এবং তাকে পড়ালেখা শিখিয়ে সমাজের একজন উপার্জনক্ষম সদস্যে পরিণত করে দেন, তবে আসলে আপনি সমাজের সম্পদই বৃদ্ধি করলেন। আর সমাজের সম্পদ যখন বৃদ্ধি পাবে, তখন সমাজের একজন সদস্য হিসেবে আপনিও তার অংশ লাভ করবেন। তবে এই অংশ যে আপনি সেই বিশেষ এতীমটির যোগ্যতার ফলে লাভ করেছেন; যাকে আপনি সাহায্য করেছিলেন, তা হয়তো আপনি হিসেব করে মিলাতে পারবেন না। কিন্তু আপনি যদি সংকীর্ণ দৃষ্টির বশবর্তী হয়ে বলেন যে, আমি তাকে সাহায্য করবো কেন? তার বাপের উচিত ছিল তার জন্যে কিছু রেখে যাওয়া; তবে তো সে ভবঘুরের মতো টো টো করে ঘুরে বেড়াবে। বেকার অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। নিজের শ্রম খাটিয়ে সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি করবার যোগ্যতাই তার মধ্যে সৃষ্টি হবেনা। বরং সে যদি অপরাধপ্রবণ হয়ে আপনার ঘরেরই সিঁদ কাটে, তাতেও বিস্ময়ের কিছু থাকবেনা, এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, আপনি সমাজের একজন সদস্যকে অকর্মণ্য, ভবঘুরে এবং আপরাধপ্রবণ বানিয়ে কেবল তারই

ক্ষতি করেননি, নিজেরও ক্ষতি করলেন।

এই একটি উদাহরণকে সামনে রেখে আপনি নিজের দৃষ্টিকে আরো প্রশস্ত ও প্রসারিত করে দেখুন। বুঝতে পারবেন, যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কল্যাণের জন্যে অর্থ ব্যয় করেন বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার পকেট থেকে টাকা বেরিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু বের হয়ে এসে সে টাকা বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফল ফলাতে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত অসংখ্য লাভ এবং সুফল নিয়ে সেই পকেটে এসেই ঢুকে পড়ে, যেখান থেকে সে বের হয়েছিলো।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বার্থপরতা এবং সংকীর্ণ দৃষ্টির বশবর্তী হয়ে অর্থকড়ি নিজের পকেটেই চেপে ধরে রাখে এবং সমাজের কল্যাণে ব্যয় করেনা, বাহ্যিকভাবে সে নিজের টাকা রক্ষা করে বটে কিংবা সুদ খেয়ে তা বৃদ্ধি করে ঠিকই, কিন্তু আসলে সে নিজের বোকামীর কারণে নিজের অর্থকে ক্ষয় করে এবং নিজ হাতে নিজের ধ্বংসের সওদা করে। এ রহস্যটিকেই আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে এভাবে পেশ করেছেন ঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ط (البقرة : ٢٧٦)

"আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন আর সাদাকাকে দান করেন প্রবৃদ্ধি।" [আল বাকারা ঃ ২৭৬]

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ٥ (الروم: ٣٩)

"সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষের সম্পদে তোমরা যে সুদ দাও, আল্লাহর নিকট কিন্তু তাতে সম্পদ কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায়না। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত বের করে দাও, তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।" [আর রূম ঃ ৩৯]

কিন্তু এই রহস্য উপলব্ধি করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করার ক্ষেত্রে মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও অজ্ঞতা বিরাট প্রতিবন্ধক। মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস। পকেটের টাকা তো সে দুই চোখে দেখতে পায়। আর তাদের হিসাবের খাতা অনুযায়ী যে টাকা বাড়ছে, তাও তারা দেখতে পায় যে, হ্যাঁ বাড়ছে। কিন্তু তাদের হাত থেকে যে টাকা বের হয়ে যায় তা কোথায় বাড়ছে, কিভাবে বাড়ছে, কি পরিমাণ বাড়ছে এবং তার মুনাফা কবে নাগাদ তাদের কাছে ফিরে আসবে—তাতো তারা দেখতে পায়না। এ ক্ষেত্রে তারা মনে করে যে, আমার হাত থেকে এই পরিমাণ টাকা বেরিয়ে গিয়েছে এবং তা চিরদিনের জন্যে বেরিয়ে গেছে।

মানুষ তার বুদ্ধি ও প্রচেষ্টা দিয়ে আজ পর্যন্ত এই মূর্খতার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে

পারেনি। গোটা বিশ্বের এই একই অবস্থা। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী বিশ্ব। সেখানকার যাবতীয় কাজই পরিচালিত হয় সুদের ভিত্তিতে। সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও দিনদিন তাদের দুঃখকষ্ট এবং হতাশা বেড়েই চলেছে। অপরদিকে তৈরী হয়েছে এমন একদল লোক যাদের মনে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে রোষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তারা পুঁজিপতিদের ধনাগার লুণ্ঠন করার সাথে সাথে মানুষের সমাজ সভ্যতার কাঠামোকেও বিচূর্ণ করে দিতে উদ্যত।

মহাবিজ্ঞ মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনে মানুষের এই জটিল সমস্যার সমাধান পেশ করে দিয়েছেন। এই জটবদ্ধ জটিল সমস্যার তালা খুলবার চাবি হলো আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং পরকালের প্রতি ঈমান। মানুষ যদি সত্যিই মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে এবং যমীন ও আসমানের সমস্ত ধনভান্ডারের প্রকৃত মালিক যে আল্লাহ—সেকথা ভালভাবে জেনে বুঝে নেয়। সে যদি জেনে নেয় যে, মানুষের যাবতীয় কাজের ব্যবস্থাপনার চাবিকাঠি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার মুষ্টিবদ্ধে নিবদ্ধ, তাঁর কাছে প্রতিটি অণু পরমাণুর পর্যন্ত হিসাব নিকাশ রয়েছে এবং মানুষ পরকালে তার ভালমন্দ কাজের পুরস্কার কিংবা শাস্তি, সঠিক ও সুবিচারমূলক হিসাব অনুযায়ী লাভ করবে, তাহলে নিজের সংকীর্ণ দৃষ্টির উপর নির্ভর করার পরিবর্তে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে নিজের অর্থসম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা এবং লাভ লোকসানের ব্যাপারটি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে খুবই সহজ হতো।

এরূপ ঈমানের সাথে সে যা কিছুই ব্যয় করবে, তা মূলত আল্লাহ্কেই প্রদান করবে। তার হিসাব কিতাবও আল্লাহর খাতায়ই লেখা হবে। পৃথিবীতে তার এই দানের খবর কেউ জানুক বা না জানুক, মহান আল্লাহ্ অবশ্য তা অবগত থাকেন। পৃথিবীতে কেউ তার অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিক বা না দিক, আল্লাহ্ অবশ্যই তার এই অবদানের জন্যে তাকে পুরস্কৃত করবেন। আর আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁর পথে দানের জন্যে বিনিময় ও পুরস্কার দেয়ার ওয়াদা করেছেন, তখন সে অবশ্যি এর বিনিময় লাভ করবে এবং তা সে দুনিয়াতেও লাভ করতে পারে কিংবা পরকালেও লাভ করতে পারে, অথবা লাভ করতে পারে উভয় জগতেই।

মহান আল্লাহ তাঁর শরীয়তে এ নিয়ম কার্যকর করেছেন যে, তিনি প্রথমে নেকী ও কল্যাণমূলক কাজের সাধারণ নির্দেশ দিয়ে দেন, যাতে করে মানুষ নিজেরা সাধারণভাবে উত্তম পন্থা অবলম্বন করে। অতপর সেই নেকী ও কল্যাণের কাজ যথারীতি পালন করার জন্যে একটি বিশেষ পন্থাও নির্ধারিণ করে দেন।

যাকাতের বিষয়টিও ঠিক এরকম। এ ক্ষেত্রেও একটি রয়েছে সাধারণ নির্দেশ, আরেকটি বিশেষ নির্দেশ। একদিকে বলা হয়েছে, কৃপণতা ও সংকীর্ণ মনস্কতা থেকে মুক্ত থাক। কারণ এটাই যাবতীয় অন্যায় ও বিকৃতির মূল। তোমাদের নৈতিক চরিত্রে

আল্লাহ্‌র রং ধারণ কর। কারণ প্রতিটি মুহূর্তে তিনি তার সীমাহীন অগণিত সৃষ্টির প্রতি অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ করছেন। অথচ তাঁর উপর কারো কোনো অধিকার কিংবা দাবি নেই। যা কিছু পারো আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর। নিজের প্রয়োজন সেরে যতোটা পারো উদ্বৃত্ত রাখ এবং তা দ্বারা আল্লাহ্‌র অন্যান্য অভাবী বান্দাদের প্রয়োজন পূরণ কর। দীনের খিদমত এবং আল্লাহ্‌র কলেমা বিজয়ী করবার জন্যে জানমাল দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়োনা। যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে অর্থসম্পদের ভালবাসাকে আল্লাহ্‌র ভালবাসার জন্যে কুরবানী করে দাও।—এ হলো আল্লাহ্‌র পথে দানের সাধারণ নির্দেশ।

কিন্তু এইসাথে বিশেষ নির্দেশও দিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমার কাছে এই পরিমাণ অর্থসম্পদ জমা হলে, তা থেকে কমপক্ষে অবশ্যি এই পরিমাণ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে। তোমাদের ফল ফসল এই পরিমাণ উৎপাদিত হলে তা থেকে কমপক্ষে অবশ্যি এতোটা অংশ আল্লাহ্‌র পথে দিয়ে দাও। নামাযের ক্ষেত্রে যেমন কয়েক রাকাত নামায ফরয করার অর্থ এই নয় যে, কেবল এই কয় রাকাত নামায পড়ার সময়ই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে আর বাকী সময় তাঁকে ভুলে থাকবে। একইভাবে অর্থসম্পদের একটি নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র অংশ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হলো, তার অর্থ এই নয় যে, যাদের কাছে ঐ পরিমাণ অর্থকড়ি আছে কেবল তারাই আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে আর যাদের কাছে এর চেয়ে কম অর্থ আছে তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। এর অর্থ এটাও নয় যে, ধনীদের উপর যে পরিমাণ যাকাত ফরয করা হয়েছে, তারা কেবল সেই পরিমাণই আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে এবং এর পরে কোনো অভাবী লোক এলে তাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেবে, কিংবা দীনের কোনো খিদমত করবার সুযোগ এলে বলে দেবে যে, আমি তো যাকাত দিয়ে দিয়েছি, এখন আর আমার কাছ থেকে এক পয়সাও আশা করবেন না। যাকাত ফরয করার অর্থ কখনো এটা নয়। বরঞ্চ তার আসল অর্থ হলো, ধনীদেরকে কমপক্ষে এই পরিমাণ অর্থসম্পদ আল্লাহ্‌র পথে অবশ্যি ব্যয় করতে হবে এবং এর পরও প্রত্যেকে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে।

৩. যাকাত দানের নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে যাকাত সম্পর্কে তিনটি জায়গায় পৃথক পৃথক ফরমান জারি করেছেন ঃ

১। সূরা বাকারায় নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ - (آيت - ٢٦٧)

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যেসব পবিত্র অর্থসম্পদ উপার্জন করেছো এবং তোমাদের জন্যে আমরা জমি থেকে যে ফসল উৎপাদন করে দিয়েছি, তা থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর।" [আয়াত ঃ ২৬৭]

২। সূরা আনআমে বলা হয়েছে, যেহেতু আমরা যমীনে তোমাদের জন্যে বাগবাগিচা সৃষ্টি করে দিয়েছি এবং ফসলাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছি, সুতরাং ঃ

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ - (آيت - ١٤١)

"তার উৎপাদিত ফল ফসল তোমরা খাও আর ফসল কাটার দিন তা থেকে আল্লাহ্‌র অধিকার বের করে দাও।" [আয়াত ঃ ১৪১]

এদুটি আয়াতে জমির উৎপাদিত ফল ফসলের যাকাত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হানাফী ফকীহ্‌দের মতে স্বজাত উদ্ভিদ যেমন কাঠ, ঘাস, বাঁশ ছাড়া বাকী সকল প্রকার শস্য, তরিতরকারী এবং ফল মূল থেকে আল্লাহ্‌র অধিকার (যাকাত) বের করে দিতে হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক বর্ষণের ফলে যে ফসল উৎপাদিত হয়, তাতে আল্লাহ্‌র অধিকার (যাকাত) এক দশমাংশ। আর সেচ বা কৃত্রিম উপায়ে পানি দেয়ার মাধ্যমে যে ফসল উৎপাদিত হয় তাতে আল্লাহ্‌র অধিকার বিশ ভাগের একভাগ। ফসল কাটার সাথে সাথেই আল্লাহ্‌র অংশ পরিশোধ করা ওয়াজিব।

৩। অতপর সূরা তাওবায় বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۝ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝ (٣٤-٣٥)

"আর যারা সোনারূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেনা, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। সেই দিনের আযাবের সংবাদ তাদের জানিয়ে দাও, যেদিন তাদের এসব সোনারূপা আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তাদের কপাল ও পাঁজরে দাগ দেয়া হবে। তখন তাদের বলা হবে, এই হলো সেই অর্থসম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে। এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ ভোগ কর।" [আয়াত ঃ ৩৪-৩৫]

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ (٦٠)

"সাদাকা [যাকাত] হলো ফকীরদের জন্যে, মিসকীনদের জন্যে এবং সেইসব লোকদের জন্যে যারা যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, সেইসব লোকদের জন্যে যাদের মনজয় করা প্রয়োজন, গলদেশ মুক্ত করার জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহ্‌র পথে এবং মুসাফিরদের জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী মহাবিজ্ঞ।" [আয়াত ঃ ৬০]

এরপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا -

"তাদের অর্থসম্পদ থেকে যাকাত উসূল করে তাদেরকে পবিত্র পরিছন্ন কর।" [আয়াত ঃ ১০৩]

এই তিনটি আয়াত থেকে জানা গেলো, যে অর্থসম্পদ সঞ্চয় ও বৃদ্ধি করা এবং তা থেকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা হয়না, তা নাপাক—অপবিত্র। আর তা পবিত্র করার একটি উপায় রয়েছে; সেটা হলো তা থেকে আল্লাহর অধিকার বের করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, সোনা রূপা সঞ্চয়কারীদের যখন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দেয়া হয়, তখন মুসলমানরা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কেননা আয়াতটির অর্থ তো হলো, একটি পয়সাও নিজের কাছে জমা রেখোনা। সব খরচ করে ফেলো। অবশেষে সকলের পক্ষ থেকে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে করীমের (সা) কাছে এসে জনগণের ব্যাকুলতার কথা জানালেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ্ তো এই জন্যে তোমাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যেনো

অবশিষ্ট সম্পদ তোমাদের জন্যে পবিত্র হয়ে যায়। আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা) বলেছেন ঃ তুমি যখন তোমার অর্থসম্পদ থেকে যাকাত বের করে দিলে, তখন তোমার উপর যে কর্তব্য (ওয়াজিব) বর্তিয়েছিল, তা তুমি আদায় করে দিলে।

রৌপ্যের নিসাব দুইশত দিরহাম অর্থাৎ প্রায় ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা। স্বর্ণের নিসাব ৭$\frac{১}{২}$ তোলা। নিসাব ৫টি উট। ছাগলের নিসাব ৪০টি ছাগল। গরুর নিসাব ৩০টি গরু। ব্যবসায়ের সম্পদের নিসাব ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা রূপার সমান অর্থসম্পদ।

যে ব্যক্তির কাছে উপরোক্ত পরিমাণ কোনো সম্পদ বর্তমান থাকবে, বছরে শেষে তার চল্লিশ ভাগের একভাগ তাকে যাকাত দিতে হবে। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী স্বর্ণ রৌপ্য পৃথক পৃথকভাবে যদি কারো কাছে নিসাব পরিমাণ না থাকে, তবে উভয়টা একত্র করলে যদি কোনো একটির নিসাব পরিমাণ মূল্য হয়, তবে সেগুলো যাকাত দিতে হবে।

সোনা রূপা যদি কারো কাছে অলংকার আকারেও থাকে, তবে উমর (রা) এবং ইবনে মাসউদের (রা) মতে তার যাকাত দিতে হবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম (সা) দুইজন মহিলার হাতে সোনার চুড়ি দেখে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি এগুলোর যাকাত দিয়েছ? একজন বললো ঃ জী না, দিইনি। নবী করীম (সা) বললেন ঃ তবে কি তুমি এর বদলে কিয়ামতের দিন আগুনের চুড়ি পরা পছন্দ করবে? উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে সোনার পাঁয়জোর [একপ্রকার পদালংকার] ছিলো। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি 'সঞ্চয়'-এর অন্তর্ভূক্ত হবে? তিনি বললেন ঃ যদি এতে সোনার পরিমাণ যাকাতের নিসাব পরিমাণ হয় এবং তার যাকাত আদায় করা হয়ে থাকে, তবে তা 'সঞ্চয়'-এর অন্তর্ভুক্ত হবেনা। এই হাদীস দুইটি থেকে জানা গেলো, সোনা রূপা যদি অলংকার আকারেও থাকে, তবু তার যাকাত প্রদান করা ঠিক তেমনি ফরয, যেমন ফরয নগদ অর্থসম্পদের যাকাত দেয়া। অবশ্য হীরা জহরত এবং মনিমুক্তার যাকাত নেই।

৪. যাকাত ব্যয়ের খাত[১]

কুরআন মজীদে যাকাত পাওয়ার যোগ্য আট ধরনের হকদারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা তাওবার ষাট আয়াতে তাদের ব্যাখা দেয়া হয়েছে নিম্নরূপ ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۚ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

"এই সাদাকা (যাকাত) মূলত ফকীর মিসকীনদের জন্যে। আর সেইসব লোকদের জন্যে যারা সাদাকা সংক্রান্ত কর্মে নিযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া ঐসব লোকদের জন্যে যাদের মনজয় করা উদ্দেশ্য। এছাড়া গরদান মুক্ত করা, ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করা, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্যে। এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি অপরিহার্য বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আত তাওবা, আয়াত ঃ ৬০]

এ আয়াতে যাকাতের খাত বর্ণনা করা হয়েছে। সমাজের যেসব লোক সাহায্যের মুখাপেক্ষী এখানে সবিস্তারে তাদের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এ অর্থ দ্বারা অন্য যেসব কাজ করা যেতে পারে সেগুলোও স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। এভাবে এ আয়াত মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পলিসির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। এখানে যেসব খাতের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

১. ফকীর ঃ ফকীর মানে এমন প্রতিটি লোক, যে স্বীয় জীবিকার ব্যাপারে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। এ শব্দটি সাধারণভাবে সকল মুখাপেক্ষী লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শারীরিক বৈকল্যের কারণে হোক, কিংবা বার্ধক্য জনিত কারণে স্থায়ীভাবে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ার কারণে হোক, অথবা এমন ব্যক্তি, কোনো কারণে যে সাময়িকভাবে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে, তবে সাহায্য সহযোগিতা পেলে পুনরায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে—এ ধরনের সকল মুখাপেক্ষী লোকের জন্যে ফকীর শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন এতীম, বিধবা, বেকার এবং এমন লোক যারা সাময়িকভাবে দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছে।

---

১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা তাওবা, টীকা ৬১-৬৮ থেকে গৃহীত।

২. মিসকীন ঃ যাদের মধ্যে অভাব, দীনতা এবং ভাগ্যাহত অবস্থা পাওয়া যায় এমন সব লোকই মিসকীন। এদিক থেকে সাধারণ মুখাপেক্ষী লোকদের তুলনায় অধিকতর শোচনীয় অবস্থার লোকেরাই মিসকীন। নবী করীম (সা) এ শব্দটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশেষভাবে এমন লোকদের সাহায্য লাভের অধিকারী গণ্য করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপায় উপকরণ লাভ করতে পারছেনা এবং ঘোরতর শোচনীয় অবস্থায় নিমজ্জিত আছে। কিন্তু আত্মসম্মানবোধের কারণে তারা কারো কাছে হাত পাত্তেও পারছেনা আবার তাদের বাহ্যিক পজিশনও এমন নয় যে, অভাবী মনে করে লোকেরা তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াবে। হাদীসে মিসকীনের পরিচয় এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

اَلْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ لَايَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَايَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ ـ

"মিসকীন হলো সে, যে নিজের প্রয়োজন মেটাবার মতো অর্থসম্পদ পায়না, তাকে যে সাহায্য করতে হবে তাও বুঝা যায় না এবং প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে চাইতেও পারেনা।"

আসলে এরা হলেন সম্ভ্রান্ত মানুষ, তবে গরীব অসচ্ছল সমাজের সৎ লোকদের কর্তব্য নিজেদের আশে পাশে এ ধরনের যেসব লোক আছেন তাদের খোঁজ খবর নেয়া।

৩. আমেলীন ঃ অর্থাৎ সেইসব লোক যারা যাকাত সংগ্রহ করা, সংগৃহীত সম্পদ হিফাযত করা, সেগুলোর হিসাব কিতাব সংরক্ষণ করা এবং তা ব্যয় বন্টন করার কাজে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী। এসব কর্মচারী নিজেরা ফকীর মিসকীন না হলেও যাকাতের খাত থেকেই তাদের বেতন ভাতা দেয়া হবে। যাকাত সংগ্রহ এবং বন্টন করা যে ইসলামী সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য তা আলোচ্য আয়াত এবং সূরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াতের শব্দাবলী থেকে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

"তাদের অর্থসম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) উসূল কর।" (আয়াত-১০৩)

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নবী আকরাম (সা) নিজের জন্যে এবং নিজ বংশের (বনি হাশিম) জন্যে যাকাতের অর্থসম্পদ গ্রহণ করা হারাম ঘোষণা করে দিয়েছেন। তিনি নিজে বিনা পারিশ্রমিকেই সবসময় যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজ করেছেন। বনি হাশিমের অন্য সকলের জন্যেও তিনি এই একই বিধান চালু করেন। তিনি তাদের বলে দেন, তারা যদি বিনা পারিশ্রমিকে যাকাত আদায়-বন্টনের কাজ

করে, তবে সেটা তাদর জন্যে জায়েয। কিন্তু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যাকাত বিভাগের কোনো কাজ করা তাদের জন্যে বৈধ নয়। তাঁর বংশের কোনো ব্যক্তি যদি 'সাহেবে নিসাব' হয় তবে যাকাত প্রদান করা তার উপর ফরয। কিন্তু সে যদি গরীব, অভাবী, ঋণগ্রস্ত এবং মুসাফিরও হয়, তবু তার জন্যে যাকাত গ্রহণ করা বৈধ নয়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তা হলো বনি হাশিমের প্রদান করা যাকাত বনি হাশিমের কোনো ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারবে কিনা? ইমাম আবু ইউসুফের মতে পারবে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ তা-ও বৈধ নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

৪. **মুয়াল্লিফাতুল কুলূব ঃ** 'তালিফে কলব' মানে মনজয় করা। 'মুয়াল্লিফাতুল কুলূব' মানে সেইসব লোক যাদের মনজয় করা উদ্দেশ্য। মন জয় করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করার যে নির্দেশ এখানে দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো, যেসব লোক ইসলামের বিরোধিতায় তৎপর, তবে অর্থ দিয়ে বিরোধিতা থেকে নিবৃত্ত করা যেতে পারে; কিংবা কাফেরদের দলের এমন লোক যাদেরকে অর্থ দিলে দল ভেংগে এসে মুসলিমদের সাহায্যকারী হতে পারে; অথবা এমন লোক যারা সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে তবে তাদের পূর্বের শত্রুতা কিংবা দুর্বলতা দেখে আশংকা হয় যে অর্থ দিয়ে বশীভূত না করলে তারা আবার কুফরীতে ফিরে যেতে পারে—এ ধরনের লোকদের স্থায়ী ভাতা, বৃত্তি কিংবা সাময়িকভাবে অর্থদান করে ইসলামের সমর্থক ও সাহায্যকারী বা অনুগত কিংবা অক্ষতিকর শত্রুতে পরিণত করা। গনীমতের মাল এবং অন্যান্য উপায়ে অর্জিত অর্থসম্পদ থেকেও এ খাতে ব্যয় করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে যাকাতের তহবিল থেকেও এ খাতে ব্যয় করা যায়। এ ধরনের লেকদের যাকাত পেতে ফকীর, মিসকীন বা মুসাফির হবার শর্ত নেই। বরঞ্চ তারা ধনী সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা সম্পূর্ণ বৈধ।

এতে কোনো মতভেদ নেই যে, নবী করীম (সা)-এর যামানায় বহু লোককে 'মনজয়' করার জন্যে ভাতা প্রদান এবং অর্থদান করা হতো। কিন্তু মতভেদ দেখা দিয়েছে এই ব্যাপারে যে, নবী করীম (সা)-এর পরেও এই খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে কিনা? ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর সাথীদের মত হলো, আবু বকর এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার খিলাফতকালে এই খাত রহিত করে দেয়া হয়। অতএব 'মুয়াল্লিফাতুল কুলূব' খাতে অর্থ ব্যয় করা জায়েয নয়। ইমাম শাফেঈর মতে ফাসিক মুসলমানের 'মনজয়' করার জন্যে যাকাতের খাত থেকে অর্থ দেয়া যেতে পারে, কিন্তু কাফিরকে দেয়া যেতে পারেনা। অপরাপর ফকীহদের মতে, প্রয়োজন দেখা দিলে 'মুয়াল্লিফাতুল কুলূব' খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা সব সময়ই জায়েয।

নিজেদের মতের সপক্ষে হানাফীদের দলীল হলো একটি ঘটনা। তা হলো, নবী করীমের (সা) ইনতেকালের পরে উয়াইনা ইবনে হিস্ন এবং আকরা ইবনে হারিস

খলীফা আবু বকর (রা)-এর কাছে এসে একখন্ড জমি দাবি করে। তিনি তাদের দানপত্র লিখে দেন। তারা দানপত্রকে মজবুত করার জন্যে সাক্ষী হিসেবে অন্যান্য বড় সাহাবীর স্বাক্ষর পেতে চায়। ফলে স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়ে গেলো। কিন্তু তারা যখন সাক্ষী হযরত উমরের স্বাক্ষর নিতে গেলো, তিনি দানপত্রটি পড়ে তাদের সামনেই তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাদের বললেন ঃ "নবী করীম (সা) 'তালীফে কলব'-এর জন্যে তোমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সময়টি ছিলো ইসলামের দুর্বল অবস্থার সময়। এখন আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামকে তোমাদের মত লোকদের সাহায্য থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিয়েছেন।"

এ ঘটনার পর তারা আবু বকরের (রা) কাছে ফিরে এসে অভিযোগ করলো এবং তাঁকে টিটকারী দিয়ে বললো ঃ 'খলীফা কি আপনি না উমর?' কিন্তু হযরত আবু বকর নিজেও এর কোনো প্রতিবাদ করেননি। আর সাহাবীদের একজনও উমরের (রা) এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। এটাই হানাফীদের দলীল। তারা বললেন, মুসলমানরা যখন সংখ্যায় বিপুল হয়ে গেলো এবং মজবুতভাবে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্য হলো, তখন যেসব কারণে 'তালীফে কলব'-এর জন্যে অংশ ধার্য করা হয়েছিল, সেসব কারণ আর বাকী রইলো না। সুতরাং সাহাবীদের ইজমার ভিত্তিতেই 'তালীফে কলব'-এর খাত রহিত হয়ে গেছে।

ইমাম শাফেয়ীর যুক্তি হলো, 'মনজয়' করার উদ্দেশ্যে কাফিরদের যাকাত দেয়া রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) আমল থেকে প্রমাণিত নয়। হাদীসে যতো ঘটনারই উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে জানা যায়, তিনি মন জয় করার উদ্দেশ্যে কাফিরদের দান করেছেন গনীমতের মাল থেকে, যাকাতের মাল থেকে নয়।

আমাদের মতে, 'মুয়াল্লিফাতুল কুলূব'-এর অংশ কিয়ামত পর্যন্ত রহিত হয়ে যাবার পক্ষে কোনো দলীল প্রমাণ নেই। হযরত উমর (রা) যা কিছু বলেছিলেন তা যথার্থই ছিলো। ইসলামী রাষ্ট্র যদি 'মনজয়' করার জন্যে অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন মনে না করে, তবে বাধ্যতামূলকভাবে তা ব্যয় করার জন্যে কেউ ফরয করে দেয়নি। কিন্তু কখনো যদি এ খাতে অর্থ ব্যয় করার জরুরত দেখা দেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা সে অবকাশ রেখে দিয়েছেন। এ খাত অবশিষ্ট থাকা জরুরীও বটে। হযরত উমর এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) যে বিষয়ে একমত হয়েছিলেন, তা কেবল এতোটুকু যে, তাঁরা তাঁদের সময়ে এ খাতে ব্যয় করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু তাঁদের সেই মতৈক্যের কারণে কিয়ামত পর্যন্ত এ খাতটি রহিত হয়েছে বলে ধারণা করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। কারণ, কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ দীনী কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই কুরআনে এই খাতে ব্যয়ে বিধান দেয়া হয়েছে।

এবার ইমাম শাফেঈর মতটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। তাঁর মত একটি নির্দিষ্ট

সীমা পর্যন্ত সঠিক মনে হয়। তা হলো, যখন সরকারের হাতে অন্যান্য খাতে যথেষ্ট অর্থ মওজুদ থাকবে, তখন মন জয় করার উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা ঠিক নয়। কিন্তু যখন এই খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার জরুরত দেখা দেবে, তখন যাকাতের টাকা ফাসিকদের দেয়া যাবে আর কাফিরকে দেয়া যাবেনা, এরূপ পার্থক্য করার কোনো কারণ থাকতে পারেনা। কেননা কুরআন মজীদ এই খাতে ঈমানের কারণে ব্যয় করার নির্দেশ দেয়নি বরং নির্দেশ দিয়েছে ইসলামের স্বার্থে ব্যয় করার এবং মন জয় করার। আর এমন লোকদেরই দিতে বলা হয়েছে, কেবল অর্থ দিয়েই যাদের মন জয় করা যায়। কুরআনের বিধান অনুযায়ী ইসলামী সরকার যেখানেই এই প্রয়োজন এবং এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবেন সেখানেই যাকাতের অর্থ এই খাতে ব্যয় করার অধিকার রাখবেন। নবী করীম (সা) এ খাত থেকে যদি কাফিরদের জন্যে ব্যয় না করে থাকেন, তবে তা করেছেন অন্যান্য খাতে প্রচুর অর্থসম্পদ মওজুদ থাকার কারণে। নতুবা এই যাকাতের অর্থ থেকে যদি কাফিরদেরকে অর্থদান করা তার দৃষ্টিতে বৈধ না-ই হতো, তবে তিনি অবশ্যি এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে যেতেন।

৫. ফীর রিকাব ঃ অর্থাৎ গলদেশ মুক্ত করার কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা। 'গলদেশ মুক্ত করার' অর্থ মানুষকে দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্ত করা। এর দুইটি পথ রয়েছে। একটি পন্থা হলো এই যে, কোনো দাস যদি তার মনিবের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে থাকে যে, আমি আপনাকে এই পরিমাণ অর্থ দান করলে আপনি আমাকে মুক্ত করে দেবেন, তবে তার মুক্তির মূল্য পরিশোধের জন্যে তাকে সাহায্য করা। দ্বিতীয় পন্থা হলো, নিজেই যাকাতের অর্থ দিয়ে দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়া।

এ দুটি পন্থার মধ্যে প্রথমটির ব্যাপারে সকল ফকীহই একমত। কিন্তু দ্বিতীয় পন্থাটি হযরত আলী, সায়ীদ ইবনে যুবায়ের, লাইস, সাওরী, ইব্রাহীম নখয়ী, শা'বী, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন এবং হানাফী ও শাফেয়ীগণ অবৈধ মনে করেন। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং আবু সওর বৈধ বলে মনে করেন।

৬. গারেমীন ঃ অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত লোক। তারা এমন ঋণগ্রস্ত যে, নিজের অর্থসম্পদ দিয়ে নিজের ঋণ পরিশোধ করে দিলে আর নিসাব পরিমাণ অর্থ নিজের কাছে থাকেনা। এমন ব্যক্তি উপার্জনশীল হোক, সাধারণভাবে ফকীর বলে পরিচিত হোক, কিংবা হোক ধনী বলে পরিচিত, সর্বাবস্থায় তাকে যাকাতের খাত থেকে সাহায্য করা যেতে পারে। তবে কিছু সংখ্যক ফকীহ্‌র মতে যে ব্যক্তি অসৎ কাজে এবং বাহুল্য ব্যয় করে নিজের অর্থকড়ি উড়িয়ে দিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তওবা না করা পর্যন্ত তাকে সাহায্য করা যাবেনা।

৭. ফী সাবীলিল্লাহ্ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা। 'আল্লাহর পথে' কথাটি সাধারণ অর্থবোধক। আল্লাহ্‌র পথে বলতে এমন সকল নেক কাজই বুঝায়,

যাতে আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্ট হন। এ কারণে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, এ নির্দেশের আলোকে যাকাতের অর্থ সব ধরনের সৎকাজেই ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু সঠিক কথা হলো এবং পূর্বতন ইমামদের অধিকাংশেরই মত হলো এখানে 'আল্লাহর পথের' অর্থ 'আল্লাহর পথে জিহাদ'। অর্থাৎ সেই চেষ্টা সংগ্রাম যার উদ্দেশ্য কুফরী সমাজ ব্যবস্থাকে নির্মূল করে তদস্থলে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই আন্দোলন ও সংগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের সফর খরচের জন্যে, যানবাহনের জন্যে এবং অস্ত্রশস্ত্র, সাজ সরঞ্জাম ও উপায় উপকরণ সংগ্রহ করার জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। যে লোকেরা নিজেরা সচ্ছল হলেও এবং প্রয়োজন পূরণের জন্যে সাহায্যের প্রয়োজন না হলেও যাকাত গ্রহণ করতে তাদের কোনো দোষ নেই। অনুরূপ যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্ত শ্রম এবং সময় সাময়িক বা স্থায়ীভাবে এ কাজে নিয়োগ করে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যেও যাকাতের অর্থ থেকে এককালীন বা নিয়মিত সাহায্য দেয়া যেতে পারে।

এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে বুঝে নেয়া দরকার। তা হলো, অতীত ইমামগণ প্রায়শই এক্ষেত্রে 'গাজওয়া' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা সশস্ত্র যুদ্ধের সমার্থক। এ কারণে লোকেরা এই ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয় যে, যাকাত ব্যয়ে ফী সাবীলিল্লাহর যে খাত রয়েছে, তা কেবল সশস্ত্র যুদ্ধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' সশস্ত্র যুদ্ধের চেয়েও ব্যাপকতর। 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে এমন সকল চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রামকেই বুঝায়, যা কুফরীকে পরাভূত করে আল্লাহর বাণীকে বিজয়ী করা এবং তাঁর দীনকে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে উত্থিত হয়। চাই তা দাওয়াত ও তাবলীগের প্রাথমিক অবস্থায় থাকুক, কিংবা সশস্ত্র লড়াইয়ের চূড়ান্ত অধ্যায়ে, তাতে কিছু যায় আসে না।

৮. মুসাফির ঃ মুসাফির নিজের ঘরে ধনী হলেও সফরকালে যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়, তবে যাকাতের খাত থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে। এক্ষেত্রে কোনো কোনো ফকীহ এ শর্তারোপ করেছেন যে, কেবল ঐ মুসাফিরের জন্যেই এ নির্দেশটি প্রযোজ্য হবে, যে কোনো পাপ কাজের জন্যে সফরে বের হয়নি। অবশ্য কুরআন এবং হাদীসে এ ধরনের কোনো শর্ত বর্তমান নেই। তাছাড়া দীনের আদর্শিক শিক্ষা থেকেও আমরা জানতে পারি যে, কেউ সাহায্যের মুখাপেক্ষী হলে তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে তার পাপী বা গুনাহগার হওয়াটা কোনোরূপ বাধা নয়। বরঞ্চ সত্যকথা পাপী, গুনাহগার এবং নৈতিক অধঃপতিত ব্যক্তিদের সংশোধন করার একটি বড় উপায় হলো বিপদের সময় তাদের সাহায্য করা, আশ্রয় প্রদান করা এবং উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাদের আত্মাকে পবিত্র করার চেষ্টা করা।

এই যে আট ধরনের[১] লোকের কথা বলা হলো, তাদের মধ্যে কাকে কোন্ অবস্থায় যাকাত দেয়া উচিত আর কোন্ অবস্থায় উচিত নয়—তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে পেশ করা যাচ্ছে।

১. কোনো ব্যক্তি নিজের পিতা কিংবা পুত্রকে যাকাত দিতে পারবেনা। স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না। এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, এমন নিকট আত্মীয়কেও যাকাত দেয়া উচিত নয়, যাদের ব্যয়ভার বহন করা তোমার উপর ওয়াজিব, কিংবা এমন এমন লোকদেরকে যারা শরয়ী দিক থেকে তোমার ওয়ারিশ। তবে দূরের আত্মীয়রা যাকাত পাবার হকদার, বরং অন্য লোকদের তুলনায় অধিক হকদার। পক্ষান্তরে ইমাম আওযায়ী বলেছেন, যাকাত বের করে কেবল নিজের নিকটাত্মীয়দের খুঁজতে থেকোনা।

২. যাকাত কেবল মুসলমানদেরই হক অমুসলিমরা যাকাত পাবেনা। হাদীসে যাকাতের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

"যাকাত তোমাদের ধনীদের কাছ থেকে আদায় করা হবে এবং তোমাদের গরীবদের মাঝে বন্টন করা হবে।"

তবে অমুসলিমদেরকে সাধারণ দান খয়রাত অবশ্যি দেয়া যাবে। বরঞ্চ সাধারণ দান খয়রাতের ক্ষেত্রে কেবল মুসলমানকে দিতে হবে অমুসলিম সাহায্যের মুখাপেক্ষীকে দেয়া যাবেনা, এমন তারতম্য করা উচিত নয়।

৩. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ বলেছেন, প্রতিটি অঞ্চলের যাকাত সেই এলাকার দরিদ্রদের মধ্যেই হওয়া উচিত। এক অঞ্চলের যাকাত অন্য অঞ্চলে পাঠানো ঠিক নয়। তবে, যে অঞ্চলের যাকাত, সেই এলাকায় যদি যাকাত লাভের যোগ্য লোক না থাকে কিংবা অন্য এলাকায় যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন প্লাবন, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখা দেয় এবং দূরের ও কাছের এলাকা থেকে সাহায্য পাঠানো জরুরী হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় পাঠাতে দোষ নেই। ইমাম মালিক এবং সুফিয়ান সাওরীও প্রায় অনুরূপ মতই দিয়েছেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এক অঞ্চলের যাকাত অন্য অঞ্চলে পাঠানো নাজায়েয।

৪. কারো কারো মতে, যে ব্যক্তির কাছে দু'বেলার খাবার সামগ্রী আছে, তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা উচিত নয়। কেউ কেউ বলেছেন, যার কাছে দশ টাকা আছে, আবার অপর কেউ কেউ বলেছেন, যার কাছে সাড়ে বার টাকা আছে, তার পক্ষে যাকাত নেয়া উচিত নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) এবং সকল হানাফী ইমামদের মতে, যার

---

১. এ অংশটুকু গৃহীত হয়েছে 'খুতবাত' গ্রন্থ থেকে।

কাছে পঞ্চাশ টাকার কম অর্থ আছে, সে যাকাত গ্রহণ করতে পারে। এ পঞ্চাশ টাকার মধ্যে ঘরের আসবাব পত্র, ঘোড়া (যানবাহন) এবং চাকর-বাকর অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ এসব সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও যার কাছে পঞ্চাশ টাকার কম অর্থ আছে, সে যাকাত লাভের অধিকার রাখে। এক্ষেত্রে একটি জিনিস হলো আইন এবং অরেকটি জিনিস হলো মর্যাদার স্তর। এ দুটি জিনিসের পার্থক্য আছে।

মর্যাদার স্তর হলো এই যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ "যার কাছে সকাল ও সন্ধ্যার খাবার সামগ্রী আছে, সে যদি মানুষের কাছে চাওয়ার জন্যে হাত পাতে, তবে সে নিজের জন্যে আগুন জমা করে।" অপর একটি হাদীসে নবী করীম (সা) "বলেছেন, মানুষের কাছে হাত পাতার চেয়ে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করাকে আমি অধিকতর পছন্দ করি।" তৃতীয় একটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'যার কাছে খাবার আছে, অথবা যে ব্যক্তি উপার্জন করার সামর্থ্য রাখে, তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা অনুচিত।' এগুলো হলো মর্যাদাবোধের কথা। আত্মমর্যাদবোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যেই এগুলো উপদেশ। এগুলো আইন নয়।

বাকী থাকলো আইনের কথা। কোনো ব্যক্তি কখন যাকাত গ্রহণ করার অধিকার রাখে, এ ব্যাপারে একটি সীমা বলে দেয়া জরুরী। এ ব্যাপারেও হাদীস থেকেই নির্দেশিকা পাওয়া যায়। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى الْفَرَسِ -

"ঘোড়ার চড়ে এলেও ভিক্ষাপ্রার্থী ভিক্ষা পাওয়ার অধিকার রাখে।"

একব্যক্তি এসে নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞেস করলো, আমার কাছে দশ টাকা থাকলে আমি কি মিসকীন বলে গণ্য হবো?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

একবার দু'ব্যক্তি এসে নবী করীম (সা)-এর নিকট যাকাত চাইলো। তিনি কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন ঃ তোমরা নিতে চাইলে আমি দেবো, তবে যাকাতের মালে ধনী এবং উপার্জনক্ষম লোকদের অংশ নেই।

এসব হাদীস থেকে জানা গেলো, যার কাছে নিসাবের চেয়ে কম পরিমাণ অর্থসম্পদ আছে, সে ফকীর বলে গণ্য হবে এবং তাকে যাকাত দেয়া যেতে পারে। তবে প্রকৃত অভাবী এবং মুখাপেক্ষী লোকেরাই আসলে যাকাত পাওয়ার হকদার।

এখানে আমি যাকাতের জরুরী বিধি বিধান বর্ণনা করলাম। এ প্রসংগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যা মুসলমানরা বর্তমানে ভুলেই গিয়েছেন। তা হলো, ইসলামের সব কাজই সাংগঠনিক ও সামষ্টিক

ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইসলাম ব্যক্তিতান্ত্রিকতাকে সমর্থন করেনা। আপনি মসজিদ থেকে দূরে অবস্থান করা অবস্থায় একাকী নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে বটে, তবে শরীয়তের দাবি তো হলো আপনি যেনো জামায়াতের সাথে নামায পড়েন।

একইভাবে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও দলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকলে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত বের করে ব্যয় করাও জায়েয। তবে প্রচেষ্টা তো এই থাকা উচিত যে, যাকাত একটি কেন্দ্রীয়স্থানে জমা করা হবে এবং সেখান থেকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে তা ব্যয় করা হবে। এ বিষয়টির প্রতিটি কুরআন মজীদ ইংগিত করেছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا -

(তাদেরকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করবার জন্যে তাদের অর্থসম্পদ থেকে সাদাকা [যাকাত] আদায় কর)।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে যাকাত উসূল করবার নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলমানদেরকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ যাকাত বের করে তা ব্যয় করতে বলেননি। তাছাড়া যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের অধিকার যাকাতের খাত থেকে নির্ধারণ করা দ্বারাও একথা পরিষ্কার হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তা উসূল ও ব্যয় করবেন। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اٰخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَاءِكُمْ وَ اَرُدَّهَا فِىْ فُقَرَاءِكُمْ -

"আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেনো তোমাদের ধনীদের কাছ যাকাত উসূল করি এবং তোমাদের গরীবদের মাঝে তা বন্টন করি।"

নবী করীম (সা) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন এই পন্থায়ই যাকাত উসূল ও বন্টন করতেন। ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মচারীরা যকাত উসূল করে এক জায়গায় জমা করতেন এবং নিয়ম মাফিক তা বন্টনের ব্যবস্থা করতেন।

বর্তমানে যেহেতু আমাদের দেশে ইসলামী রাষ্ট্র নেই এবং ইসলামী সরকারের মাধ্যমে যাকাত সংগ্রহ করে বন্টন করার ব্যবস্থাও নেই, সে কারণে আপনারা ব্যক্তিগতভাবে হিসেব করে নিজেদের যাকাত বের করে তা শরীয়ত নির্ধারিত খাতে ব্যয় করতে পারেন। তবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত উসূল ও বন্টন করার উদ্দেশ্যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করা সকল মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য। কারণ এছাড়া যাকাত ফরয করার উপকারিতা পূর্ণরূপে লাভ করা সম্ভব নয়।

৫. যাকাতের মৌলিক বিধান

প্রশ্নমালা[১]

(১) যাকাতের তাৎপর্য কি?

(২) কার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব? এ ব্যাপারে মহিলা, অপ্রাপ্তবয়স্ক, কয়েদী, মুসাফির, পাগল ও প্রবাসীরা কোন্ পর্যায়ভুক্ত, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবেন।

(৩) যাকাত আদায়ের অপরিহার্যতার জন্যে কত বছর বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রাপ্তবয়স্ক মনে করা উচিত?

(৪) যাকাত আদায়ের অপরিহার্যতার ব্যাপারে মেয়েদের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য অলংকারাদি কোন্ পর্যায়ভুক্ত?

(৫) কোম্পানীকে যাকাত আদায় করা উচিত, নাকি প্রত্যেক অংশীদারকে নিজেদের অংশ অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে যাকাত আদায় করতে হবে?

(৬) কারখানা ও অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর যাকাত ওয়াজিব হবার সীমা বর্ণনা করুন।

(৭) যেসব কোম্পানীর শেয়ার স্থানান্তরযোগ্য, যাকাত নির্ধারণ করার সময় তাদের মধ্যে কার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে—শেয়ার ক্রয়কারীর উপর না বিক্রয়কারীর উপর?

(৮) কোন্ কোন্ আসবাব পত্র ও বস্তুর উপর এবং বর্তমান সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ অবস্থায় যাকাত ওয়াজিব হয়? বিশেষ করে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি সম্পর্কে অথবা এদের সৃষ্ট অবস্থায় কোন্ পদক্ষেপ গৃহীত হবে?

(ক) নগদ টাকা, সোনা, রূপা, অলংকার ও মূল্যবান পাথর।

(খ) ধাতুর মুদ্রা (স্বর্ণখচিত, রৌপ্যখচিত ও অন্যান্য ধাতুখচিত মুদ্রা এর অন্তর্ভুক্ত) এবং কাগজের মুদ্রা।

(গ) ব্যাংকে গচ্ছিত আমানত, ব্যাংক অথবা অন্যস্থানে রক্ষিত বস্তুসমূহ, অন্য কোথাও থেকে গৃহীত ঋণ, বন্ধকী সম্পত্তি ও বিবাদমূলক সম্পত্তি এবং এমন সম্পত্তি যার বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়েছে।

(ঘ) উপহার, পুরস্কার।

---

১. তরজমানুল কুরআন মুহররম ১৩৭০ হিজরী, নভেম্বর ১৯৫০ ই. সংখ্যা থেকে গৃহীত। (সংকলক)

(ঙ) বীমার পলিসি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ।

(চ) গবাদি পশু, দুধ, দই, ছানা প্রভৃতি, উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রবাদি, তরিতরকারী, ফল ও ফুলসহ।

(ছ) খনিজ দ্রব্য।

(জ) আহরিত গুপ্তধন।

(ঝ) প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।

(ঞ) বনের বা গৃহপালিত মৌমাছির মধু।

(ট) মাছ, মোতি ও পানির অন্যান্য বস্তু।

(ঠ) পেট্রোল।

(ড) আমদানী-রফতানী।

(৯) রাসূলুল্লাহর (সা) আমলে যেসব বস্তুর উপর যাকাত ওয়াজিব ছিল খোলাফায়ে রাশিদীন তার মধ্যে কোনো বস্তুর নাম বৃদ্ধি করেছিলেন কি? কোনো বৃদ্ধি বা পরিবর্তন হয়ে থাকলে কোন্ নীতির ভিত্তিতে তা হয়েছিল?

(১০) নিকেলের মুদ্রা ও সোনা রূপা ছাড়া প্রচলিত অন্যান্য ধাতুর মুদ্রার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি? যে সকল মুদ্রার প্রচলন নেই অথবা যেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে বা সরকার প্রচলন রহিত করেছেন অথবা যেগুলি বিদেশের মুদ্রা, সেগুলির যাকাত দিতে হবে কিনা?

(১১) প্রকাশ্য ও গোপন সম্পদের সংজ্ঞা কি? এ ব্যাপারে ব্যাংকে সংগৃহীত অর্থ কোন্ পর্যায়ভুক্ত?

(১২) যাকাত গ্রহণের ব্যাপারে বর্ধনশীল সম্পদের সংজ্ঞা বর্ণনা করুন। কেবলমাত্র উৎপাদনশীল সম্পদের উপরই কি যাকাত ওয়াজিব?

(১৩) যেসব গৃহ, অলংকার ও অন্যান্য বস্তু ভাড়া দেয়া হয়, সেগুলি এবং টেক্সী ও মোটর প্রভৃতির উপর যাকাত নির্ধারণ করার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত?

(১৪) কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন কোন্ পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে? এ ব্যাপারে মহিষ, মুরগী ও অন্যান্য গৃহপালিত এবং শখ করে পালা পশুসমূহ কোন্ পর্যায়ভুক্ত? এদের যাকাত কি নগদ টাকায় দিতে হবে অথবা পশু দিতে হবে? কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন বিভিন্ন পশু কত সংখ্যায় ও কোন্ অবস্থায় পৌছলে এর উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়া উচিত?

(১৫) যেসব বস্তুর উপর যাকাত ওয়াজিব হয় তাদের যাকাতের হার কি?

(১৬) খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে নগদ টাকা, মুদ্রা, গবাদি পশু, ব্যবসায়িক সম্পদ ও কৃষি উৎপাদনের উপর যাকাতের হারের মধ্যে কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে?

যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে সনদসহ বিস্তারিত কারণ বর্ণনা করুন।

(১৭) নগদ টাকার ক্ষেত্রে যদি দুশো রৌপ্যখচিত দিরহাম ও বিশ স্বর্ণখচিত মিসকালের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে তা কতটি দেশীয় টাকার সমান হবে? তরিতরকারীর ব্যাপারে 'সা' ও 'ওয়াসাক' দেশের বিভিন্ন এলাকা ও প্রদেশের কোন্ কোন্ প্রচলিত ওজনের সমান হবে?

(১৮) বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিসাবের (কমপক্ষে যে পরিমাণ অর্থসম্পদের উপর যাকাত হয়) এবং যাকাতের হারের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হতে পারে কি? এ ব্যাপারে যুক্তি প্রমাণ সহকারে আপনার চিন্তা পেশ করুন।

(১৯) কি পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হবার পর বিভিন্ন বস্তুর উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়?

(২০) এক বছরে যদি একাধিক ফসল হয়, তাহলে বছরে কেবল একবার যাকাত আদায় করা উচিত নাকি প্রত্যেক ফসলের যাকাত আদায় করতে হবে?

(২১) চন্দ্রবর্ষের হিসাবে যাকাত আদায় করা উচিত কিংবা সৌর বর্ষের হিসাবে যাকাত নির্ধারণ ও আদায়ের জন্যে কোনো মাস নির্দিষ্ট করা উচিত কি না?

(২২) যাকাতের টাকা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যয়িত হওয়া উচিত?

(২৩) কুরআন মজীদে যাকাতের যে ব্যয়ক্ষেত্র উল্লিখিত হয়েছে তার সীমারেখা বর্ণনা করুন। বিশেষ করে 'ফী সাবীলিল্লাহ' পরিভাষাটির অর্থ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

(২৪) যাকাতের অর্থের একটি অংশ কুরআনে বর্ণিত যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্র সমূহের প্রত্যেকটিতে ব্যয় করার জন্যে পৃথক করে রাখা কি অপরিহার্য? অথবা যাকাতের সমুদয় অর্থ কুরআনে বর্ণিত সব ব্যয়ক্ষেত্রে ব্যয় করার পরিবর্তে কোনো একটিতে বা কয়েকটিতে ব্যয় করা যেতে পারে?

(২৫) যাকাত গ্রহণকারী প্রতিটি শ্রেণীর মধ্য থেকে কোন্ ব্যক্তি কোন্ অবস্থায় যাকাত গ্রহণ করার অধিকারী হয়, দেশে বিভিন্ন এলাকার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাইয়েদ ও বনী হাশিমের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ কি পরিমাণ যাকাত গ্রহণের অধিকারী হতে পারে—তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

(২৬) যাকাত কি কেবল ব্যক্তিকে দিতে হবে অথবা প্রতিষ্ঠানকেও (যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতীমখানা, দরিদ্র সেবা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি) দেয়া যেতে পারে?

(২৭) যাকাতের অর্থ থেকে গরীব, মিসকীন, বিধবা এবং পঙ্গু ও বার্ধক্যের জন্যে যারা রোযগার করতে অসমর্থ, তাদেরকে সারা জীবন পেনশন দেয়া যেতে পারে কি?

(২৮) যাকাতকে জনসেবার কাজে—যেমন মসজিদ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, পুল,

কুয়া, পুকুর প্রভৃতি খনন, নির্মাণ বা মেরামতের কাজে লাগানো যেতে পারে কিনা, যার ফলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই উপকৃত হতে পারে?

(২৯) যাকাতের টাকা কোনো ব্যক্তিকে 'কর্জে হাসানা' অথবা সুদহীন ঋণ হিসেবে দেয়া যেতে পারে কি?

(৩০) যে এলাকা থেকে যাকাত আদায় করা হয়, সেখানেই তা ব্যয় করা কি অপরিহার্য? অথবা সে এলাকার বাইরে বা দেশের বাইরে দুর্বল মনকে সবল করার জন্যে, ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত ব্যক্তিদেরকে সাহায্য দানের জন্যে ব্যয় করা যাবে কি? এ ব্যাপারে আপনার মতে এলাকার সংজ্ঞা কি?

(৩১) কোনো মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে যাকাত আদায় করার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত?

(৩২) লোকেরা যাতে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে কোনো বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারে এজন্যে কি কি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে?

(৩৩) যাকাত আদায় ও এর ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের হাতে থাকা উচিত, না প্রদেশের হাতে? কেন্দ্র যদি যাকাত আদায় করে, তাহলে তাতে প্রদেশগুলোর অংশ নির্ধারণ করার জন্যে কি নীতি অবলম্বিত হবে?

(৩৪) আপনার মতে যাকাত ব্যবস্থা পরিচালনার সর্বোত্তম পদ্ধতি কি? যাকাত জমা করার জন্যে কি পৃথক পৃথক বিভাগ কায়েম করা দরকার অথবা বর্তমান সরকারী বিভাগসমূহের মাধ্যমে এ কাজ নেয়া যাবে?

(৩৫) যাকাতকে কি কখনো সরকারী ট্যাক্স গণ্য করা হয়েছে? অথবা এটি এমন একটি ট্যাক্স যার ব্যবস্থাপনা ও আদায় করার দায়িত্বই কেবল সরকারের উপর বর্তায়?

(৩৬) রাসূলুল্লাহ (সা) বা খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে জনস্বার্থমূলক কাজের জন্যে সরকারী পর্যায়ে যাকাত ছাড়া অন্য কোনো ট্যাক্স আদায় করা হয়েছে কি? যদি আদায় করা হয়ে থাকে, তাহলে তা কি ট্যাক্স ছিল?

(৩৭) মুসলিম দেশসমূহে যাকাতের ব্যবস্থাপনা ও আদায়ের কি পদ্ধতি ছিল এবং বর্তমানে কি পদ্ধতি আছে?

(৩৮) যাকাত আদায় ও ব্যয় করার ব্যবস্থা কি একমাত্র রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন থাকবে? অথবা এজন্যে কোনো কমিটি নিযুক্ত করে সরকার ও জনগণের যুক্ত পরিচালনাধীনে তা সক্রিয় থাকবে?

(৩৯) যাকাত সংগ্রহ করার জন্যে যেসব কর্মচারী নিযুক্ত করা হবে, তাদের বেতন, এলাউন্স, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও চাকরির শর্তাবলী কি হওয়া উচিত?

জবাব[১] ঃ

(১) যাকাতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও বৃদ্ধি। এই গুণ দুটির পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী পরিভাষায় যাকাত এমন একটি ইবাদতকে বলা হয় যা প্রত্যেক 'সাহেবে নিসাব' মুসলমানের উপর এই উদ্দেশ্যে ফরয করা হয়েছে যে, আল্লাহ ও বান্দার হক আদায় করে তার অর্থসম্পদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং তার নিজের অন্তঃকরণ ও তার সমাজ কার্পণ্য, স্বার্থান্ধতা, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি অসৎ প্রবণতা থেকে মুক্ত হবে; অন্যদিকে তার মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা, ঔদার্য্য, কল্যাণ কামনা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির গুণাবলী বৃদ্ধিলাভ করবে।

ফকীহগণ যাকাতের বিভিন্ন সংজ্ঞা পেশ করেছেন ঃ

حَقٌّ يَجِبُ فِي الْمَالِ - (المغنى، لابن قدامة، ج ٢ ص ٤٣٣)

অর্থাৎ 'অর্থসম্পদের মধ্য থেকে এ অধিকারটি দান করা ওয়াজিব (আল মুগান্না লি ইব্‌নে কুদামা, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৩৩)

اِعْطَاءُ جُزْءٍ مِّنَ النِّصَابِ اِلٰى فَقِيْرٍ وَنَحْوِهٖ غَيْرُ مُتَّصِفٍ بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ اِلَيْهِ - (نيل الاوطار ج ٤، ص ٩٨)

"নিসাব থেকে একটি অংশ কোনো অভাবী ও তার সমপর্যায়ের ব্যক্তিকে দান করা। যেসব কারণে শরীয়ত কাউকে যাকাত দিতে অস্বীকার করে সেসব কারণ যেন তার মধ্যে বিদ্যমান না থাকে।" (নাইলুল আওতার ঃ ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৯৮)

تَمْلِيْكُ مَالٍ مَخْصُوْصٍ لِمُسْتَحِقِّهٖ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ - (الفقه على المذاهب الاربعة ج ١، ص ٥٩٠)

"একটি বিশেষ অর্থসম্পদকে বিশেষ শর্তানুযায়ী তার মালিককে দান করা।" (আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ঃ ১ম খন্ড, ৫৯০ পৃঃ)

(২) বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নারী-পুরুষ যদি সাহেবে নিসাব হয়, তাহলে তাদের উপর যাকাত দান করা ওয়াজিব এবং এর আদায়ের ব্যাপারে তারা নিজেরাই দায়িত্বশীল।

অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। একটি মত হচ্ছে এই যে, এতীমের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, এতীম বালেগ হবার পর

---

১. প্রত্যেকটি জবাব পাঠ করার সময় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটিকে সম্মুখে রাখবেন।

যখন তার অভিভাবক তার সমুদয় অর্থসম্পদ তাকে সোপর্দ করবে, তখন তাকে যাকাতের বিষয়েও বিস্তারিতভাবে জানাবে, অতঃপর যে কয় বছর সে এতীম অবস্থায় ছিল সে কয় বছরের যাকাত পুরোপুরি আদায় করার দায়িত্ব হবে তার নিজের। তৃতীয় মতটি হচ্ছে, এতীমের অর্থসম্পদ যদি কোনো ব্যবসায়ে খাটানো হয় এবং তার থেকে লাভ আসতে থাকে, তাহলে অভিভাবক তার যাকাত আদায় করতে পারে, অন্যথায় করতে পারে না। চতুর্থ মত হচ্ছে, এতীমের অর্থসম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব এবং তা আদায় করার দায়িত্ব হচ্ছে তার অভিভাবকের। অমাদের মতে এই চতুর্থ মতটিই অধিক নির্ভুল। হাদীসে উক্ত হয়েছে ঃ

اَلَا مَنْ وَّلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكْهُ فَتَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ـ

(ترمذی ـ دارقطنی ـ بیہقی ـ کتاب الاموال ، لابی عبید)

"সাবধান। যে ব্যক্তি এমন কোনো এতীমের অভিভাবক, যে অর্থসম্পদের অধিকারী, তার উচিত তার অর্থসম্পদ কোনো ব্যবসায়ে খাটানো এবং সেগুলি এমনভাবে ফেলে রাখা উচিত নয় যার ফলে তা সম্পূর্ণরূপে যাকাতের উদরে প্রবেশ করে।" (তিরমিযী, দারা কুতনী, বায়হাকী, কিতাবুল আমওয়াল লি আবি উবায়েদ)

ইমাম শাফেঈ এরই সমার্থক একটি মুরসাল[২] হাদীস এবং তাবারানী ও আবু উবায়েদ একটি মারফু[৩] হাদীস উধৃত করেছেন। সাহাবী ও তাবেঈগণের বিভিন্ন কথা ও কর্ম এ কথাটিরই সমর্থক। হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এবং মুজাহিদ, আতা, হাসান, ইবনে ইয়াযীদ, মালিক ইবনে আনাস ও যুহুরী প্রমুখ তাবেঈগণের নিকট থেকে একথা উধৃত হয়েছে।

বুদ্ধিভ্রষ্ট লোকদের ব্যাপারেও উপরোল্লিখিত চার ধরনের মতবিরোধ আছে। এক্ষেত্রেও আমাদের নিকট নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে এই যে, পাগলের অর্থসম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব এবং তা আদায় করার দায়িত্বও তার অভিভাবকের উপর বর্তায়। ইবনে মালিক ও ইবনে শিহাব যুহুরী এই মতকে ব্যাখ্যা করেছেন।

কয়েদীর উপরেও যাকাত ওয়াজিব। যে ব্যক্তি তার অবর্তমানে তার ব্যবসা বা অর্থসম্পদের অভিভাবক হবে, সে তার পক্ষ থেকে অন্যান্য অপরিহার্য কার্য সম্পাদন করার ন্যায় যাকাতটিও আদায় করবে। ইবনে কুদামা এ সম্পর্কে তাঁর কিতাব 'আল মুগান্নায়' লিখেছেন ঃ

---

২. যে হাদীসের সনদে সর্বশেষ বক্তি অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পরেছে এবং তাবেঈ নিজেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল বলা হয়। -(অনুবাদক)

৩. যে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ যা নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস বলে সাব্যস্থ হয়েছে, তাকে মারফু হাদীস বলা হয়। -(অনুবাদক)

"অর্থসম্পদের অধিকারী যদি কারারুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে তার উপর থেকে যাকাত রহিত হবে না। কারাবাস ও তার অর্থসম্পদের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করলে বা না করলেও এ ব্যাপারে কোনো পার্থক্য সূচিত হবে না, কারণ আইনত সে নিজের অর্থসম্পদ ব্যবহারের অধিকারী। আর বেচা-কেনা, দান, ইখতিয়ারনামা সবকিছুই আইনত বৈধ।"

(২য় খন্ড, পৃঃ ৪২৬)

মুসাফিরের উপরও যাকাত ওয়াজিব। এতে সন্দেহ নেই যে, মুসাফির হিসেবে সে নিজেও যাকাত গ্রহণের অধিকারী। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, 'সাহেবে নিসাব' (যে পরিমাণ অর্থ থাকলে যাকাত ওয়াজিব হয়, সে পরিমাণ অর্থের অধিকারী) হওয়া সত্ত্বেও তার উপর থেকে যাকাত রহিত হবে। সফর তাকে যাকাত গ্রহণের হকদার করে এবং বিত্তশালিতা তার উপর যাকাত ফরয করে।

এদেশের মুসলমান অধিবাসী যদি বিদেশে অবস্থান করে এবং দেশে তার সম্পত্তি বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থ নিসাব পরিমাণ মওজুদ থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কোনো মুসলমান দেশের মুসলমান অধিবাসী যদি এদেশে অবস্থান করে এবং এখানে তার নিকট নিসাব পরিমাণ অর্থসম্পদ থাকে, তাহলে তার নিকট থেকেও যাকাত আদায় করা হবে। কিন্তু যদি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমান এদেশে অবস্থান করে, তাহলে তাকে যাকাত দিতে বাধ্য করা যেতে পারে না। তবে সে স্বেচ্ছায় দিতে চাইলে দিতে পারে। কারণ তার আইনগত মর্যাদা রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজাদের থেকে ভিন্নতর নয়।

وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ - (الانفال)

(৩) যাকাত আদায়ের অপরিহার্যতার জন্যে বয়সের কোনো শর্ত নেই। কোনো এতীম প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তার তরফ থেকে তার অভিভাবককে যাকাত আদায় করতে হবে। আর প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর যখন সে নিজেই নিজের অর্থসম্পদ ব্যবহারের যোগ্য হবে, তখন নিজের যাকাত আদায় করার দায়িত্ব তার নিজের উপর বর্তাবে।

(৪) অলংকারাদির যাকাতের ব্যাপারে একাধিক মত আছে। একটি মত হচ্ছে এই যে, অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অলংকারাদি অন্যকে ধার দেয়াই তার যাকাতের সমপর্যায়ভুক্ত। এটি হচ্ছে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, কাতাদা ও শা'বীর উক্তি। দ্বিতীয় মত হচ্ছে এই যে, সারা জীবনে একবার যাকাত দেয়াই অলংকারাদির জন্য যথেষ্ট। তৃতীয় মত হচ্ছে, যে অলংকারাদি মেয়েরা হামেশা পরিধান করে থাকে, তার উপর যাকাত নেই। কিন্তু যেগুলি অধিকাংশ সময় উঠিয়ে রাখা হয় সেগুলির উপর যাকাত ওয়াজিব। চতুর্থ মত হচ্ছে এই যে, সব রকমের অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব। আমরা এই শেষোক্ত মতটিকেই নির্ভুল মনে করি। প্রথমত, যেসব হাদীসে অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কথা বর্ণনা

করা হয়েছে, সেগুলির শব্দ ব্যাপক। যেমন ঃ 'রূপার মধ্যে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত এবং পাঁচ উকিয়া থেকে কম হলে তার উপর যাকাত নেই।'

আবার বিভিন্ন হাদীস ও সাহাবাগণের কথা ও কর্মে একথা পরিস্ফুট হয়েছে যে, অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব। আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী শক্তিশালী সনদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহর (সা) খেদমতে হাযির হলেন। তার সাথে তার এক মেয়ে ছিল। মেয়েটির হাতে সোনার কংকন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এর যাকাত দিয়ে থাকো? মহিলা নেতিবাচক জবাব দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এর বদলে আগুনের কংকন পরিধান করাবেন, এটাই কি তুমি পছন্দ করো?"

উপরন্তু মুয়াত্তা, আবু দাউদ ও দারা কুতনীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ উক্তি উধৃত হয়েছে যে, যে অলংকারের যাকাত তুমি আদায় করে দিয়েছ, তা আর খনিজ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত থাকেনি। ইবেন হাজাম মুহাল্লায় বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) তাঁর গবর্নর হযরত আবু মুসা আশয়ারীকে (রা) যে ফরমান পাঠান তাতে নির্দেশ দেন ঃ মুসলমান মহিলাদের তাদের অলংকারাদির যাকাত দেবার হুকুম দাও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) নিকট অলংকারাদির যাকাত সম্পর্কে ফত্ওয়া জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে তিনি বলেন ঃ 'তা দুশো দিরহাম পর্যায়ে পৌঁছে গেলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়।' এই বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল উক্তি করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ সাহাবাগণ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, আতা, মুজাহিদ, ইবনে সিরিন ও যুহ্রী প্রমুখ তাবেঈগণ এবং সুফিয়ান সাওরী, আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ প্রমুখ ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামগণ।

(৫) কোম্পানী সম্পর্কে আমাদের মত হচ্ছে এই যে, যে অংশীদারের অংশ নিসাবের চেয়ে কম অথবা যে ব্যক্তি এক বছরের কম সময়ের জন্যে নিজের অংশের মালিক ছিল, তাদেরকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল অংশীদারের যাকাত একসংগে কোম্পানী থেকে আদায় করা উচিত। এর ফলে ব্যবস্থাপনার দিক থেকে বিষয়টি সহজ হয় এবং এ পদ্ধতির মধ্যে এমন কোনো বিষয় নেই, যা শরীয়তের নীতিগুলোর মধ্য থেকে কোনটির পরিপন্থী হতে পারে। আমাদের এ মত ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ এবং অন্যান্য একাধিক ফকীহগণের মতের অনুসারী। (বেদায়াতুল মুজতাহিদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২২৫)

(৬) কারখানার যন্ত্রপাতির উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেবল বছরের শেষভাগে যে কাঁচামাল বা শিল্পদ্রব্য কারখানায় থাকবে, তার দাম ও নগদ অর্থের যাকাত ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে ব্যবসায়ীদের আসবাবপত্র, স্টেশনারী দোকান বা গৃহ এবং এই

ধরনের অন্যান্য বস্তুর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেবল বছরের শেষে তাদের দোকানে যে মালপত্র থাকবে, তার দাম ও তাদের তহবিলে সঞ্চিত নগদ অর্থের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।[৪] এ ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে এই যে, কোনো ব্যবসায়ে যেসব বস্তু ও যন্ত্রপাতিকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়, সেগুলির উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। হাদীসে বলা হয়েছে—ওয়া লাইসা ফিল ইবিলিল আওয়ামিলে সাদাকাহ' অর্থাৎ 'যেসব উটের দ্বারা পানি সেচের কাজ করা হয়, সেগুলির উপর যাকাত নেই'—(কিতাবুল আমওয়াল)। কারণ তাদের কার্যক্রমের ফলে জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তা থেকেই তার যাকাত আদায় করে নেয়া হয়। এর উপর 'কিয়াস' করে ফকীহ্গণ অন্যান্য যাবতীয় উৎপাদনযন্ত্রকে যাকাতমুক্ত গণ্য করেছেন।

(৭) কোম্পানীর যেসব বিক্রয়যোগ্য অংশ বছরের মধ্যভাগে বিক্রীত হয়, তার ক্রেতা বা বিক্রেতা কারোর উপর ঐ বছর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ তাদের দু'জনের কারোর মালিকানার পুরো এক বছর অতিবাহিত হয়নি।

(৮) শরীয়তে নিম্নলিখিত বস্তুগুলির যাকাত ওয়াজিব। ফসল কাটার পর ফসলের উপর, বছরের প্রথমে ও শেষে নিসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে অধিক পরিমাণে মওজুদ সোনা ও রূপার উপর, সোনা ও রূপার স্থলাভিষিক্ত নগদ টাকার উপর, বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালিত বছরের প্রথমে ও শেষে নিসাব পরিমাণ বর্তমান গবাদি পশুর উপর, বছরের প্রথমে ও শেষে নিসাব পরিমাণ মওজুদ ব্যবসায়িক পণ্যের উপর, খনিজদ্রব্য ও গুপ্তধনের উপর।

(ক) নগদ টাকা, সোনা, রূপা ও অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব। অলংকারের যাকাতের ক্ষেত্রে কেবল তার মধ্যে মওজুদ সোনা ও রূপার ওজন নির্ভরযোগ্য হবে। মণি-মুক্তা বা মূল্যবান পাথর অলংকারের গায়ে বসানো থাক বা পৃথক থাক তার উপর কোনো যাকাত নেই। তবে যদি কেউ মূল্যবান পাথরের ব্যবসা করে, তাহলে অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ন্যায় তার উপরও অর্থাৎ তার মূল্যের উপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত ওয়াজিব হবে। 'আল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবাআয়' লিখিত হয়েছে ঃ 'ব্যবসায়ে খাটানো না হলে মোতি, ইয়াকুত ও অন্যান্য মূল্যবান পাথরের উপর যাকাত নেই। এ ব্যাপারে সকল মযহাব একমত।' (১ম খন্ড, পৃঃ ৫৯৫)

(খ) ধাতব মুদ্রা ও কাগজের মুদ্রার উপর যাকাত ওয়াজিব। কারণ এসবের মূল্য সৃষ্টিতে ধাতু বা কাগজের কোনো ভূমিকা নেই বরং আইনের সাহায্যে তাদের মধ্যে যে ক্রয়মূল্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার কারণেই তাদের দাম এবং এজন্যে তারা সোনা ও রূপার

---

৪. যেসব ব্যবসা এ ধরনের নয় এবং তাদের যাকাতের হিসাব যদি এভাবে না লাগানো যায় (যেমন সংবাদপত্র ব্যবসা)। তাহলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী বার্ষিক আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সব ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং তার উপর যাকাত দিতে হবে।

স্থলাভিষিক্ত এবং তাদেরকে নিঃসংকোচে সোনা ও রূপার দ্বারা বদল করা যেতে পারে। এ জন্যে ইমাম আবু হানীফা (র), মালিক (র) ও শাফেঈ (র) প্রমুখ তিনজন শ্রেষ্ঠ ইমামের মযহাব হচ্ছে এই যে, এগুলির উপর যাকাত ওয়াজিব। (১ম খন্ড, পৃঃ ৬০৫)

(গ) ব্যাংকে যেসব আমানত রক্ষিত আছে, সেগুলির উপর যাকাত ওয়াজিব। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যদি রেজিস্টার্ড হয়ে থাকে এবং সরকার তাদের হিসাবপত্র যাচাই করতে পারে, তাহলে সেখানে রক্ষিত আমানতও ব্যাংকের সমপর্যায়ভুক্ত হবে। আর যদি সেগুলি রেজিস্টার্ড না হয়ে থাকে এবং তাদের হিসাবপত্র যাচাই করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে সেখানে রক্ষিত আমানত গুপ্তধনের পর্যায়ভুক্ত হবে অর্থাৎ সেগুলির যাকাত আদায় করার দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তায় না। তাদের মালিকরা নিজেরাই সেগুলির যাকাত আদায় করবে।

ঋণ যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গৃহীত হয়ে থাকে এবং তা খরচও হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত নেই। আর যদি ঋণগহীতা পুরো একবছর ঋণ নিয়ে রাখে এবং নিসাব পরিমাণ হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর ব্যবসায়ে খাটানো হলে তা ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়ী পুঁজি রূপে গণ্য হবে এবং ব্যবসা সংক্রান্ত যাকাত আদায় করার সময় তার এই ঋণকে বাদ দেয়া হবে না।

প্রদত্ত ঋণ যদি সহজে ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কোনো কোনো ফকীহর মতে বছরে বছরে এদের যাকাত আদায় করতে হবে। এটি হচ্ছে হযরত উসমান (রা), ইবনে উমর (রা) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা), তাউস, ইবরাহীম নাখয়ী ও হাসান বসরীর মত। আবার অনেকের মতে ঐ ঋণ আদায় হবার পর বিগত সব বছরের যাকাত একসাথে আদায় করতে হবে। এটি হচ্ছে হযরত আলী (রা), আবু সওর, সুফিয়ান সাওরী ও হানাফী ইমামগণের মত। আর যদি এ ঋণ ফেরত পাওয়া সন্দেহযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে ঐ অর্থ যখন ফেরত পাওয়া যাবে কেবল তখনই তার মাত্র এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে, এ মতটিই আমাদের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য। এটি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয, হাসান, লাইস, আওযাঈ ও ইমাম মালিকের মত। এতে ধনের মালিক ও বায়তুলমাল উভয়ের সাথে ইনসাফ করা হয়।

বন্ধকী সম্পত্তি যার আয়ত্তাধীন থাকবে তার নিকট থেকে এর যাকাত আদায় করা হবে। যেমন বন্ধকী যমীন যদি মহাজনের আয়ত্তাধীনে থাকে, তাহলে মহাজনের নিকট থেকেই তার উশর আদায় করা হবে।

বিরাদকালে বিবাদমূলক সম্পত্তি যে ব্যক্তির আয়ত্তাধীনে থাকে, তার নিকট থেকে তার যাকাত আদায় করা হবে। আর মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যক্তির সপক্ষে মীমাংসা হবে যাকাত দানের দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে।

নালিশকৃত সম্পত্তির যাকাতের ব্যাপারটিও একই রূপ। এ সম্পত্তি কার্যত যতদিন যার আয়ত্তাধীন থাকে, ততদিন তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ যে ব্যক্তি যে বস্তু থেকে ফায়দা হাসিল করবে তার যাবতীয় দায় তাকেই পরিশোধ করতে হবে।

(ঘ) উপহার, উপঢৌকন ও পুরস্কার যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে বছর অতিক্রান্ত হবার পর, যে ব্যক্তিকে তা দান করা হয়েছিল তার নিকট থেকে তার যাকাত আদায় করা হবে।

(ঙ) বীমা ও প্রভিডেন্ট ফান্ড যদি বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে তা যখন ফেরত পাওয়া যাবে কেবল তখন এর উপর মাত্র এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি তা স্বেচ্ছাধীন হয়, তাহলে, আমাদের মতে, প্রতি বছরের শেষে কোনো ব্যক্তির নামে বীমা কোম্পানীতে প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে টাকা জমা হয়, তার যাকাত আদায় করতে হবে। কারণ যদিও সে এ টাকা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে লাভ করতে সক্ষম নয়, তবুও যেহেতু সে নিজের অর্থকে স্বেচ্ছায় এ অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, তাই তার যাকাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

(চ) দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রের (ডায়েরী ফার্ম) গবাদি পশু পণ্য-উৎপাদকের পর্যায়ভুক্ত। তাই এগুলির উপর যাকাত নেই। তবে ডেয়ারী ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর, অন্যান্য কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায় যাকাত নির্ধারিত হবে।

কৃষি দ্রব্যের মধ্যে যেগুলি গুদামজাত করার যোগ্য, সেগুলির উপর উশর অথবা উশরের অর্ধাংশ ওয়াজিব। শুকনা ফল, খোরমা প্রভৃতি যেসব ফল গুদামজাত করা যায়, সেগুলির উপরও অনুরূপ যাকাত ওয়াজিব। যেসব জমিতে বৃষ্টির পানিতে ফসল উৎপন্ন হয়, সেগুলির উপর উশর ওয়াজিব এবং যেসব জমিতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হয় সেগুলির ফসলের উপর উশরের অর্ধাংশ ওয়াজিব।

শাক-সবজি, তরিতরকারী, ফুল, ফল প্রভৃতি যেগুলি গুদামজাত করা যায় না, সেগুলির উপর অবশ্যি উশর ওয়াজিব নয়, কিন্তু কৃষক যদি সেগুলি বাজারে বিক্রয় করে, তাহলে নিসাব পরিমাণে পৌঁছালে তার উপর ব্যবসায়িক যাকাত ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারে ব্যবসায়ে যে নিসাব সেই নিসাবই নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ ঐ ব্যবসায়ে নিয়োগকৃত বছরের শুরুতে ও শেষে দুশো দিরহাম বা তার চেয়ে অধিক হতে হবে।

(ছ) খনিজ দ্রব্যের ব্যাপারে আমাদের মতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতই সর্বোত্তম। অর্থাৎ ধাতব, তরল (যেমন পেট্রোল, পারদ প্রভৃতি) বা ঘন (যেমন গন্ধক, কয়লা প্রভৃতি) যে কোনো প্রকারের বস্তু জমি থেকে বের হয় তার মূল্য যদি নিসাব পরিমাণে পৌঁছে এবং তা যদি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয়, তাহলে তার উপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত ওয়াজিব। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) শাসনামলে এ মতই কার্যকর ছিল (আল মুগান্না লি ইবনে কুদামা, ২য় খন্ড পৃঃ ৫৮১)

(জ) লব্ধ গুপ্তধনের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ওয়া ফির্ রিকাযিল খুম্স অর্থাৎ গুপ্তধন থেকে এক-পঞ্চমাংশ (শতকরা ২০ ভাগ) যাকাত আদায় করতে হবে।

(ঝ) প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নিজের ঘরে যেসব মূল্যবান বস্তু রেখে যায় সেগুলির উপর যাকাত ওয়াজিব নয় তবে যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সেগুলি রাখা হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

(ঞ) মধুর একটি পরিমাণ যাকাত হিসেবে গৃহীত হবে অথবা অন্যান্য ব্যবসায়িক পণ্যের উপর যেমন যাকাত নির্ধারিত হয় মধু ব্যবসায়ের উপরও তেমনি যাকাত নির্ধারিত হবে। তবে এ ব্যাপারে দ্বিমত আছে। হানাফীদের মতে, মধুর পরিমাণ যাকাত হিসাবে গৃহীত হবে। ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়ায়হ, উমর ইবনে আবদুল আযীয, ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস এই মতের প্রবক্তা। ইমাম শাফেঈর একটি বাণীও এই মতের সমর্থনে পাওয়া যায়। বিপরীতপক্ষে ইমাম মালিক ও সুফিয়ান সাওরী বলেন, 'মধুর পরিমাণের উপর যাকাত নেই।' এটিই ইমাম শাফেঈর মশহুর মত বলে পরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন ঃ 'মধুর যাকাতের ব্যাপারে কোনো সহীহ্ হাদীস নেই।' আমাদের মতে মধুর ব্যবসায়ের উপর যাকাত নির্ধারণ করাই উত্তম।

(ট) মাছের পরিমাণের উপর যাকাত নেই, বরং অন্যান্য ব্যবাসায়িক পণ্যের ন্যায় মাছের ব্যবসায়ের উপর যাকাত ওয়াজিব।

মণি-মুক্তা এবং অন্যান্য যেসব বস্তু সমুদ্র থেকে উত্তোলিত হয়, আমাদের মতে সেগুলির ব্যাপারে খনিজ দ্রব্যের পথ অনুসৃত হওয়া উচিত। এটি ইমাম মালিকের মত এবং হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনামলে এটিকেই কার্যকর করা হয়েছে। (কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৩৪৯, কিতাবুল মুগান্না লি ইবনে কুদামা, ২য় খন্ড পৃঃ ৫৮৪)

(ঠ) পেট্রোলের ব্যাপারে খনিজদ্রব্য প্রসংগে যা বর্ণিত হয়েছে তাই প্রযোজ্য।

(ড) রফতানীর উপর কোনো যাকাত নেই। আমদানীর উপর হযরত উমরের (রা) আমলে যে কর আদায় করা হতো, তা যাকাতের পর্যায়ভুক্ত ছিল না। তা ছিল নিছক প্রতিবেশী দেশসমূহ ইসলামী রাষ্ট্র থেকে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর নিজেদের দেশে যে কর আদায় করতো কেবল তার বিরুদ্ধে জবাবী ব্যবস্থা।

(৯) খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে রাসূলুল্লাহর (সা) আমলের যাকাতের দ্রব্যসমূহের তালিকায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন করা হয়নি, বরং সেখানে যাকাতের দ্রব্যাদির তালিকায় এমন কতিপয় বস্তুর নাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল যেগুলিকে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্ধারিত যাকাতের দ্রব্যাদির উপর 'কিয়াস' করা যেতে পারতো। যেমন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয মহিষকে গরুর উপর 'কিয়াস' করেন এবং গরুর উপর রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত মহিষের উপরও নির্ধারণ করেন।

(১০) সব রকমের মুদ্রার উপর যাকাত ওয়াজিব। উপরে ৮ম নম্বরের খ দফায় এ

সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেসব মুদ্রার প্রচলন নেই বা যেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে অথবা যেগুলি সরকার ফেরত নিয়েছে, সেগুলিতে যদি সোনা রূপা থাকে, তাহলে সেগুলির মধ্যে যে পরিমাণ সোনা বা রূপা আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই সেগুলির উপর যাকাত নির্ধারিত হবে।

অন্য দেশের মুদ্রা যদি আমাদের দেশের মুদ্রার সাথে সহজে বদল করা সম্ভব হয়, তাহলে তা নগদ অর্থের পর্যায়ভুক্ত হবে। আর যদি বদল করা সম্ভব না হয়, তাহলে যখন তার মধ্যে নিসাব পরিমাণ সোনা ও রূপা মওজুদ থাকবে কেবল তখনই তার উপর যাকাত নির্ধারিত হবে।

(১১) সরকারী কর্মচারীবৃন্দ যে সম্পদ পর্যবেক্ষণ ও নির্ধারণ করতে পারে, তাকে বলা হয় প্রকাশ্য সম্পদ এবং সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে যে সম্পদ পর্যবেক্ষণ ও নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয় না, তা হচ্ছে গোপন সম্পদ। ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ প্রকাশ্য সম্পদের পর্যায়ভুক্ত।

(১২) যে সম্পদ প্রকৃতিগতভাবে বৃদ্ধি লাভের যোগ্যতা রাখে অথবা প্রচেষ্টা ও কর্মের দ্বারা যাকে বৃদ্ধি করা যেতে পারে, তা বর্ধনশীল সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এই সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব সম্পদ বর্ধনশীল কেবল সেগুলোর উপর যাকাত নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সঞ্চিত অর্থের মালিক তার বৃদ্ধি রোধ করেছে তাই এর উপর যাকাত নির্ধারিত হয়েছে।

(১৩) যেসব বস্তু ভাড়ায় খাটানো হয়, প্রচলিত নিয়মানুসারে তাদের লাভ থেকে তাদের অর্থ নির্ধারিত করা হবে এবং তাথেকে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত গৃহীত হবে। লাইস ইবনে সাআদ বলেন, 'যে সমস্ত উট ভাড়ায় খাটানো হতো আমি মদীনায় তাদের থেকে যাকাত নিতে দেখেছি।' (কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৩৭৬)

(১৪) গবাধি পশু (উট, মহিষ, ছাগল এবং এগুলির সমপর্যায়ভুক্ত পশু) যদি বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালন করা হয় এবং তাদের সংখ্যা নিসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী হয়, তাহলে শরীয়ত গবাদি পশুর জন্যে যে যাকাত নির্ধারণ করেছে, (এর বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্যে পড়ুন মওলানা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভীর সীরাতুন নবী, ৫ম খন্ড, পৃঃ ১৫৬-১৬৭), তার উপরও সেই একই পরিমাণ যাকাত নির্ধারিত হবে। আর যদি সেগুলি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর ব্যবসায়ের যাকাত নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ যদি তাদের মূল্য নিসাব পরিমাণ (দুশো দিরহাম) বা তার চেয়ে বেশী হয়, তাহলে তা থেকে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত গৃহীত হবে। আর যদি তাদেরকে কৃষি বা যানবাহনের কাজে লাগানো হয় বা কোনো ব্যক্তি যদি নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্যে তাদেরকে পালন করে, তাহলে তাদের সংখ্যা যত বেশী হোক না কেন, তাদের উপর কোনো যাকাত নেই।

যদি শখ করে মুরগী ও অন্যান্য পশু পালন করা হয়, তাহলে তার উপর যাকাত নেই। আর যদি সেগুলি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পালন করা হয়, তাহলে তার উপর ব্যবসায়ের যাকাত নির্ধারিত হবে। আর যদি ডিম বিক্রি করার জন্যে মুরগী প্রতিপালন কেন্দ্র (পোল্ট্রি) কায়েম করা হয়, তাহলে তা পূর্বোক্ত ডেয়ারী ফার্ম ও অন্যান্য কারখানার পর্যায়ভুক্ত হবে।

গবাদি পশুর যাকাত বাবদ নগদ টাকা নেয়া যেতে পারে এবং গবাদি পশুও নেয়া যেতে পারে। হযরত আলী (রা) এ ফতওয়া দিয়েছেন। (কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৩৬৮)

(১৫) যেসব বস্তুর উপর যাকাত ওয়াজিব সেসবের যাকাতের হার নিম্নরূপ ঃ

কৃষি উৎপাদন	ঃ বৃষ্টির পানিতে চাষাবাদ হলে শতকরা ১০ ভাগ এবং কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে হলে শতকরা ৫ ভাগ।
নগদ টাকা ও সোনা-রূপা	ঃ শতকরা আড়াই ভাগ।
ব্যবসায়িক পণ্য	ঃ শতকরা আড়াই ভাগ।
গবাদিপশু	ঃ উপরের বর্ণনা অনুযায়ী সীরাতুন নবীর ৫ম খন্ডের নক্শা দেখে নিন।
খনিজ দ্রব্য	ঃ শতকরা আড়াই ভাগ।
গুপ্তধন	ঃ শতকরা ২০ ভাগ।
কারখানার দ্রবাদি	ঃ শতকরা আড়াই ভাগ।

(১৬) খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নির্ধারিত নিসাব ও যাকাতের হারের মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধন করা হয়নি। বর্তমানেও এর কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। আমাদের মতে রাসূলুল্লাহর (সা) পর তাঁর নির্ধারিত হার পরিবর্তন করার অধিকার কারোর নেই।

(১৭) নগদ অর্থ, রূপা, ব্যবসায়িক পণ্য, খনিজ দ্রব্য, গুপ্তধন ও কারখানার দ্রব্যাদির নিসাব হচ্ছে দুশো দিরহাম। মাওলানা আবদুল হাই ফিরিংগী মহলের অনুসন্ধান মতে দুশো দিরহামের রূপা আমাদের দেশের প্রচলিত ওজনের হিসাব অনুযায়ী ৩৬ তোলা ৫ মাশা ৪ রতি হয়। কিন্তু সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ওজন।

মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের অনুসন্ধান অনুযায়ী ২০টি স্বর্ণ খচিত মিসকাল ৫ তোলা ২ মাশা ৪ রতি সোনার সমান। তবে সাড়ে ৭ তোলা সোনাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ওজন।

আবু উবায়েদ লিখিত কিতাবুল আমওয়ালে যে হিসাব দেখানো হয়েছে, সে পরিপ্রেক্ষিতে ১০ দিরহামের ওজন ৭ স্বর্ণখচিত মিসকালের সমান।

(১৮) এর জবাব ১৬ নম্বরে দেয়া হয়েছে। তবে সোনার নিসাব পরিবর্তন সম্ভব। কারণ ২০ মিসকালের কথা যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

(১৯) খনিজ দ্রব্য, গুপ্তধন ও কৃষি উৎপাদন ছাড়া বাকী যাবতীয় দ্রব্যের যাকাতের জন্য শর্ত হচ্ছে এই যে, তা নিসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে অধিক পরিমাণ থাকতে হবে এবং তা পূর্ণ একটি বছর থাকতে হবে। খনিজ দ্রব্য ও গুপ্তধনের এক বছর অতিবাহিত হবার শর্ত নেই। অন্যদিকে ফসল কাটার সাথে সাথেই কৃষি উৎপাদনের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়। বছরে দু'বার বা তার চেয়ে অধিকবার ফসল হলেও প্রতিবারেই ফসল কাটার পর যাকাত দিতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ আতু হাক্কাহু ইয়াওমা হিসাদিহ্।

(২০) এর জবাব ১৯ নম্বরে দেয়া হয়েছে।

(২১) যেহেতু আজকাল যাবতীয় ব্যাপারে এবং হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে সৌর বছর ব্যবহৃত হচ্ছে, তাই যাকাতের ব্যাপারেও সৌর বছর ব্যবহারে ক্ষতি নেই। চন্দ্র বছরের হিসাবে যাকাত দান করা ওয়াজিব হবার বিষয়টি কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। যাকাত আদায় করার জন্যে কোনো বিশেষ মাস নির্ধারণ করা হয়নি। সরকার যে তারিখ থেকে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থা করবে, সেই তারিখ থেকেই বর্ষ শুরু করা যেতে পারে।

(২২) ও (২৩) কুরআন মজীদে যাকাতের ৮টি ব্যয়ক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে যথা ঃ গরীব, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারীবৃন্দ, দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি, গোলাম মুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও মুসাফির।

গরীব অর্থ হচ্ছে, নিজের জীবন ধারণের জন্যে যে ব্যক্তি অন্যের মুখাপেক্ষী হয়। এ শব্দটি সকল প্রকার অভাবীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বার্ধক্য বা অংগ-প্রত্যংগের কোনো প্রকার ত্রুটির কারণে যারা স্থায়ীভাবে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় অথবা কোনো সাময়িক কারণে আপাতত সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় এবং কিছুটা সাহায্য লাভ করে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এমন প্রত্যেকটি লোক এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন এতীম ছেলেমেয়ে, বিধবা মহিলা, বেকার ও উপার্জনক্ষম এবং কোনো সাময়িক দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিবর্গ।

মিসকীন শব্দের ব্যাখ্যা হাদীসে এভাবে দান করা হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন পরিমাণ সামগ্রী লাভ করে না, মানুষ তাকে সাহায্য করে বলে বুঝা যায় না এবং মানুষের সামনে হাতও পাতে না।" এ প্রেক্ষিতে মিসকীন এমন এক ভদ্র ও শরীফ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের রোযী-রোযগারের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে কিন্তু নিজের প্রয়োজন পরিমাণ রোযী আহরণে সক্ষম হয় না। তাকে উপার্জনরত দেখে লোকেরা তাকে সাহায্য করে না। অন্যদিকে নিজের শরাফতের কারণে সে কারও কাছে হাতও

পাততে পারে না।

যাকাত আদায়কারী কর্মচারী বলতে তাদেরকে বুঝায়, যারা যাকাত উসূল, বন্টন ও তার হিসাব-নিকাশে নিযুক্ত থাকে। তারা নিসাবের মালিক হোক বা না হোক সর্বাবস্থায়ই তারা যাকাতের অর্থ থেকে পারিশ্রমিক লাভ করবে।

দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যাদেরকে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরোধিতা থেকে বিরত রাখা অথবা এই স্বার্থে খেদমতে নিয়োজিত করাই উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থ দিয়ে তাদের মনতুষ্টি করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এরা কাফিরও হতে পারে আবার এমন মুসলমানও হতে পারে যাদের ইসলাম তাদেরকে ইসলামী স্বার্থের খেদমতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে যথেষ্ট হয়না। উপরন্তু এরা ইসলামী রাষ্ট্রের বাসিন্দাও হতে পারে, আবার অন্য কোনো দেশের বাসিন্দাও হতে পারে। এ ধরনের লোকেরা নিসাবের মালিক হলেও ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে তাদেরকে যাকাত দিতে পারে। আমরা এ ব্যাপারে একমত নই যে, দুর্বলচিত্ত (মুয়াল্লিফাতুল কুলূব) ব্যক্তিদের অংশ চিরতরে মুলতবী হয়ে গেছে। হযরত উমর (রা) এ ব্যাপারে যে মত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা কেবল তাঁর নিজের যামানার জন্যে ছিল, পরবর্তী সকল যমানার জন্যে তিনি এ মত প্রতিষ্ঠা করেননি।

গোলাম মুক্তির অর্থ হচ্ছে এই যে, গোলামকে মুক্ত করার জন্যে যাকাত দেয়া। যদি কোনো যুগে গোলাম না থাকে, তাহলে তখন এ খাতটি মুলতবী থাকবে।

ঋণগ্রস্ত বলতে এমনসব ঋণীদের বুঝানো হয়েছে, যারা নিজেদের সম্পূর্ণ ঋণ আদায় করে দেবার পর তাদের নিকট নিসাব পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট থাকে না। তারা উপার্জনকারী হতে পারে আবার বেরোযগারও হতে পারে।

আল্লাহর পথে জিহাদ অর্থ হচ্ছে তরবারি, কলম, কথা বা হাত পা-এর সাহায্যে আল্লাহর পথে শ্রম ও প্রচেষ্টা চালানো। পূর্ববর্তী আলেমগণের একজনও একে জনসেবার অর্থে ব্যবহার করেননি। তারা সবাই এর অর্থকে আল্লাহর দীন কায়েম করা, তার প্রচার প্রসার ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্যে প্রচেষ্টা চালানো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

মুসাফির তার স্বদেশে ধনীও হতে পারে, কিন্তু সফর অবস্থায় যদি সে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে যাকাতের মাধ্যমে সাহায্য করা যেতে পারে।

(২৪) যাকাতের টাকা কুরআন নির্ধারিত প্রত্যেকটি ব্যয়ক্ষেত্রে একই সঙ্গে ব্যয় করা অপরিহার্য নয়। সরকার প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যে যে ব্যয়ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সংগত মনে করে ব্যয় করতে পারে। এমনকি প্রয়োজন দেখা দিলে একই ব্যয়ক্ষেত্রে সব অর্থও ব্যয় করা যেতে পারে।

(২৫) যাকাতের হকদারদের মধ্য থেকে গরীব ও মিসকীনরা যদি নিসাবের মালিক না হয়, তাহলে তারা যাকাত নিতে পারে। যাকাত বিভাগে কর্মরত কর্মচারী ও

মুয়াল্লিফাতুল কুলূবগণকে নিসাবের মালিক হওয়া সত্ত্বেও যাকাত দেয়া যেতে পারে। গোলাম নিছক গোলাম হওয়ার কারণেই তার মুক্তির জন্যে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যেতে পারে। ঋণগ্রস্ত যদি তার ঋণ আদায় করার পর নিসাবের মালিক না থাকে, তাহলে যাকাত নিতে পারে। আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা যদি নিসাবের মালিক হয়, তাহলেও সফর অবস্থায় এ খাত থেকে অর্থ সাহায্য করা যেতে পারে। মুসাফির সফর অবস্থায় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হলেই কেবল যাকাত গ্রহণ করতে পারে।

বনি হাশিমদের জন্যে যাকাত গ্রহণ করা হারাম। কিন্তু বর্তমানে এদেশে কে বনি হাশিম আর কে বনি হাশিম নয় এ পার্থক্য করা বেশ কঠিন ব্যাপার। কাজেই সরকার প্রত্যেক অভাবীকেই যাকাত দেবে। কিন্তু গ্রহীতা নিজে বনি হাশিম হওয়া সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হয়, তাহলে যাকাত গ্রহণ না করা হবে তার নিজের কর্তব্য।

(২৬) রাষ্ট্রের ধনাগারে যাকাত সংগৃহীত হবার পর রাষ্ট্র তা থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দান করতে পারে এবং রাষ্ট্র নিজেও সেই অর্থে যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও কায়েম করতে পারে।

(২৭) যারা স্থায়ী বা সাময়িকভাবে যাকাতের মুখাপেক্ষী তাদেরকে স্থায়ী বা সাময়িকভাবে মাসোহারা দেয়া যেতে পারে।

(২৮) 'আল্লাহর পথে' যাকাত দেবার খাতটি 'জনসেবা'র সমার্থক গণ্য করার মতো ব্যাপক নয়।

(২৯) যাকাতের অর্থ থেকে 'কর্জে হাসানা' দেয়ায় কোনো বাধা নেই। বরং বর্তমান অবস্থায় অভাবীদেরকে কর্জে হাসানা দেয়ার জন্যে বায়তুলমালে একটি খাত নির্দিষ্ট করা আমাদের মতে অতি উত্তম কাজ।

(৩০) সাধারণ অবস্থায় যে এলাকার যাকাত সেই এলাকার অভাবীদের মধ্যে বন্টন করাই বিধেয়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের আমলে একবার রায় শহরের যাকাত কুফায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি আবার তাকে রায় শহরে ফেরত পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৫৯০) তবে অন্য কোনো এলাকায় যদি যাকাতের অত্যধিক প্রয়োজন থাকে, তাহলে নিজ এলাকায় বন্টন করার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে অথবা যেখানে প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে কম, সেখান থেকে যাকাতের অর্থ পূর্বোক্ত স্থানে পাঠানো যেতে পারে। আর তা হবে সহানুভূতি ও তালীফে কুলূবের উদাহরণ। তবে এ ব্যাপারে দেশের অভাবীরা যেন বঞ্চিত না থেকে যায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। এলাকার অর্থ হচ্ছে প্রশাসনিক সার্কেল। জেলা, বিভাগ ও প্রদেশ তিনটিই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। দেশের তুলনায় এলাকা বললে প্রদেশ বুঝাবে, প্রদেশের তুলনায় বিভাগ বুঝাবে এবং বিভাগের তুলনায় জেলা বুঝাবে।

(৩১) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে সর্বপ্রথম তার ঋণ আদায় করা হবে, যা সে অন্যের

নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলো। অতঃপর তার যাকাতের যে অংশ বাকি আছে তা আদায় করা হবে। তারপর তার অসীয়ত পূর্ণ করা হবে এবং সর্বশেষে যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হবে। মালিকের মৃত্যুর কারণে তার সম্পদের যাকাত খতম হয়ে যাবে না। সে অসীয়ত না করে গেলেও তার সম্পদ থেকে তা আদায় করা হবে। আতা, যুহ্‌রী, কাতাদা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মুহাম্মদ, ইসহাক ইবনে রাহ্‌ওয়ায়হ্‌ ও আবু সাওর প্রায় এই একই ধরনের মত পোষণ করেন। কোনো কোনো ফকীহ্‌ মত প্রকাশ করেছেন যে, মৃত ব্যক্তি যদি যকাত আদায় করার জন্যে অসিয়ত করে গিয়ে থাকে, তাহলে তার সম্পদ থেকে তা আদায় করা হবে, অন্যথায় আদায় করা হবে না। কিন্তু আমাদের মতে এটি কেবল গুপ্ত সম্পদের ক্ষেত্রে যথার্থ হতে পারে। কারণ এক্ষেত্রে হতে পারে মালিক তার যাকাত আদায় করে দিয়েছে, অন্যরা তার খবর রাখে না। কিন্তু প্রকাশ্য সম্পদের যাকাত আদায় করার ব্যবস্থা যখন সরকার নিজেই করছে, তখন এর কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই যাকাতের অর্থ ঐ ব্যক্তির যিম্মায় ঋণরূপে গণ্য হবে। প্রথমে তার সম্পদ থেকে ব্যক্তির ঋণ আদায় করা হবে, অতঃপর আল্লাহ ও জামায়াতের ঋণ।

(৩২) যাকাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে বাহানাবাজি করার পথ রোধ করার জন্যে তিনটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। এক. রাষ্ট্র পরিচালনার ভার এমন লোকদের হাতে ন্যস্ত করতে হবে যারা হবে ঈমানদার, যারা উৎকোচ গ্রহণ করবে না, যারা যাকাত আদায় ও বন্টনের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নেবে না এবং যারা যাকাতের খাতে আদায়কৃত অর্থের বৃহদাংশ নিজেদের বেতন ও এলাউন্সে ব্যয় করবে না। যাকাত আদায়কারীরা যদি বিশ্বস্ত ও ঈমানদার হয়, তাহলে জনগণ তাদের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারবে যে, তাদের যাকাত সঠিক পদ্ধতিতে আদায় এবং যথার্থ ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে। কাজেই যাকাত আদায় থেকে বাঁচবার জন্যে তারা বাহানাবাজি করার চেষ্টা করবে না।

দুই. সমাজ চরিত্রের সংস্কার সাধন করতে হবে। জনগণের চরিত্র ও কর্মজীবনকে আল্লাহর মহব্বত ও তাঁর ভীতির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। সরকারের কাজ কেবল দেশের প্রশাসনিক বিষয়াবলী ও দেশরক্ষা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতে হবে।

তিন. যাকাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের সাধারণ ও সম্ভাব্য উপায়সমূহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি, তার যেসব সম্পদের উপর যাকাত নির্ধারিত হতে পারে, সেগুলির একটি অস্বাভাবিক পরিমাণ-বছর শেষ হবার পূর্বেই নিজের কোনো আত্মীয়ের নামে লিখে দেয় বা তার নিকট হস্তান্তরিত করে তাহলে তার উপর মোকদ্দমা চালাতে হবে এবং যাকাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সে যে এভাবে সম্পদ হস্তান্তর করেনি এর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করার ভার তার উপর দিতে হবে।

(৩৩) আমাদের মতে যাকাত আদায় ও বন্টন ব্যবস্থা প্রদেশের পরিচালনাধীন থাকা উচিত এবং কেন্দ্রকে এ ব্যাপারে এতটুকু ক্ষমতা দান করা উচিত যার ফলে সে এক প্রদেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত যাকাত অন্য এক প্রদেশে প্রেরণ করতে পারে, যেখানকার যাকাত স্থানীয় স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম নয়। উপরন্তু কেন্দ্রের এ ক্ষমতাও থাকা উচিত যে, যাকাতের টাকা থেকে যদি এমন কোনো প্রতিষ্ঠান কায়েম করা বা এমন কিছু কাজ করার প্রয়োজন দেখা দেয় যা দেশের ভেতরে ও বাইরে 'আল্লাহর পথে জিহাদ' করার সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা দেশের বাইরে কোনো স্বাভাবিক বিপদে সাহায্য পাঠাবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সে প্রদেশসমূহের নিকট থেকে যেন তাদের যাকাতের একটি অংশ তলব করতে পারে।

(৩৪) আমাদের মতে যাকাত আদায় করার জন্যে কোনো পৃথক বিভাগ কায়েম করার প্রয়োজন নেই। অন্যান্য যাবতীয় ট্যাক্স আদায় করার জন্যে যে সকল বিভাগ পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত আছে, সেগুলির মাধ্যমেই যাকাত আদায় করা উচিত। যেমন ফসল ও গবাদি পশুর যাকাত জমির খাজনাদি আদায় সংক্রান্ত বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে, ব্যবসাজাত পণ্যের যাকাত আয়কর বিভাগের মাধ্যমে আদায় করা যেতে পারে, কারখানার যাকাত এক্সাসাইজ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে এবং এভাবে যাকাতের অন্যান্য বিভাগগুলিকেও সরকারী কর বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে। সরকারী অর্থ-দফতরের অধীনে যাকাতের সংরক্ষণ এবং এর হিসাব একাউন্টেন্ট জেনারেলের বিভাগের অধীনে পরিচালিত হতে পারে।

আমাদের সুপারিশ অনুযায়ী যাকাতকে যদি প্রদেশের কর্তৃত্বাধীন করা হয় এবং যাকাত আদায় সংক্রান্ত কোনো বিভাগের কাজ যদি কোনো কেন্দ্রীয় দফতরের অধীন করা হয়, তাহলে একটি পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে যাকাত আদায় সংক্রান্ত ঐ বিভাগের যাবতীয় ব্যয়ভার প্রদেশের উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

তবে যাকাত বন্টন এবং যাকাতের বিভিন্ন ব্যয়ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার জন্যে একটি পৃথক বিভাগ কায়েম করা অপরিহার্য। এ বিভাগটিকে ওয়াকফ সম্পত্তি ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধানকারী দফতরের অধীনস্থ করা যেতে পারে।

(৩৫) একথা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখা উচিত যে, যাকাত কোনো ট্যাক্স নয়, বরং একটি 'আর্থিক ইবাদত'। মৌলিক চিন্তা ও নৈতিক প্রাণশক্তির দিক দিয়ে 'ট্যাক্স' ও 'ইবাদতের' মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য বিদ্যমান। সরকারী কর্মচারী ও যাকাতদাতাদের মধ্যে যদি 'ইবাদতের' পরিবর্তে 'ট্যাক্সের' মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে এর ফলে যাকাত থেকে যেসব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ফায়দা হাসিল করা আসল উদ্দেশ্য, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যাবে এবং সামগ্রিক ফায়দাসমূহও বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যাকাত আদায় ও বন্টন করার ভার রাষ্ট্রের হাতে সোপর্দ করার অর্থ এ

নয় যে, এটি একটি সরকারী ট্যাক্স। বরং মুসলমানদের সকল সামগ্রিক ইবাদতে শৃংখলা আনয়ন করা ইসলামী রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব, এজন্যেই এ ইবাদতটির ব্যবস্থাপনাও সরকারের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। যাকাত আদায় ও বন্টন করার ন্যায় নামায কায়েম ও হজ্জ পরিচালনাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

(৩৬) হাদীসে এ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'মানুষের অর্থসম্পদে যাকাত ছাড়া অন্যান্য হকও আছে।' এই নীতিগত বিধানের উপস্থিতিতে ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত ছাড়া অন্য কোনো ট্যাক্স লাগাতে পারে কিনা তেমন কোনো প্রশ্নই সৃষ্টি হতে পারে না। উপরন্তু কুরআনে যখন যাকাতের জন্যে মাত্র কয়েকটি ব্যয়ক্ষেত্র নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, তখন এথেকে অনিবার্যভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এই কটি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারের উপর যেসব দায়িত্ব অর্পিত হয় সেগুলি সম্পাদন করার জন্যে সরকার জনগণের উপর অন্যান্য ট্যাক্স লাগাতে পারে। উপরন্তু কুরআনে এই নীতিগত বিধানও দেয়া হয়েছে যে, 'ইয়াসআলুনাকা মাযা ইউনফিকুন, কুলিল আফওয়া।' অর্থাৎ 'তারা তোমার (রাসূলুল্লাহর) নিকট জিজ্ঞেস করে, আমরা কি খরচ করবো? তাদেরকে বলো, তোমাদের উদ্বৃত্তাংশ।' 'আফওয়া' বা উদ্বৃত্তাংশ হচ্ছে ঋডমভমবধড Surplus-এর সমার্থক। এখানে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে যে, 'আফওয়া' হচ্ছে ট্যাক্সের যথার্থ স্থান। উপরন্তু খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে যাকাত ছাড়া অন্যান্য ট্যাক্স লাগানো হয়েছে এর বহু নজীর আছে। যেমন হযরত উমরের (রা) আমলে আমদানী কর নির্ধারিত হয় এবং একে যাকাতের মধ্যে নয় বরং 'ফায়' (রাষ্ট্রের সাধারণ আয়) এর মধ্যে গণ্য করা হয়। এ ছাড়াও শরীয়তের এমন কোনো নির্দেশ নেই যাথেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, রাষ্ট্র সামগ্রিক প্রয়োজনের খাতিরে অন্য কোনো ট্যাক্স লাগাতে পারবে না। বরং এক্ষেত্রে নীতি হচ্ছে এই যে, যে বস্তুকে নিষিদ্ধ করা হয়নি সেটি হচ্ছে মোবাহ। যতদূর আমরা জানি ফকীহগণের মধ্যেও একমাত্র যিহাক ইবনে মুযাহিম নামক জনৈক অপ্রসিদ্ধ ফকীহ ছাড়া একজনও একথা বলেননি যে, 'নাসাখাতিয যাকাতু কুল্লা হাক্কিন ফিল মাল।' (যাকাত অর্থসম্পদের বাকি সমস্ত হক নাকচ করে দিয়েছে।) যিহাকের এই মতকে কোনো উল্লেখযোগ্য ফকীহই সমর্থন জানাননি। (আল মুহাল্লা লি ইবনে হাযম, ২য় খন্ড পৃঃ ১৫৮)

(৩৭) ইসলামের প্রথম যুগে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তহসীলদার নিযুক্ত ছিলেন। তারা প্রকাশ্য ধনসম্পদ যেসব স্থানে থাকতো, সেখানে গিয়ে নিজেরাই তার যাকাত আদায় করে আনতেন। যাকাত জমা করার জন্যে কোনো পৃথক অর্থ-দফতর থাকতো না, বরং রাষ্ট্রের সাধারণ অর্থ-দফতরেই তা জমা হতো। তবে এর হিসাব পৃথক থাকতো। রাষ্ট্রের যে সকল কর্মচারী অন্যান্য সরকারী কার্যসমূহ আঞ্জাম দিতেন তারাই যাকাতও বন্টন করতেন। যাকাত বন্টন করার জন্যে কোনো পৃথক বিভাগ ছিল বলে আমরা জানি না। কিন্তু এ সকল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, আমরা বর্তমান অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী, যেভাবে

সংগত মনে করি সেভাবে বাস্তব কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি।

বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কেউ যাকাত আদায় ও বন্টন করার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে বলে আমরা জানিনা।

(৩৮) আমাদের মতে ইসলামী রাষ্ট্রকেই যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজ করা উচিত।

(৩৯) যাকাত আদায় ও বন্টনকার্যে রত কর্মচারীদের বেতন, এলাউন্স, পেনশন ও কাজের শর্তসমূহ অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের থেকে পৃথক হওয়া উচিত নয়। অবশ্যি সকল সরকারী কর্মচারীর বেতনের ব্যাপারে সরকারী কর্মপদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হওয়া উচিত। বেতনের ব্যাপারে বর্তমান অসামঞ্জস্য ও বিপুল ব্যবধান অপরিবর্তিত থাকলে যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও বন্টন সম্ভব হবে না।

(তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর, ১৯৫০)

৬. যাকাতের নিসাব ও হার কি পরিবর্তন করা যেতে পারে?[১]

প্রশ্ন ঃ যাকাত সম্পর্কে এক ব্যক্তি বলেন যে, অবস্থা ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে এর হারের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিজের যামানার পরিপ্রেক্ষিতে শতকরা আড়াই ভাগকে সংগত মনে করেছিলেন। বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র চাইলে অবস্থানুযায়ী এ হার বাড়াতে বা কমাতে পারে। তার যুক্তি ছিল—কুরআনে যাকাত সম্পর্কে বহু আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু কোথাও এর হারের কথা উল্লেখ করা হয়নি। যদি কোনো বিশেষ হার অপরিহার্য হতো, তাহলে অবশ্যি তা উল্লেখ করা হতো। বিপরীতপক্ষে আমার দাবি ছিল ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ চিরন্তন, তার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধনের অধিকার আমাদের নেই। তবে তার যুক্তি সম্পর্কে বলা যায়, ভবিষ্যতে তিনি বলবেন যে, নামাযের রাকআতের মধ্যে পরিবর্তন করা দরকার এবং নামায পড়ার পদ্ধতিও বদলানো উচিত, কারণ তার নিকট অবস্থা ও কালের তাগিদটাই বড় কথা। তাহলে তো রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ আর নির্দেশ থাকবে না, বরং খেলার পুতুলে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত আমি বলেছিলাম ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের অত্যধিক প্রয়োজন দেখা দিলে—'ইন্না ফীল্ মালে হাক্কান সেওয়ায্ যাকাত' হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় অর্থ আদায় করতে পারে। যাকাতের হার চিরন্তন হবার ব্যাপারে এই হাদীসটি থেকে পরোক্ষ ইংগিত পাওয়া যায়। যাকাতের হার যদি পরিবর্তিত হতে পারতো, তাহলে এ হাদীসটির প্রয়োজন কি ছিল? কিন্তু এরপরও তিনি নিজের দাবিতে অটল। মেহেরবানী করে আপনি এ ব্যাপারে আলোকপাত করুন।

জবাব ঃ যাকাতের ব্যাপারে আপনার যুক্তি যথার্থ। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্ধারিত সীমা ও হারের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার অধিকার আমাদের নেই। এ দুয়ারটি একবার উন্মুক্ত হয়ে গেলে কেবল এই যাকাতের নিসাব ও হারের উপরই আঘাত আসবে না, বরং নামায রোযা, হজ্জ, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি বহু বিষয়ের পরিবর্তন-পরিবর্ধন শুরু হয়ে যাবে এবং সর্বত্র এর গতি হবে অপ্রতিরোধ্য। উপরন্তু এ দুয়ারটি উন্মুক্ত করার পর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যে যে ভারসাম্য কায়েম করেছেন, তা খতম হয়ে যাবে। অতঃপর ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়ে যাবে। ব্যক্তি চাইবে নিসাব ও হারের মধ্যে তার স্বার্থানুকূল্যে পরিবর্তন, অন্যদিকে সমাজও চাইবে তার স্বার্থানুকূল্যে পরিবর্তন।

---

১. রাসায়েল ও মাসায়েল ২য় খন্ড থেকে গৃহীত।

নির্বাচনের সময় এ বিষয়টি একটি সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করবে। নিসাব কমিয়ে ও হার বাড়িয়ে যদি কোনো আইন প্রণীত হয়, তাহলে এর মাধ্যমে যে সকল ব্যক্তির স্বার্থহানি হবে তারা ইবাদতের সত্যিকার প্রাণশক্তি অনুযায়ী যথার্থ আন্তরিকতা ও আনন্দ সহকারে তা দান করবে না, বরং ট্যাক্সের ন্যায় জোর জবরদস্তি মনে করেই দান করবে এবং টালবাহানা ও পলায়নের পথ খুঁজে বেড়াবে। বর্তমানে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মনে করে শির নত করে দেয় এবং ইবাদতের আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে সানন্দে যাকাত পরিশোধ করে; পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে যথেচ্ছভাবে নিসাব ও হার নির্ধারিত হলে, তেমনটি আর কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না।

(তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১)

৭. কোম্পানীর শেয়ারে যাকাত

প্রশ্ন ঃ কোনো অংশীদারী কারবার, যেমন কোম্পানীর শেয়ারসমূহের যাকাত সংক্রান্ত বিষয়টি বুঝতে পারছিনা। শেয়ার নিজে তো কোনো মূল্যবান বস্তু নয়। একটি কাগজের টুকরা মাত্র।[১] শুধুমাত্র এই দলীল দ্বারা অংশীদার কোম্পানীর মাল সামান ও অংশীদারী বিষয় সম্পত্তিতে শামিল হয়ে, নিজের শেয়ারের পরিমাণ অনুসারে মালিক বা অংশীদার হিসেবে পরিগণিত হয়।

দেখতে হবে, কোম্পানীর সম্পত্তি কি এবং কোন্ ধরনের। যদি কোম্পানীর বিষয় সম্পত্তি অট্টালিকা, জমি ও মেশিনপত্র সম্বলিত হয়, তবে অংশীদারের অংশীদারিত্ব এগুলোর উপরই ধার্য হবে। এমতাবস্থায় আপনার বিবৃত নীতি অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে না। অংশীদারের অংশে পুঁজি তো অবশ্যই আছে। কিন্তু তা মোট পুঁজির অংশ মাত্র যা অস্থাবর সম্পত্তির আকারে সামষ্টিকভাবে কোম্পানী লাভ করেছে। তারপরও অংশীদারের অংশের উপর যাকাত ধার্য হবে কেন?

জবাব ঃ কোম্পানীর যে অংশীদারের অংশের মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়, তার সম্পর্কে একথা বুঝতে হবে যে, সে নিসাব পরিমাণের মালিক। এবার সে যদি নিজের অর্থ কোম্পানীর কারবারে বিনিয়োগ করে, তবে তার থেকে তার পুঁজির হারে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত নেয়া যাবে না। বরং কোম্পানী থেকে ব্যবসায়িক যাকাতের নিয়মানুযায়ী যাকাতের উপযুক্ত ঘোষিত সকল অংশীদারের যাকাত একত্রে নিতে হবে। কোম্পানীর যাকাত হিসাবের সময় মেশিন, জায়গা, আসবাবপত্র ইত্যাদি উৎপাদন উপকরণ বাদ দিতে হবে। অন্যান্য সম্পদ, যা ব্যবসায়ের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত এবং কোম্পানীর কোষাগারে বছরান্তে মওজুদ অর্থ ইত্যাদির উপর যাকাত দিতে হবে। যদি কোম্পানীর কারবার এ ধরনের না হয়, তবে কোম্পানীর বার্ষিক আয় হিসেবে তার আর্থিক মান

---

১. শেয়ার সম্পর্কে প্রশ্নকর্তা অনেক ভুল চিন্তা পেশ করেছেন। কাগজের টুকরা না শেয়ার হয় আর না আসল গুরুত্বের দাবী করতে পারে। বরং এটা একটা দলীল, যা একথা প্রমাণ করে যে, অমুক ব্যক্তি এরই সুবাদে অমুক কারবারে অংশীদার। যদি দু'জন লোক একটি দোকানে সমান সমান শরীক হয় এবং তারা নিজেদের শরীকানার উপর কোনো দলীল লিখে রাখে, তাহলে দলীল তাদের আসল শেয়ারে শরীক হবে না, বরং দলীল তাদের অংশীদারিত্ব প্রমাণ করবে। অনেক শেয়ারের সম্মিলিত কারবারের এই একই অবস্থা। একথাও ভুল যে, "শেয়ার নিজে কোনো মূল্যবান বস্তু নয়।" কেননা 'শেয়ার' মানে হলো পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো একটি কারবার এবং এর পুঁজি ও কারবারের সাথে সম্পর্কিত মাল সম্পত্তির মালিকানার অধিকারে শরীক হওয়া। শেয়ারের মূল্য হেয়ালি বস্তু নয়, বরং একটি ধ্রুব সত্য তথ্য।

নির্ণয় করতে হবে এবং তার উপর যাকাত ধার্য করতে হবে। (তরজমানুল কুরআন, রবিউল আওয়াল, রবিউস্‌সানী, ১৩৭০ হিঃ জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ইং)

প্রশ্ন ঃ এ পর্যন্ত ব্যবসায়ের শেয়ারে যাকাত সম্পর্কে আপনার যেসব লেখা আমার নজরে পড়েছে সেখানে যেন একটি ইসলামী রাষ্ট্র অথবা কমপক্ষে যাকাত আদায়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে মনে করা হয়েছে। এখন সেখানে যেন সমস্যা কেবল এতটুকু যে, যাকাত কোন্ পর্যায়ে ও কার থেকে আদায় করা হবে? যতদিন কোনো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কায়েম হচ্ছে না ততদিন শেয়ারের যাকাত গ্রহণ করার জন্যে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে?

আমি নিজের শেয়ারকে অর্থের প্রতিবদল হিসেবে কিয়াস করে তার মূল্য যে পরিমাণ অর্থ হয় তা থেকে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আদায় করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু শেয়ারের বার্ষিক আয়কর বাদ দিয়ে তা থেকে যা পাই তা পুরোপুরি তার যাকাতে ব্যয় হয়ে যায়। এ অবস্থা তো একেবারেই অসন্তোষজনক।

উত্তর ঃ ব্যবসায়ের শেয়ারের যাকাত এমন কোনো নীতির ভিত্তিতে আদায় করা যাবে না যার ফলে একথা মনে হয় যে, শেয়ারের অর্থ আপনার কাছে জমা আছে এবং আপনি জমা টাকার যাকাত আদায় করে চলেছেন। বরং ব্যবসা পণ্যের যাকাত আদায়ের যে নীতি নির্ধারিত রয়েছে তার ভিত্তিতে এরও যাকাত আদায় করতে হবে। সে নীতিটি হচ্ছে, ব্যবসা শুরু করার দিন থেকে এক বছর অতিক্রান্ত হবার পর দেখতে হবে মওজুদ পণ্য (Stock in Trade) কি পরিমাণ আছে। তার মূল্য কত। আর হাতে নগদ (Cash in hand) কত টাকা আছে। উভয়ের সমষ্টির উপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। এ নীতির ভিত্তিতে একটি কোম্পানী বা বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে আপনার যে শেয়ারগুলো রয়েছে বর্তমান বাজারদর হিসেবে তার মূল্য কত দেখতে হবে। বছরের মাঝখানে এক ব্যক্তি তার শেয়ার বা শেয়ারগুলো যতবারই বিক্রি করুক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি কোম্পানীর প্রথম শেয়ারটি যখন কেনেন তখন থেকেই বছর গণনা করা হবে এবং বছরের শেষে আপনার শেয়ারের বাজার দর (Market price) যা হবে তার প্রেক্ষিতে যাকাত নির্ধারণ করা হবে। এই সংগে আপনার কাছে নগদ কত আছে তাও দেখা হবে। উভয়ের সমষ্টির উপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। তবে একথা স্বতন্ত্র যে, ট্যাক্স প্রদানের পর আপনার লাভের অর্থের পরিমাণ এত কমে যায় যে, তা থেকে যাকাত আদায় করলে হাতে আর কিছু থাকে না। এ অবস্থার কোনো সুরাহা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা তো এমন একটি রাষ্ট্রের অধীনে থাকার শাস্তি যে রাষ্ট্র ট্যাক্স আদায় করার সময় যাকাতের প্রতি কোনো নজরই দেয় না। এ শাস্তি আমাদের অবশ্যি ততদিন পর্যন্ত ভোগ করা উচিত যতদিন না আমরা এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদলে দেই যার অধীনে আমরা বাস করে আসছি।

প্রশ্ন ঃ বাণিজ্যিক শেয়ারের যাকাত সম্পর্কে ১৯৬২ সালের জুলাই এবং ১৯৫০ সালের নভেম্বরের তরজমানুল কুরআনে প্রকাশিত আপনার লেখা এ মুহূর্তে আমার সামনে রয়েছে।

ইসলামী আইনের মূলনীতির আলোকে যৌথ কারবারে বিনিয়োগকৃত মূলধনের যাকাত একবার মাত্র আদায় করতে হয়। এই মূলনীতির আলোকে আপনার নভেম্বর ৫০-এর লেখা অনুসারে যদি কোম্পানীর কাছ থেকে একত্রে যাকাত আদায় করা হয়, তাহলে সেই কোম্পানীর অংশীদারদের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য বাণিজ্যিক শেয়ারের যাকাত আলাদাভাবে আদায় করা উচিত নয়। এ কথাটাও লক্ষণীয় যে, "যে অংশীদার যাকাতযোগ্য পরিমাণের চেয়ে কম শেয়ারের অধিকারী অথবা যে অংশীদার এক বছরের চেয়ে কম সময়ব্যাপী স্বীয় শেয়ারের মালিক থাকে....." তাকে বাদ দিয়ে কোম্পানীর কাছ থেকে শেয়ার বাবদ যাকাত আদায় করতে হবে। যে অংশীদার কোনো কোম্পানীতে যাকাতযোগ্য পরিমাণের চেয়ে কম শেয়ারের অধিকারী, সে নিজে যাকাতযোগ্য অর্থের অধিকারী কি না, সেটা জানা প্রায়ই দুরূহ হয়ে থাকে।

এ সমস্যার আর একটা দিক বিবেচনা সাপেক্ষ। অংশীদারদের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য শেয়ারের উপর ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করা এবং কোম্পানীর শেয়ারের উপর সমষ্টিগতভাবে যাকাত আদায় করার অর্থনৈতিক ফলাফল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হবে। এমন হতে পারে যে, কোম্পানী বার্ষিক যাকাতের অর্থকে স্বীয় ব্যয়ের একটা স্থায়ী অংশ ধরে নিয়ে সেই অনুপাতে নিজের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হবে। কেননা সমগ্র যাকাত লভ্যাংশ থেকেই দেওয়া সব সময় সম্ভব হবে, এটা নিশ্চিত নয়। অনুরূপভাবে, যাকাত দেওয়ার পরও অংশীদারদেরকে লভ্যাংশ বাবদ কিছু দেওয়া যাবে—একথা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু অংশীদারদের কাছে থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাকাত নেওয়া হলে তা দ্বারা পণ্যমূল্যের উপর এ ধরনের প্রভাব পড়ে না।

তরজমানুল কুরআনের একই সংখ্যায় ২২ পৃষ্ঠায় ভাড়া দেওয়া জিনিসকে যাকাতযোগ্য বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। এ মত যদি সঠিক হয়, তাহলে ভাড়ায় চালানো ট্যাক্সী, ট্রাক ও বাসের সামগ্রিক মূল্যমানের উপরও এই বিধি কার্যকর হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি একাধিক বাড়ী ও দোকানের মালিক এবং সেগুলোর ভাড়া পায়, তার কাছ থেকে বাড়ী ও দোকানসমূহের সামগ্রিক মূল্যের শতকরা আড়াই ভাগ ট্যাক্স আদায় করা উচিত। এই দু'টো ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আমার, দু'টো কারণে, সংশয় রয়েছে। প্রথমত, পূর্বতন মনীষীদের থেকে শুরু করে এযাবত কেউ ভাড়া দেওয়া ঘরবাড়ীর সমগ্য মূল্যমানের উপর যাকাত জরুরী হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন বা তদনুযায়ী কাজ করেছেন, এমন কথা শুনিনি। দ্বিতীয়ত, "কিতাবুল আমওয়াল" গ্রন্থের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় লাইস বিন সা'দের বরাতে যে হাদীস আপনি

উদ্ধৃত করেছেন, তাকে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা এখানে সঠিক বলে মনে হয় না। ভাড়ার উট ভাড়ায় খাটানোর কারণে যাকাত দেওয়া জরুরী হয় তা নয়, বরং শুধুমাত্র উট হওয়ার কারণেই তা যাকাতযোগ্য। আশা করি সমস্যাটির উপর আরো কিছু আলোকপাত করে এ খট্‌কা দূর করবেন।

জবাব ঃ যাকাত সম্পর্কে নভেম্বর, ৫০-এর তরজুমানে যে লেখা ছাপা হয়েছে তা সরকারের প্রশ্নপত্রের জবাব ছিল। সে জবাব দেওয়া হয়েছিল এরূপ ধারণার ভিত্তিতে যে, সরকারী পর্যায়ে কোম্পানীর যাকাত আদায় করা হবে। পক্ষান্তরে জুলাই, ৬২-এর তরজুমানে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছিল এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, কোম্পানীকে যাকাত দিতে হবে না, বরং অংশীদারদেরকে নিজ নিজ যাকাত আপন উদ্যোগে দিতে হবে। এই পার্থক্যটা নজরে রেখে আপনি উভয় জবাব পড়ে দেখুন। কোম্পানী যখন যাকাত দিয়ে দেবে তখন এক একজন অংশীদারের আলাদা আলাদাভাবে যাকাত দেওয়ার আর প্রশ্নই ওঠে না। তবে অংশীদাররা ব্যক্তিগতভাবে যাকাতযোগ্য অর্থের অধিকারী কিনা, সেটা অনুসন্ধান করা কোম্পনীর পক্ষে দুঃসাধ্য। এটা অংশীদারদেরই দায়িত্ব যে, তারা কোম্পানীকে নিজের যাকাতযোগ্য সম্পদের মালিক না হওয়ার কথা জানাবে, যাতে তাদের শেয়ার যাকাত হিসাবে ধরা না হয়।

যাকাত আদায় করা যদি সরকারের ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত হয়, তাহলে যাকাত আদায়কারীর একথা অজানা থাকা সম্ভব নয় যে, কোম্পানী স্বীয় যাকাত বাবদ প্রদেয় অর্থকে বাণিজ্যিক ব্যয়ের অংশ গণ্য করে পণ্যের দাম বাড়িয়েছে। সরকারী উদ্যোগে এ প্রবণতা রোধ করা সম্ভব। কিন্তু যদি সরকারী ব্যবস্থাপনা থেকে না থাকে তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে শুধু সেই কোম্পানী স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাকাত দেবে, যার পরিচালকদের কিছু না কিছু ইসলামী চেতনা বিদ্যমান। এরূপ লোকেরা এক হাতে যাকাত দিয়ে অন্য হাতে তা ফেরত নেওয়ার ফন্দি আঁটবে বলে মনে হয় না। আর যদিবা তারা এমন করে তবে পরবর্তী বছর তাদের উপর আরো বেশী যাকাত ধার্য হবে। পুনরায় যদি মূল্য বৃদ্ধি করে তবে যাকাত আবারও বৃদ্ধি পাবে। এভাবে শেষ পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি করা আর সম্ভব হবে না।

ভাড়ায় খাটানো সম্পদের ব্যাপারে যা লেখা হয়েছিল তা ছিল সংক্ষিপ্ত। তাই বিষয়টা পরিষ্কার হয়নি। আমার বক্তব্য এই যে যারা আসবাবপত্র বা মোটরগাড়ী বা এ ধরনের অন্যান্য জিনিস ভাড়ায় খাটানোর ব্যবসা করে তাদের ব্যবসায়ের মূল্যমান সে ব্যবসায়ে লব্ধ মুনাফার অনুপাতে নিরূপণ করা হবে। তার অর্থ এ নয় যে, এই ভাড়ায় খাটানো আসবাবপত্র বা মোটর গাড়ীর মূল্যের উপর যাকাত ধার্য্য করা হবে। কেননা এগুলো তো তাদের অর্থোপার্জনের উপকরণ। উপকরণের উপর যাকাত ধার্য্য হয় না। অর্থাৎ, একটা কারবারে যে মুনাফা অর্জিত হয়, তার ভিত্তিতে স্থির করা হবে যে, এ পরিমাণ মুনাফা অর্জনকারী কারবারের মূল্যমান কি নিরূপিত হওয়া উচিত। আর ভাড়া

দেওয়া বাড়ী সম্পর্কে আমারও এজন্য সংশয় রয়েছে যে, অতীতের ফিকাহবিদগণের পক্ষ থেকে এসবের উপর যাকাত ধার্য করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়না।

ভাড়ায় খাটা উটের উপর যাকাত ধার্য না হওয়ার কারণ আমি যা বলেছি তাই। অর্থাৎ অর্থোপার্জনের উপকরণ বা প্রাণীর উপর যাকাত আরোপিত হয় না, যেমন হালের বলদ বা পরিবহণের প্রাণী। এগুলোর উপর বিধিবদ্ধ পশুর যাকাত আরোপিত হবে না। অনুরূপভাবে ডেয়ারী ফার্মের পশুর উপর যাকাত আরোপিত হবে না। কেননা এগুলোর দ্বারা যে পণ্য উৎপাদিত হয়, তার উপর যাকাত আরোপিত হওয়ার মাধ্যমেই এগুলোর যাকাত আদায় হয়ে যায়। ভাড়ায় খাটানো উটও অর্থোপার্জনের উপকরণ পদবাচ্য। তাই পশুর যাকাতের বিধির আওতায় অথবা মূল্য নির্ধারণপূর্বক এদের যাকাত আরোপিত হবে না। বরং এই ভাড়ায় খাটানোর ব্যবসায়ের যে বাজারমূল্য নিরূপিত হবে তার উপর যাকাত আরোপিত হবে। (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩)

৮. শ্রম ও অর্থের অংশীদারী অবস্থায় যাকাত

প্রশ্ন ঃ দু'জন মিলে অংশীদারী ভিত্তিতে কারবার শুরু করলো। প্রথম শরীক পুঁজি দিল এবং শ্রমও দিল। দ্বিতীয় শরীক শুধুমাত্র শ্রমের ভিত্তিতে অংশীদার। মুনাফা বন্টনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো যে, মোট মুনাফার তিনটি ভাগ হবে। একভাগ মূলধনের। বাদবাকি দু'ভাগ দু'শরীকের। এরূপ ব্যবসায়ের যাকাত সংক্রান্ত বিষয়ে দু'টি প্রশ্নের উদয় হয়। এর জবাব দান করে নিশ্চিন্ত করবেন ঃ

(ক) যদি ব্যবসায়ের সর্বমোট পুঁজি থেকে এক জায়গায় যাকাত বের করা হয়, তবে দ্বিতীয় শরীকের পক্ষ থেকে এ আপত্তি উঠে যে, ব্যবসায়ের পুঁজি কেবলমাত্র পুঁজি মালিকের মালিকানাধীন। পুঁজির বিনিময়ে পুঁজিমালিক ভিন্নভাবে মুনাফাও পেয়ে থাকে। সুতরাং পুঁজির যাকাত পুঁজিমালিককেই দিতে হবে। দ্বিতীয় শরীকের এ আপত্তি যুক্তিসংগত কি?

(খ) ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে। যাকাত লাভ-লোকসান নয়, বরং পুঁজির সাথে সম্পর্কিত। ব্যবসায়ে লোকসান হলেও মওজুদ পুঁজির উপর যাকাত দিতে হবে। লোকসানের অবস্থায় যদি কারবার থেকে যাকাত বের করা হয়, তবে দ্বিতীয় শরীকের অংশের যাকাতের এক-তৃতীয়াংশ অর্থ তার আগামী বছরের মুনাফা থেকে বের করা হবে, যদি আগামী বছরেও তাকে যাকাতের অর্থ এক-তৃতীয়াংশ দিতে হয়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় শরীকের উপর এটা আর যাকাত হিসেবে রইলো না। বরং পুঁজিমালিকের পুঁজির যাকাতের এক অংশ আদায় করা ট্যাক্স হয়ে যায়। এ পদ্ধতি যাকাতের আসল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী নয় কি?

জবাব ঃ আপনার উভয় প্রশ্নের জবাব নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

(ক) দ্বিতীয় শরীকের এ আপত্তি ঠিক নয়। যাকাত শুধুমাত্র সেই মূলধনের উপর ধার্য হয় না যে মূলধন দিয়ে কারবারের সূচনা হয়েছিল। বরং কারবারের সকল অর্থসম্পদের উপর যাকাত ধার্য হয়। সঠিক পদ্ধতি হলো, গোটা কারবার থেকে প্রথমত যাকাত বের করতে হবে। তারপর পারস্পরিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে মুনাফা বন্টন করতে হবে।

(খ) ব্যবসায়িক সম্পদের যাকাতের পদ্ধতি হলো, কোনো তিজারতী মাল যদি নিসাব পরিমাণের অতিরিক্ত হয় তাহলে তা থেকে যাকাত বের করতে হবে। এবার যে ব্যক্তি শুধুমাত্র শ্রমের বিনিময়ে শরীক, তার এ শ্রম ব্যবসা সৃষ্টিতে অবশ্যই কিছু না কিছু অংশ নিয়েছে। কারবারের এ অর্থসম্পদ শুধুমাত্র প্রাথমিক মূলধনের ফল নয়। এ জন্যে যাকাতের দু'অংশ পুঁজি মালিকের আদায় করতে হবে আর এক অংশ আদায় করবে শ্রম বিনিয়োগকারী। (তরজমানুল কুরআন, রবিউস্‌সানী, ১৩৭২ হিঃ জানুয়ারী, ১৯৫৩)

৯. খনিজ সম্পদে যাকাতের নিসাব[১]

প্রশ্ন ঃ সকল ফিকাহর গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে যে, রৌপ্যের যাকাতের নিসাব দু'শত দিরহাম অর্থাৎ ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা এবং সোনার নিসাব ২০ দীনার অর্থাৎ ৭$\frac{১}{২}$ তোলা। আলেমগণ বলেছেন, যদি কারো নিকট সোনা রূপা দুটোই থাকে এবং তা নিসাবের চেয়ে কম পরিমাণ থাকে তবে এমতাবস্থায় সোনার মূল্য রূপার সংগে মিলিয়ে কিংবা রূপার মূল্য সোনার সংগে মিলিয়ে (এ দুটোর মধ্যে যেটা অভাবগ্রস্তদের জন্যে কল্যাণকর হয়) সমন্বিত পরিমাণ দেখতে হবে।—এ পর্যন্তকার কথা তো পরিষ্কার। কিন্তু তারা আবার একথাও বলেন, যদি কেবল রূপা হয়, তবে রূপার নিসাব ধরা হবে, আর যদি কেবল সোনা হয়, তবে সোনার নিসাবই হিসাবের ভিত্তি ধরা হবে। এমনটি হলে তো একথা জরুরী হয়ে পড়ে যে, যদি কারো নিকট ষাট টাকা থাকে তবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু যার নিকট ৬ তোলা সোনা থাকে সে যাকাত প্রদান থেকে মুক্ত। অথচ সম্পদশালী হবার দিক থেকে বিচার করলে তো বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী সে ৫০০ টাকার মালিক। কিন্তু আলেমদের ফতোয়া প্রথম ব্যক্তির উপর যাকাত ধার্য করে আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যাকাত থেকে মুক্ত রাখে। অথচ কম সম্পদের মালিক থেকে যাকাত আদায় করা আর অধিক সম্পদের মালিককে রেহাই দেয়া বড় বিস্ময়কর ব্যাপার।

আমি আমার নিজের চিন্তাভাবনায় এটাই বুঝি যে, আজকাল সোনা-রূপার মূল্যের মধ্যে যে তারতম্য বিরাজ করছে, পূর্বকালে সেটা ছিল না। আজকাল তো ৭৫:১ কিংবা ৮০:১ এর তারতম্য বিদ্যমান। নবী করীম (সা)-এর যুগে প্রায় ৭:১ এর তারতম্য ছিলো। এই মূল্যের ভিত্তিতে যাকাত ফরয করা হয়েছে এবং ১৪০ মিসকাল রৌপ্য হচ্ছে নিসাবের ভিত্তি। নবী করীম (সা) যাকাতের নিসাব নির্ধারণ প্রসংগে এ পরিমাণ রৌপ্যের কথাই উল্লেখ করেছেন। সে যুগে যেহেতু ১৪০ মিসকাল রৌপ্যের মূল্য ২০ মিসকাল (৭$\frac{১}{২}$ তোলা) সোনার মূল্যেরই সমান ছিলো। তাই এ পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ কখনো এটা হতে পারে না যে, কিয়ামত পর্যন্ত সোনার যাকাতের নিসাব ৭$\frac{১}{২}$ তোলাই নিদিষ্ট থাকবে। বরঞ্চ ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা রৌপ্যের মূল্য পরিমাণ সোনা হলেই তা যাকাতের নিসাব হবে। অর্থাৎ যার নিকট সোনা আছে সে তার মূল্য যাচাই করে দেখবে। তা যদি ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমান হয়ে যায় কিংবা তার চেয়ে বেশী মূল্যের হয় তবে তাকে যাকাত প্রদান করতে হবে।

---

১. তরজমানুল কুরআন ঃ রজব ১৩৬৫, জুন ১৯৪৬।

কোনো ফিকাহর কিতাবে আমার এ ধারণার সমর্থন নেই। আর বর্তমান যুগের আলেমগণও এ মত মেনে নিতে রাজী নন। এ মতের যেটিকে আপনি অগ্রাধিকার দেবেন সেটাই আমার সান্ত্বনার কারণ হবে।

জবাব ঃ এ পর্যন্ত তো আপনার ধারণা যথার্থ যে, নবী করীম (সা)-এর যুগে সোনা-রূপার মূল্যগত পার্থক্য কেবল ততোটাই ছিলো যতোটা নিসাব এর পরিমাণ থেকে জানা যায়। অর্থাৎ ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা রৌপ্যের মূল্য ছিলো ৭$\frac{১}{২}$ তোলা সোনার সমান। কিন্তু আপনার এ ধারণার সাথে আমি একমত হতে পারছিনা যে, বর্তমানে সোনা-রূপার মূল্যগত যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, সেজন্যে সোনার নিসাব পরিবর্তন করে কেবল রৌপ্যের মূল্যের ভিত্তিতেই নিসাব ধার্য করতে হবে। এ মতের সাথে একমত না হতে পারার কারণসমূহ হচ্ছে ঃ

(১) এ ফায়সালা করা বড়ই কঠিন যে, মানদন্ড সোনাকে ধরা হবে, না রূপাকে? সোনার নিসাব রূপার মূল্যের ভিত্তিতে কম বেশী করা হবে? এর মধ্য থেকে যে কোনোটিকেই ভিত্তি বা মানদন্ড ধরা হোক না কেন, তা হবে শরীয়ত বিরোধী কাজ। কেননা শরীয়ত প্রণেতা তো দুটো জিনিসের বিধান পৃথক পৃথক বর্ণনা করেছেন। তিনি আকারে ইংগিতেও এমন কোনো কথা বলেননি যার থেকে এ অর্থ বের করা যেতে পারে যে, সোনা-রূপার মধ্যে কোনো একটিকে অপরটির জন্য মানদন্ড বা ভিত্তি নির্ধারণ করা যেতে পারে।

(২) কেবল মাত্র দরিদ্রের কল্যাণ হওয়াটা এমন কোনো আকাট্য ও প্রামাণ্য মানদন্ড নয়, যার উপর আস্থা স্থাপন করে শরীয়ত প্রণেতার এক সুস্পষ্ট নির্দেশকে সংশোধন করার দুঃসাহস করা যেতে পারে।

(৩) ভবিষ্যতে সোনা-রূপার মূল্যগত আরো পার্থক্য ও তারতম্য হতে থাকবে। যদি এগুলোর যাকাতের নিসাব পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারিত না থাকে এবং একটার নিসাবকে আরেকটার ভবিষ্যতে পরিবর্তনশীল মূল্যের উপর নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, তবে এই স্থায়ী পরিবর্তনশীলতার কারণে শরীয়তের একটি সুনির্দিষ্ট বিধান কার্যকর থাকবে না। এতে সাধারণ মানুষকে শরীয়তের বিধান পালনে বাস্তব ক্ষেত্রে দারুণ ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে।

(৪) সোনা-রূপার নিসাব নির্ধারণে আপনি যে সমস্যা পেশ করছেন, সেই একই সমস্যা বিরাজ করছে ছাগল, উট, গরু, মহিষ এবং ঘোড়ার নিসাব নির্ধারণে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে এগুলোর মধ্যে বিরাট তারতম্য সৃষ্টি হয়ে আসছে। এগুলোর ব্যাপারেও এ ফায়সালা করা কষ্টকর যে, এর কোনটিকে মূল ও মানদন্ড ধরে অন্যসবগুলোর নিসাব সেই মোতাবিক পরিবর্তন করতে থাকতে হবে।

এসব কারণে যাকাত প্রদানের ব্যাপারে স্বয়ং শরীয়ত প্রণেতা যে নিসাব নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং যে পরিমাণ এবং সংখ্যার ভিত্তিতে যাকাত ধার্য করেছেন সেটাকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে হুবহু ঠিক রাখাই উচিত।

১০. যাকাত ও ট্যাক্সের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন ঃ আজকের এই স্বাধীন নাগরিক সভ্যতার যুগেও গরীব ও মিসকীনদের জন্য ধনী ও সচ্ছল লোকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক যাকাত আদায় করা কি সমীচীন হবে, যখন তারা অন্য বহু রকমের ট্যাক্স ছাড়া আয়করও দিয়ে থাকে?

জবাব ঃ যাকাত সম্পর্কে সর্বপ্রথম একথা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে, এটা কোনো ট্যাক্স নয়, বরং একটা ইবাদত এবং ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ, ঠিক নামায, রোযা ও হজ্জ যেমন ইসলামের এক একটা স্তম্ভ। কুরআনকে খোলা চোখ নিয়ে যে ব্যক্তি পড়েছে সে দেখতে পায় যে, কুরআনে সাধারণতভাবে নামায ও যাকাতকে একই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাকাতকে ইসলামের একটি স্তম্ভ বলে অভিহিত করা হয়েছে। সর্বযুগে সকল নবী যাকাতকে ইসলামের অংশরূপে মানতেন। কাজেই একে ট্যাক্স বা কর মনে করা এবং এর সাথে ট্যাক্সের মত আচরণ করা সর্বপ্রথম মৌলিক ভ্রান্তি। একটি ইসলামী সরকার যেমন স্বীয় কর্মচারীদের কাছ থেকে অফিস সংক্রান্ত কাজ এবং অন্যান্য কাজ আদায় করে বলতে পারে না যে, এখন আর নামায পড়ার দরকার নেই। কেননা তোমরা সরকারী কর্তব্য পালন করেছো। অনুরূপভাবে সরকারের এ কথাও বলার অধিকার নেই যে, যাকাত আর দিতে হবে না। কেননা ট্যাক্স আদায় করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারীরা সময়মত নামাজ পড়তে পারে এমনভাবে অফিসের কাজের সময় নির্ধারণ করা ইসলামী সরকারের কর্তব্য। অনুরূপভাবে তাকে যাকাত দেয়ার অবকাশ সৃষ্টির জন্য কর আরোপ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে হবে।

তাছাড়া একথাও জানা দরকার যে, বর্তমান করসমূহের মধ্যে কোনো করই সেইসব খাতে ও সেই পদ্ধতিতে ব্যয়িত হয় না যার জন্য যাকাত ফরয করা হয়েছে এবং যেভাবে তা বন্টন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(তারজুমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৬১)

১১. যাকাতের পরও কি আয়কর আরোপ করা বৈধ?[১]

প্রশ্ন ঃ ইসলাম কি যাকাত উসূল করার সাথে সাথে আয়কর আরোপ করারও অনুমতি দেয়?

জবাব ঃ জি হ্যাঁ, ইসলামী রাষ্ট্রে এ দুটিই এক সাথে জায়েয হতে পারে। যাকাতের ব্যয়খাত পুরোপুরি নির্ধারিত। সূরা তওবায় এগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। ঠিক তেমনি এর নিসাব (অর্থাৎ সর্বনিম্ন যে পরিমাণ সম্পদের উপর যাকাত আরোপিত হয়) এবং হারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এসব ব্যাপারে কোনো প্রকার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন জায়েয নয়। বলাবাহুল্য এরপর রাষ্ট্র অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধ করলে দেশবাসীর নিকট থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। এ সাহায্য গ্রহণ যদি বলপূর্বক হয়, তাহলে তা ট্যাক্সে পরিণত হয়। যদি স্বেচ্ছামূলক হয়, তাহলে তা পরিণত হয় চাঁদায়। আর যদি ফেরত দেবার শর্ত থাকে, তাহলে হয় ঋণ। যাকাত ও অন্যান্য ট্যাক্স পরস্পরের পরিপূরক হতে পারেনা এবং এদের একটি অন্যটিকে বাতিলও করতে পারেনা।

এ হচ্ছে এ প্রশ্নটির নীতিগত জবাব। কিন্তু এইসংগে আমি আপনাকে এতটুকু নিশ্চয়তা দান করতে পারি যে, আমাদের দেশে একটি যথার্থ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেলে এবং বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর সাথে তার যাবতীয় ব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকলে, আজকের মতো এতরকম কর আরোপের প্রয়োজন থাকবেনা। বর্তমান যুগে ট্যাক্সের ব্যাপারে যতো রকম দুর্নীতি ও জালিয়াতি হয়, তা সবই আপনি জানেন। একদিকে যে উদ্দেশ্যে ট্যাক্স লাগানো হয় তার বড়জোর শতকরা দশভাগ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একে ব্যয় করা হয়। আবার অন্যদিকে ট্যাক্স থেকে নিষ্কৃতি লাভের (Evasion) একটা সাধারণ প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। কাজেই ব্যবস্থা যদি গলদমুক্ত হয়ে যেতে পারে, তাহলে বর্তমান প্রচলিত ট্যাক্সের একচতুর্থাংশই যথেষ্ট বিবেচিত হবে এবং এর কল্যাণকারিতাও কয়েকগুণ বেড়ে যাবে।

---

১. তরজমানুল কুরআন ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪।

নবম অধ্যায়

ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার[১]

হকের বেশে বাতিল

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে যে সর্বোত্তম সৃজন কাঠামোতে সৃষ্টি করেছেন, তার একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য এই যে, সে সুস্পষ্ট ফেৎনা-ফাসাদের প্রতি খুব কমই উদ্বুদ্ধ হয়। এ কারণেই শয়তান বাধ্য হয়ে ফেৎনা-ফাসাদকে (অনাচার-পাপাচার-বিদ্রোহ-বিশৃংখলা) কল্যাণ ও মংগলের প্রতারণামূলক পোশাকে আচ্ছাদিত করে মানুষের সামনে উপস্থাপিত করে। বেহেশতে হযরত আদম (আ) এবং হযরত হাওয়া (আ)-কে শয়তান একথা বলে কিছুতেই প্রতারিত করতে পারতো না যে, 'আমি তোমার দ্বারা খোদার নাফরমানী করাতে চাই যাতে করে তুমি বেহেশ্‌ত থেকে বহিষ্কৃত হতে পার।'

প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাঁদেরকে একথা বলেই প্রতারিত করলো

هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ -

(হে আদম ! তোমাকে কি এমন গাছটি দেখিয়ে দিব যা তোমাকে চিরন্তন জীবন ও চিরস্থায়ী বাদশাহী দান করবে?)

মানুষের এ প্রকৃতি আজো বিদ্যমান রয়েছে। আজও শয়তান মানুষকে যেসব ভুল ভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত করছে, তা কোনো না কোনো প্রতারণামূলক শ্লোগান অথবা কোনো না কোনো ভণ্ডামির আবরণের মাধ্যমে গৃহীত হচ্ছে।

পয়লা প্রতারণা ঃ পুঁজিবাদ এবং ধর্মহীন গণতন্ত্র

বর্তমানে সামাজিক সুবিচারের নামে যে প্রতারণার জালে মানুষকে আবদ্ধ করা হচ্ছে তার চেয়ে বড়ো প্রতারণা আর কিছু হতে পারে না। শয়তান প্রথমত কিছুকাল যাবত দুনিয়াকে ব্যক্তি স্বাধীনতা (INDIVIDUL LIBERTY) এবং উদারনীতির (LIBERALISM) নামে প্রতারণা করতে থাকে এবং তার ভিত্তিতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ ও ধর্মহীন গণতন্ত্রের এক ব্যবস্থা কায়েম হয়। এক সময়ে এ ব্যবস্থার এমন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, পৃথিবীর বুকে সেটাকে মানবীয় উন্নতির চূড়ান্ত রূপ মনে করা হতো। যে ব্যক্তি

---

১. এ প্রবন্ধটি ১৯৬২ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত মুতামারে আলমে ইসলামীর অধিবেশনে পাঠ করা হয়।

নিজেকে উন্নয়নকামী মনে করতো এমন প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও উদারনীতির শ্লোগান দিতে বাধ্য হতো। মানুষ মনে করতো যে, মানব জীবনের জন্যে কোনো ব্যবস্থা থাকলে তা শুধু এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং ধর্মহীন গণতন্ত্র যা পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দেখতে দেখতে সে সময়ও এসে গেল যখন সমগ্র দুনিয়া একথা অনুভব করতে লাগলো যে, এ শয়তানী ব্যবস্থা যুলম নির্যাতনে দুনিয়াকে গ্রাস করে ফেলেছে। তারপর আর অভিশপ্ত শয়তানের পক্ষে সম্ভব ছিল না যে, এ শ্লোগান দ্বারা আর কিছুকাল মানব জাতিকে ধোঁকা দেয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় প্রতারণা ঃ সামাজিক সুবিচার ও সমাজতন্ত্র

অতপর অনতিবিলম্বে সে শয়তানই সামাজিক সুবিচার ও সমাজতন্ত্রের নামে এক দ্বিতীয় প্রতারণা রচনা করে ফেল্লো। তারপর এ মিথ্যার আবরণে সে দ্বিতীয় এক ব্যবস্থাও কায়েম করিয়ে দিল। এ নতুন ব্যবস্থাটি এযাবত দুনিয়ার বিভিন্ন দেশকে নির্যাতন নিষ্পেষণে এমনভাবে নিষ্পেষিত করে ফেলেছে যে, মানবীয় ইতিহাসে তার কোনো নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তার প্রতারণার এমন বিরাট প্রভাব যে, দুনিয়ার বহু দেশ তাকে চরম উন্নতি মনে করে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে। এ প্রতারণার জাল এখনো পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি।

শিক্ষিত মুসলমানদের চরম মানসিক গোলামী

মুসলমানদের অবস্থা এই যে, তাদের কাছে খোদার কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাতে এক চিরন্তন পথ নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে যা শয়তানী কুমন্ত্রণা ও ধোঁকা প্রবঞ্চনা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া এবং জীবনের সার্বিক ব্যাপারে হেদায়াতের আলো দেখাবার জন্যে চিরকালের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু এ হতভাগ্য ভিখারীর দল তাদের দীন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং উপনিবেশবাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার আগ্রাসনে পরাভূত। অতএব দুনিয়ার বিজয়ী জাতিগুলোর ক্যাম্প থেকে যে শ্লোগানই ধ্বনিত হয়, সংগে সংগে এখান থেকেও তার প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়। যে সময়ে ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারার প্রাধান্য চলছিল সে সময় মুসলিম দেশগুলোর প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তি তার কর্তব্য মনে করতো সে চিন্তাধারা প্রচার করা এবং তদনুযায়ী নিজেকে ঢেলে সাজানো। সে মনে করতো এ ছাড়া তার কোনো মান সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং তাকে মনে করা হবে প্রগতিবিরোধী। এ যুগের যখন অবসান ঘটলো তখন আমাদের নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর কেবলাও পরিবর্তিত হতে লাগলো এবং নতুন যুগের আগমনের সাথে সাথেই আমাদের মধ্যে সামাজিক সুবিচার ও সমাজতন্ত্রের শ্লোগানদাতা লোক পয়দা হতে লাগলো। এতোটুকুতে তেমন কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর আবির্ভাবও হতে থাকে যারা তাদের কেবলার প্রতিটি পরিবর্তনের সাথে এটাও চাইতো যে, ইসলাম তার কেবলা পরিবর্তন করুক। যেন মনে

হয় এ বেচারা ইসলাম ছাড়া জীবন ধারণ করতেই পারবে না। তাই ইসলামের সাথে থাকাই তাদের প্রয়োজন। কিন্তু তাদের বাসনা এই যে, যাদের আনুগত্যে তারা এ উন্নতি করতে চায় তার আনুগত্য ইসলামও করুক এবং "পশ্চাদগামী দীন" হওয়ার কলংক থেকে ইসলাম বেঁচে যাক। এর ভিত্তিতেই প্রথমে এ চেষ্টা চলতে থাকে যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা, উদারনীতি এবং ধর্মহীন গণতন্ত্রের পাশ্চাত্য ধারণাকে একেবারে ইসলামী বলে প্রমাণিত করা হোক এবং এরই ভিত্তিতেই এখন প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে যে, ইসলামেও সমাজতান্ত্রিক ধারণা প্রসূত সামাজিক সুবিচার বিদ্যমান রয়েছে। এ পর্যন্ত পৌছুবার পর আমাদের উক্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মানসিক গোলামী ও জাহেলিয়াতের প্লাবনজনিত লাঞ্ছনাও চরমে পৌছে।

সামাজিক সুবিচারের অর্থ

আমি এক সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে একথা বলতে চাই যে, সামাজিক সুবিচার প্রকৃতপক্ষে কোন্ বস্তু এবং তা কায়েম করার সঠিক পন্থাই বা কি। যদিও এ ব্যাপারে খুব কমই আশা করা যায় যে, যারা সমাজতন্ত্রকে সামাজিক সুবিচারের একমাত্র উপায় মনে করে বসে আছেন তাঁরা তাঁদের ভুল স্বীকার করে নেবেন এবং এ নীতি পরিহার করবেন। কারণ অজ্ঞ যতোক্ষণ নিছক অজ্ঞই থাকে, তখন তার সংশোধনের অনেকটা সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন সে শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায় তখন সে বলে

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰـهٍ غَيْرِىْ

'আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো শাসক আছে বলে আমার জানা নেই।' তখন তার ঔদ্ধত্য ও গর্ব অহংকার কারো কথায় তাকে সম্মত হতে দেয় না। কিন্তু খোদার ফজলে সাধারণ জনগোষ্ঠী এমন রয়ে যায় যে, ন্যায়সংগত পদ্ধতিতে তাদেরকে বুঝানোর পর শয়তানের প্রতারণা থেকে সতর্ক করে দেয়া যেতে পারে। আর এ জনগোষ্ঠীকেই প্রতারণা করে পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী লোকেরা তাদের ভ্রান্ত প্রচারণার জাল বিস্তার করে। এজন্যে আমার এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে আসল সত্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা।

সামাজিক সুবিচার কেবল ইসলামেই রয়েছে

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে কথাটি আমি আমার মুসলমান ভাইদেরকে বুঝাতে চাই তা হলো এই যে, যারা "ইসলামেও সামাজিক সুবিচার বিদ্যমান রয়েছে" একথা বলে, তারা ভুল কথা বলে। সত্য কথা এই যে, একমাত্র ইসলামেই সামাজিক সুবিচার রয়েছে। ইসলাম এমন এক সত্য দীন তথা জীবনব্যবস্থা যা বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপ্রভু মানুষের পথ নির্দেশনার জন্যে নাযিল করেছেন। মানুষের মধ্যে সুবিচার কায়েম করা এবং কোন্‌টি সুবিচার ও কোন্‌টি সুবিচার নয়, একথা বলে দেয়া মানুষের স্রষ্টা ও

প্রভুরই কাজ। অন্য কারো এ অধিকার ও যোগ্যতা নেই যে, সুবিচার ও যুল্‌ম অবিচারের মাপকাঠি ঠিক করে দেবে। অন্য কারো মধ্যে এ যোগ্যতাও নেই যে, সে প্রকৃত সুবিচার কায়েম করবে। মানুষ নিজে নিজেই প্রভু ও শাসক নয় যে, সে নিজের জন্যে সুবিচারের মাপকাঠি স্বয়ং নির্ধারণ করার কোনো অধিকার রাখে। এ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তার স্থান হচ্ছে খোদার বান্দাহ ও প্রজার। সেজন্যে সুবিচারের মাপকাঠি নির্ণয় করা তার নিজের কাজ নয়, বরঞ্চ তার প্রভু ও শাসকের কাজ। তারপর মানুষ যতোবড়ো মর্যাদাসম্পন্নই হোক না কেন এবং একজন মানুষই নয় বরঞ্চ বহু উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ একত্রে সমবেত হয়ে তাদের মস্তিষ্ক চালনা করুক না কেন, মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, মানবীয় জ্ঞান বিবেকের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং মানবীয় বিবেকের উপর কামনা বাসনা ও গোঁড়ামির প্রভাব থেকে তারা কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না। এ কারণে এমন কোনো সম্ভাবনা নেই যে, মানুষ তার নিজের জন্যে এমন কোনো ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে যা প্রকৃতপক্ষে সুবিচার ভিত্তিক হবে। মানুষের রচিত ব্যবস্থায় প্রথম প্রথম দৃশ্যত যেমন সুবিচারই চোখে পড়ুক না কেন, অতি সত্বর বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দেয় যে, আসলে তার মধ্যে কোনো সুবিচার নেই। এ কারণেই প্রতিটি মানব রচিত ব্যবস্থা কিছুকাল চলার পর ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হয়। মানুষ তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অন্য একটি অর্থহীন ও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ অভিজ্ঞাতার দিকে অগ্রসর হয়। প্রকৃত সুবিচার একমাত্র সে ব্যবস্থায় পাওয়া যেতে পারে, যা রচনা করেছেন এমন এক সত্তা যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন এবং যিনি সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ও অক্ষমতার উর্ধে।

সুবিচারই ইসলামের লক্ষ্য

দ্বিতীয় কথা যা শুরুতেই উপলব্ধি করা প্রয়োজন তা হলো এই যে, যে ব্যক্তি 'ইসলামে সুবিচার আছে'—এ কথা বলে সে প্রকৃত সত্য কথা বলে না। প্রকৃত সত্য এই যে, সুবিচার করাই ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ইসলাম এসেছেই এজন্যে যে, সুবিচার কায়েম করবে। আল্লাহ বলেন—

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝ (الحديد: ٢٥)

"আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হেদায়েতসহ পাঠিয়েছি এবং সেইসাথে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি যাতে করে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং লোহাও অবতীর্ণ করেছি। এতে বিরাট শক্তি ও বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটা এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যেন আল্লাহ তায়ালা জানতে

পারেন কে না দেখেই তাঁর ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিরাট শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী।" (আল হাদীদ ঃ ২৫)

এ দুটি এমন বিষয় যে তার থেকে যদি মুসলমান গাফেল না হয় তাহলে কখনো সামাজিক সুবিচার তালাশের জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ছেড়ে অন্য কোনো উৎসের প্রতি মনোযোগ দেয়ার ভুল করবে না। যে মুহূর্তেই সে সুবিচারের প্রয়োজন অনুভব করবে সে মুহূর্তেই সে জানতে পারবে যে, ইনসাফ ও সুবিচার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত আর কারো কাছে নেই এবং থাকতে পারে না। সে এটাও জেনে নেবে যে, ইনসাফ কায়েম করার জন্যে এ ছাড়া আর কিছু করার নেই যে, ইসলাম—পরিপূর্ণ ইসলাম, অর্থাৎ শতকরা একশ' ভাগই ইসলাম কায়েম করতে হবে। ইনসাফ ইসলাম থেকে আলাদা কোনো বস্তুর নাম নয়, ইসলাম স্বয়ং ইনসাফ। ইসলাম কায়েম হওয়া এবং ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম হওয়া একই বস্তু।

সামাজিক সুবিচার

এখন আমাদের দেখা উচিত যে, সামাজিক সুবিচার আসলে কোন্ বস্তুটির নাম এবং তা প্রতিষ্ঠার সঠিক পন্থাই বা কি।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

প্রতিটি মানব সমাজ হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি মানুষ নিয়েই গঠিত হয়। এ মানব সমষ্টির প্রতিটি মানুষ আত্মা, বিবেক ও অনুভূতি শক্তির অধিকারী। প্রত্যেকের নিজস্ব এক স্থায়ী ব্যক্তিত্ব রয়েছে যার স্ফুরণ ও বিকাশ সাধনের সুযোগ দরকার। প্রত্যেকের নিজস্ব রুচিবোধ রয়েছে, প্রত্যেকের মনের কামনা বাসনা আছে। তার দেহ ও মনের কিছু প্রয়োজন আছে। এ ব্যক্তিবর্গের মর্যাদা কোনো মেশিনের প্রাণহীন অংশাবলীর মতো নয় যে, আসল বস্তু মেশিন এবং এ অংশগুলো সে মেশিনেরই বাঞ্ছিত বস্তুসমূহ—অংশগুলোর নিজস্ব কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। পক্ষান্তরে, মানব সমাজ জীবন্ত জাগ্রত মানুষেরই এক সমষ্টি। এ ব্যক্তিবর্গ এ সমষ্টির জন্যে নয়, বরঞ্চ সমষ্টি ব্যক্তিবর্গের জন্যে। ব্যক্তিবর্গ একত্র হয়ে এ সমষ্টি বা সমাজ এ উদ্দেশ্যেই গঠন করে যে, একে অপরের সাহায্যে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের এবং দেহ ও মনের দাবি আদায়ের সুযোগ পাবে।

ব্যক্তিগত জবাবদিহি

অতঃপর এ ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে খোদার কাছে জবাবদিহি করবে। এ দুনিয়াতে প্রত্যেককেই একটা নির্দিষ্ট পরীক্ষার সময় অতিক্রম করার পর খোদার সামনে হাজির হয়ে জবাব দিতে হবে যে, যে শক্তি ও যোগ্যতা দুনিয়াতে তাকে দেয়া হয়েছিল তার সুযোগ গ্রহণ করে এবং যেসব উপায় উপকরণ তাকে দেয়া হয়েছিল

তার সুযোগ সদ্ব্যবহার করে সে কোন্ ব্যক্তিত্ব তৈরী করে এনেছে। খোদার সামনে মানুষের এ জবাবদিহি সমষ্টিগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে করতে হবে। সেখানে পরিবার, গোত্র এবং জাতি দাঁড়িয়ে দুনিয়ার কৃতকর্মের হিসাব দেবে না, বরঞ্চ দুনিয়ার সকল সম্পর্ক সম্বন্ধ ছিন্ন করার পর আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি মানুষকে আলাদা আলাদা তার আদালতে হাজির করবেন এবং প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞেস করবেন সে কী করে এসেছে এবং কী হয়ে এসেছে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা

এ দুটি বিষয়—দুনিয়াতে মানবীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং আখেরাতে মানুষের জবাবদিহি—এ কথারই দাবি করে যে, দুনিয়ায় মানুষের স্বাধীনতা থাকতে হবে। যদি কোনো সমাজে ব্যক্তি তার ইচ্ছামত ব্যক্তিত্ব গঠনের সুযোগ না পায়, তাহলে তার মধ্যে মানবতা অসাড় অবশ হয়ে থাকবে। তার শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকবে, তার শক্তি ও যোগ্যতা দমিত হতে থাকবে এবং সে নিজেকে কারারুদ্ধ ও অবরুদ্ধ মনে করবে। এভাবে মানুষ জড়ত্বের শিকার হয়ে যায়। অতপর আখেরাতে এসব অবরুদ্ধ মানুষের দোষত্রুটির দায়িত্ব তাদেরকেই বহন করতে হবে যারা এ ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা গঠন ও পরিচালনার জন্যে দায়ী। তাদের কাছে শুধু তাদের ব্যক্তিগত কর্মকান্ডেরই হিসাব নেয়া হবে না, বরঞ্চ এ বিষয়েরও হিসাব নেয়া হবে যে, তারা একটা স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম করে অন্যান্য অসংখ্য মানুষকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং নিজেদের মর্জি মতো অপদার্থ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে বাধ্য করেছে। এ কথা ঠিক যে আখেরাতের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তি এ ভারী বোঝা বহন করে খোদার কাছে হাজির হওয়ার ধারণাও করতে পারে না। যদি সে খোদাকে ভয়কারী মানুষ হয়, তাহলে সে অবশ্যই মানুষকে যতো বেশী সম্ভব স্বাধীনতা দানের প্রতিই আগ্রহশীল হবে যাতে করে প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছুই হবে আপন দায়িত্বেই হবে, যেন তার ভ্রান্ত ব্যক্তিত্বের জন্যে সামাজিক ব্যবস্থা পরিচালকদের কোনো দায় দায়িত্ব বহন করতে না হয়।

সামাজিক সংস্থা ও তার কর্তৃত্ব

এ হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপার। অন্যদিকে সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন যা পরিবার, গোত্র, জাতি এবং গোটা মানবতার আকারে ক্রমান্বয়ে কায়েম হয়। এর সূচনা হয় একটি পুরুষ ও একটি নারী এবং তাদের সন্তান থেকে, যার থেকে পরিবার গঠিত হয়। এসব পরিবার থেকে গোত্র এবং জ্ঞাতীগোষ্ঠী তৈরী হয়। তার থেকে জাতি অস্তিত্ব লাভ করে। জাতি তার সামাজিক ইচ্ছা অভিলাষ বাস্তবায়নের জন্যে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করে। বিভিন্ন আকারের এসব সামাজিক সামষ্টিক সংস্থাগুলো যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয় তা হলো তাদের সংরক্ষণ ও সাহায্যে ব্যক্তির স্বীয় ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের

সুযোগ করে দেয়া যা তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এ মৌলিক উদ্দেশ্য হাসিল এ ছাড়া হতে পারে না, যতোক্ষণ না এসবের প্রতিটি সংস্থা তার ব্যক্তিবর্গের উপর, বড়ো সংস্থা ছোটো সংস্থার উপর কর্তৃত্বশীল হয়েছে, যাতে করে ব্যক্তিবর্গের এমন স্বাধীনতার প্রতিরোধ করতে পারে যা অপরের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে। সেইসাথে ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে এমন খেদমত নিতে পারে যা সামগ্রিকভাবে সমাজের সকল ব্যক্তির উন্নতি ও কল্যাণের জন্যে বাঞ্ছিত।

এ অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর সামাজিক সুবিচারের প্রশ্ন এসে যায়। একদিকে মানবীয় কল্যাণ দাবি করে যে, সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকতে হবে যাতে করে সে ব্যক্তি যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী স্বীয় ব্যক্তিত্ব গঠন করতে পারে। তেমনি পরিবার, গোত্র, জ্ঞাতীগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন দল ও বৃহত্তর পরিমন্ডলের ভিতর থেকে সে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে যা আপন আপন পরিমন্ডলে কাজকর্মের জন্যে আবশ্যক। কিন্তু অপরদিকে মানবীয় কল্যাণই এ কথার দাবি করে যে, ব্যক্তিবর্গের উপরে পরিবারের, পরিবারবর্গের উপরে গোত্রের ও জ্ঞাতীগোষ্ঠীর এবং সকল জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সংস্থাগুলোর উপরে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকবে যাতে করে কেউ তার সীমালংঘন করে অপরের উপর যুল্‌ম অবিচার করতে না পারে। অতপর এ সমস্যা গোটা মানবতার জন্যেও সৃষ্টি হয় যে, একদিকে প্রত্যেক জাতি ও রাষ্ট্রেরও স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে এবং অপরদিকে কোনো জাতির শক্তিশালী নিয়মনীতিও থাকতে হবে যেন এসব জাতি ও রাষ্ট্র সীমালংঘন করতে না পারে।

এখন সামাজিক সুবিচার যে বস্তুটির নাম তা হলো এই যে, ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র, জ্ঞাতীগোষ্ঠী এবং জাতির মধ্যে প্রত্যেকের সংগত স্বাধীনতা থাকবে এবং সেইসাথে অবিচার অনাচার প্রতিরোধের জন্যে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলোর ব্যক্তি ও একে অপরের উপরে পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি সামাজিক সংস্থাগুলো থেকে সেসব খেদমত হাসিল করবে যা সামাজিক সামষ্টিক কল্যাণের জন্যে প্রয়োজন।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ত্রুটি

এ সত্য ও বাস্তবতাকে যে ব্যক্তি ভালোভাবে উপলব্ধি করবে সে প্রথমেই একথা জেনে নেবে যে, যেভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা, উদারনীতি (LIBERALISM) পুঁজিবাদ এবং ধর্মহীন গণতন্ত্রের সেই ব্যবস্থা সামাজিক সুবিচারের পরিপন্থী ছিল যা ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঠিক তেমনি, বরঞ্চ তার চেয়ে অধিকতর পরিপন্থী সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যা কালমার্কস ও এঞ্জেল্‌সের মতবাদের অনুসরণে গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রথম ব্যবস্থাটির ত্রুটি এই ছিল যে, তা ব্যক্তিকে সীমাতিরিক্ত স্বাধীনতা দিয়ে পরিবার, গোত্র, সমাজ ও জাতির উপর যুল্‌ম নিষ্পেষণ করার পূর্ণ লাইসেন্স দিয়েছিল এবং সামষ্টিক কল্যাণের জন্যে সমাজের কাজ করার শক্তি শিথিল করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় ব্যবস্থাটির ত্রুটি এই যে, রাষ্ট্রকে সীমাহীন ক্ষমতা দান করে ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র ও সমাজের স্বাধীনতা প্রায় একেবারে খতম করে দিয়েছে। তারপর ব্যক্তিবর্গ থেকে সমষ্টির কাজ নেয়ার জন্যে রাষ্ট্রকে এতো বেশী কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব দান করে যে, ব্যক্তি ব্যক্তিসত্তার অধিকারী মানুষের পরিবর্তে একটি মেশিনের প্রাণহীন যন্ত্রাংশের রূপ ধারণ করে। যে একথা বলে যে, এ ব্যবস্থার দ্বারা সামাজিক সুবিচার কায়েম হতে পারে, তার কথা একেবারে সত্যের অপলাপ।

সমাজতন্ত্র সামাজিক নিপীড়নের এক নিকৃষ্ট রূপ

প্রকৃতপক্ষে সামাজিক অন্যায় অবিচারের এ এক অতি নিকৃষ্ট রূপ যার দৃষ্টান্ত কোনো নমরূদ, ফেরাউন ও চেংগিজ খানের শাসনকালেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক বা একাধিক ব্যক্তি বসে একটি সামাজিক দর্শন রচনা করলো। তারপর সরকারের সীমাহীন এখতিয়ারের বদৌলতে এ দর্শনকে অন্যায়ভাবে একটি দেশে বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষের উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দিল। মানুষের ধনসম্পদ কেড়ে নিল। জমিজমা, ক্ষেতখামার হস্তগত করলো। কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করলো। গোটা দেশকে এমন এক জেলখানায় পরিণত করলো যে, সমালোচনা, বিচার প্রার্থনা, অভিযোগ, মামলা দায়ের প্রভৃতি কাজ করা এবং বিচার বিভাগীয় সুবিচারের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। দেশে কোনো দল থাকবে না, কোনো সংগঠন থাকবে না, কোনো প্লাটফরম থাকবে না যেখান থেকে মানুষ তাদের মুখ খুলতে পারে, কোনো প্রেস থাকবে না যার সাহায্যে মানুষ তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে, কোনো বিচারালয় থাকবে না যার দুয়ারে সুবিচারের জন্যে মানুষ ধর্ণা দিতে পারে।

গোয়েন্দা সংস্থার কাজ সেখানে এতো ব্যাপক যে, প্রতিটি মানুষ অন্য একটি মানুষকে ভয় করে যে, কি জানি হয়তো সে একজন গুপ্তচর। এমনকি, আপন গৃহে কথা বলার সময়ও একজন চারদিকে তাকিয়ে দেখে যে, কোনো কান তার কথা শুনার জন্যে এবং কোনো ব্যক্তি সেকথা সরকারের কাছে পৌঁছাবার জন্যে সেখানে আছে কি না। তারপর গণতন্ত্রের প্রবঞ্চনা দিয়ে সেখানে নির্বাচন করা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়, যাতে করে এ দর্শনের সাথে ভিন্নমত পোষণকারী কোনো ব্যক্তি এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে। আর এমন কোনো ব্যক্তি যেন এতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে, যে নিজস্ব কোনো মতবাদ পোষণ করে এবং যে নিজের বিবেক বিক্রি করতে প্রস্তুত নয়। কোনো বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো কি একে সামাজিক সুবিচার বলে আখ্যায়িত করবে?

যদি ধরে নেয়া যায় যে, এ পদ্ধতিতে ধন সম্পদের সমবন্টন হতে পারে, অথচ আজ পর্যন্ত কোনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তা করতে পারেনি, তথাপি সুবিচার কি শুধু অর্থনৈতিক সমতার নাম? আমি একথা জিজ্ঞেস করি না যে, এ ব্যবস্থার একনায়ক এবং

এ ব্যবস্থার অধীনে বসবাসকারী একজন কৃষকের জীবনের মান এক কিনা। আমি শুধু এতোটুকু জানতে চাই যে, তাদের সকলের মধ্যে সত্যিই যদি পুরোপুরি অর্থনৈতিক সাম্য কায়েম হয়েও থাকে, তাহলে এর নাম কি সামাজিক সুবিচার? সুবিচার কি এই যে, ডিক্টেটর ও তার সংগীসাথী যে দর্শন উদ্ভাবন করেছে, পুলিশ, সামরিক বাহিনী এবং গুপ্তচর শক্তির ব্যবহার দ্বারা তা বলপূর্বক গোটা জাতির উপর চাপিয়ে দেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে; এ দর্শনের এবং তা কার্যকর করার কোনো ছোটো খাটো কার্যক্রমের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যক্তির টু শব্দ করার স্বাধীনতা থাকবে না? এ কি সুবিচার যে, ডিকটেটর ও তার মুষ্টিমেয় অনুসারী তাদের দর্শন কার্যকর করার জন্যে সমগ্র দেশের উপায় উপকরণ ব্যবহার এবং সকল প্রকার সংগঠন করার অধিকারী। কিন্তু তাদের থেকে ভিন্নমত পোষণকারী দুই ব্যক্তি মিলেও কোনো সংগঠন করার অধিকারী নয়? এটা কি সুবিচার যে, সকল জমি ও কলকারখানার মালিকদেরকে বেদখল করে সমগ্র দেশে শুধুমাত্র একজন জমিদার ও একজন কারখানার-মালিক থাকবে, যার নাম সরকার? আর সে সরকারের সর্বময় ক্ষমতা থাকবে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে? এসব লোক এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যার কারণে গোটা জাতি একেবারে অসহায় হয়ে পড়বে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাত থেকে অন্য কারো হাতে হস্তান্তরিত হওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে যাবে? মানুষ যদি নিছক পেটের নাম না হয় এবং মানব জীবন যদি শুধু জীবন জীবিকায় সীমিত না হয় তাহলে নিছক অর্থনৈতিক সাম্যকে কি করে সুবিচার বলা যেতে পারে? জীবনের প্রতিটি বিভাগে অত্যাচার নিপীড়ন কায়েম করে এবং মানবতার প্রতিটি দিক দাবিয়ে রেখে, শুধু ধন-দৌলতের বন্টনে যদি মানুষকে সমানও করে দেয়া যায়, এবং স্বয়ং ডিকটেটর ও তার সহচরগণও যদি নিজেদের জীবনের মান অন্যান্য লোকের সমান করে নেয়, তথাপি বিরাট যুলমের মাধ্যমে এ সাম্য কায়েম করাকে সামাজিক সুবিচার বলা যেতে পারে না। বরঞ্চ, যেমন আমি একটু আগে বলেছি, এ হচ্ছে অতীব নিকৃষ্ট সামাজিক যুলম অবিচার, যার সাথে মানব ইতিহাস ইতিপূর্বে পরিচিত হয়নি।

ইসলামের সুবিচার

এখন আমি সংক্ষেপে বলতে চাই—ইসলাম যে সুবিচারের নাম, তা কী। ইসলামে এ বিষয়ের কোনো অবকাশ নেই যে, কোনো ব্যক্তি বা কোনো দল মানব জীবনে সুবিচারের কোনো দর্শন ও তা প্রতিষ্ঠার কোনো পন্থা পদ্ধতি নিজেরা বসে ঠিক করবে এবং তা বলপূর্বক মানুষের উপর চাপিয়ে দেবে, অথচ কেউ যেন তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে না পারে।

এ অধিকার হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ও হযরত উমর ফারুক (রা) কেন, স্বয়ং মুহাম্মদ (সা)-এরও ছিল না। ইসলামে কোনো ডিকটেটরের কোনো স্থান নেই। শুধু এ

মর্যাদা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই রয়েছে যে, মানুষ বিনা দ্বিধায় তাঁর আনুগত্যে নতশির হবে। নবী মুহাম্মদ (সা) স্বয়ং তাঁর আদেশ নতশিরে মেনে চলেছেন এবং মানুষের উপর রসুলের আদেশ পালন এজন্যে ফরয বা অপরিহার্য ছিল যে, রাসূল (সা) খোদার পক্ষ থেকে নির্দেশ দিতেন। মায়াযাল্লাহ্, তিনি স্বকপোলকল্পিত কোনো দর্শন আবিষ্কার করেননি। রাসূল এবং তাঁর খলীফাদের শাসন ব্যবস্থায় শুধু শরীয়তে এলাহীয়া সমালোচনার উর্ধে ছিল। তা ছাড়া প্রত্যেকের সকল অবস্থায় কথা বলার পূর্ণ অধিকার ছিল।

ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমা

ইসলামে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সে সীমারেখা নির্ধারিত করে দিয়েছেন—তার মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা সীমিত থাকা উচিত। তিনি স্বয়ং এটাও নির্ধারিত করে দিয়েছেন যে, একজন মুসলমানের জন্যে কোন্ কোন্ জিনিস নিষিদ্ধ যার থেকে তার দূরে থাকা উচিত এবং কি কি ফরয যা অবশ্যই পালন করতে হবে। অপরের উপরে তার কি অধিকার এবং তার উপরে অপরের কি অধিকার, কোন্ উপায় ও পদ্ধতিতে কোনো সম্পদের মালিকানা তার কাছে হস্তান্তরিত হওয়া বৈধ এবং এমন কি কি উপায় পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে লব্ধ সম্পদের মালিকানা বৈধ নয়, মানুষের মংগলের জন্যে সমষ্টির কি দায়দায়িত্ব এবং সমষ্টির মংগলের জন্যে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও গোটা জাতির উপর কি কি বিধিনিষেধ আরোপিত হতে পারে এবং কি খেদমত অপরিহার্য যা অবশ্যই করতে হবে—এ সবকিছুই কুরআন ও সুন্নাহর এমন এক চিরস্থায়ী সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে যা পুনঃপরীক্ষা করার কেউ নেই এবং যা পরিবর্তন পরিবর্ধন করার অধিকার কারো নেই।

এ সংবিধান অনুযায়ী এক ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাধীনতার উপরে যে বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, তা লংঘন করার যেমন তার কোনো অধিকার নেই, তেমনি যেসব সীমারেখার ভেতর তার যে স্বাধীনতা রয়েছে তা হরণ করার অধিকারও কারো নেই। সম্পদ অর্জনের যে উপায় পদ্ধতি এবং তা ব্যয় করার যে পন্থা হারাম করা হয়েছে তার নিকটবর্তীও সে হতে পারে না। উভয় ব্যাপারেই হারাম পন্থা অবলম্বন করলে ইসলামী আইন তাকে শাস্তির যোগ্য মনে করবে। কিন্তু যেসব পন্থা পদ্ধতি হালাল করা হয়েছে তার দ্বারা অর্জিত সম্পদের মালিকানার উপর তার অধিকার একেবারে সংরক্ষিত এবং এ সম্পদ ব্যয়ের যে পন্থা জায়েয করা হয়েছে তার থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে না।

এমনিভাবে সমষ্টির কল্যাণের জন্যে যেসব দায়িত্ব ব্যক্তিবর্গের উপর আরোপিত করা হয়েছে, তা পালন করার জন্যে তো তারা বাধ্য। কিন্তু তার অধিক কোনো বোঝা তাদের উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না। তবে হ্যা, স্বয়ং ইচ্ছা করে তারা

তা করতে পারে। এ অবস্থা সমষ্টি এবং রাষ্ট্রেরও। ব্যক্তিবর্গের যেসব অধিকার তাদের উপর আরোপ করা হয়েছে, তা পালন করা তাদের জন্যে তেমনই অপরিহার্য যেমন ব্যক্তিবর্গ থেকে নিজেদের অধিকার আদায় করার এখতিয়ার তাদের আছে। এ চিরস্থায়ী ও চিরকালীন সংবিধানকে যদি বাস্তবে কার্যকর করে দেয়া যায় তাহলে এমন পরিপূর্ণ সামাজিক সুবিচার কায়েম হয় যার পর আর কোনোকিছুর প্রয়োজন হয় না। এ সংবিধান যতোদিন বিদ্যমান রয়েছে ততোদিন পর্যন্ত কেউ, যতোই চেষ্টা করুক না কেন, সে মুসলমানদেরকে এ ধোঁকা দিতে পারে না যে, অন্য কোথাও থেকে ধার করে আনা সমাজতন্ত্রই ইসলাম।

ইসলামের এ সংবিধানে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে এমন ভারসাম্য কায়েম করা হয়েছে যে, ব্যক্তিকে না এমন স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, সে সমষ্টির স্বার্থে কোনো আঘাত হানতে পারে, আর না সমষ্টিকে এমন কোনো এখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, তারা ব্যক্তির সে স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারে যা তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভের জন্যে প্রয়োজনীয়।

সম্পদ অর্জনের শর্তাবলী

ইসলাম একজন ব্যক্তির সম্পদ লাভের তিনটি পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এক—উত্তরাধিকার, দুই—উপার্জন, তিন—হেবা বা দান। উত্তরাধিকার তা-ই নির্ভরযোগ্য যা সম্পদের বৈধ মালিকের নিকট থেকে তার উত্তরাধিকারীর নিকটে শরীয়ত মোতাবিক পৌঁছেছে। হেবা বা দান শুধু তা-ই নির্ভরযোগ্য যা সম্পদের বৈধ মালিক শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে দিয়েছে। যদি এ দান কোনো সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তা সেই অবস্থায় বৈধ হবে যদি তা কোনো সঠিক খেদমতের পুরস্কার স্বরূপ অথবা জনগণের কল্যাণে সরকারী মালিকানা থেকে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত পন্থায় দেয়া হয়ে থাকে। উপরন্তু এ ধরনের দান করার অধিকার সেই সরকারের—যা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত এবং যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পূর্ণ অধিকার জাতির থাকবে।

এখন রইলো জীবিকার বিষয়। সেই জীবিকাই বৈধ যা হারাম উপায়ে অর্জিত নয়। চুরি, আত্মসাৎ, মাপে কম-বেশী করা, বলপূর্বক হস্তগত করা। সুদ ঘুষ, ব্যভিচার বৃত্তি, মজুতদারী, জুয়া, প্রতারণামূলক সওদা, মাদকদ্রব্যাদির ব্যবসা বাণিজ্য এবং অশ্লীলতা প্রচারণার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন ইসলামে হারাম। এসব সীমারেখার মধ্যে যে সম্পদ অর্জন করবে সে তার বৈধ মালিক হবে। তা বেশী হোক বা কম হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। এ ধরনের মালিকানার জন্যে কমবেশী করার কোনো সীমারেখা নির্ধারণ করা যেতে পারে না। কম হওয়া এটা বৈধ করে দেয় না যে, অপরের সম্পদ কেড়ে তা বেশী করা যাবে। তার বেশী হওয়াও এ অনুমতি দেয় না যে, বলপূর্বক কেড়ে নিয়ে কম করা হবে। অবশ্যি যে সম্পদ এ বৈধ সীমারেখা লংঘন করে অর্জিত হবে সে সম্পর্কে এ প্রশ্ন

করার মুসলমানদের অধিকার থাকবে যে, এ সম্পদ কিভাবে কোথা থেকে অর্জন করা হয়েছে। এ ধরনের সম্পদ সম্পর্কে আইনানুগ তদন্ত হওয়া উচিত। যদি প্রমাণিত হয় যে, তা অবৈধ উপায়ে অর্জন করা হয়েছে, তাহলে তা বাজেয়াপ্ত করার পূর্ণ অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের থাকবে।

অর্জিত সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ

বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ ব্যয় করারও লাগামহীন স্বাধীনতা মালিককে দেয়া হয়নি। বরঞ্চ তার জন্যে কিছু আইনগত বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যাতে করে তা এমন পন্থায় ব্যয় করা না হয় যা সমাজের জন্যে ক্ষতিকর হয় অথবা স্বয়ং সে ব্যক্তির দীন ও চরিত্রের দিক দিয়ে ক্ষতিকর হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তি তার সম্পদ পাপাচারের জন্যে ব্যয় করতে পারবে না। মদ্যপান ও জুয়ার দ্বার তার জন্যে রুদ্ধ করা হয়েছে। ব্যভিচারের দ্বারও বন্ধ করা হয়েছে। মুক্তস্বাধীন মানুষকে ধরে এনে দাসদাসী বানানো এবং তাদের কেনা-বেচার এমন অধিকারও ইসলাম দেয়না যে, কোনো ধনশালী ব্যক্তি খরিদ করা দাসদাসী দিয়ে তার গৃহ পূর্ণ করবে। ব্যয় বাহুল্য এবং সীমাতিরিক্ত বিলাসিতা করার উপরেও ইসলাম বাধানিষেধ আরোপ করেছে। ইসলাম এ বিষয়েরও অনুমতি দেয় না যে, এক ব্যক্তি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাবে এবং তার প্রতিবেশী ভুখা থাকবে। ইসলাম শুধুমাত্র শরীয়তসম্মত পন্থায় ধনসম্পদ উপভোগ করার অধিকার দেয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদকে অধিকতর সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে ব্যবহার করতে চাইলে উপার্জনের শুধু বৈধ পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। শরীয়ত উপার্জনের যে সীমারেখা নির্ধারিত করে দিয়েছে তা কিছুতেই লংঘন করা যাবে না।

সমাজসেবা

তারপর সমাজসেবার জন্য ইসলাম সেই ব্যক্তির উপর যাকাত অপরিহার্য করেছে, যার কাছে নিসাবের অতিরিক্ত সম্পদ থাকবে। উপরন্তু ব্যবসার মালের উপর, জমির উৎপন্ন ফসলের উপর, গবাদি পশুর উপর এবং অন্যান্য সম্পদের উপরেও এক বিশিষ্ট পরিমাণে যাকাত ফরয করা হয়েছে।

দুনিয়ার যে কোনো দেশে যদি শরীয়তের বিধিবিধান অনুযায়ী রীতিমত যাকাত আদায় করা হয় এবং কুরআনের নির্দিষ্ট খাত অনুযায়ী ব্যয় করা হয়, তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই সেখানে কোনো ব্যক্তি কি অভাবগ্রস্ত থাকতে পারে এবং জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে?

তারপর যে সম্পদ কোনো ব্যক্তির কাছে পুঞ্জিভূত রয়ে যাবে, তার মৃত্যুর সাথে সাথেই ইসলাম সে সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দেবে, যাতে করে এ পুঞ্জিভূত সম্পদ স্থায়ীভাবে পুঞ্জিভূত হয়ে থাকতে না পারে।

যুল্‌ম নির্মূল করা

উপরন্তু ইসলাম চায় যে জমির মালিক ও ক্ষেতমজুরের মধ্যে, কলকারখানার মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে ন্যায়সংগত পন্থায় কায়কারবার স্থিরীকৃত হোক এবং আইনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন না হোক। কিন্তু এ ব্যাপারে কোথাও যদি অন্যায় অবিচার হয় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং সরকার আইনের মাধ্যমে সুবিচারের সীমারেখা নির্ধারণ করে দেবে।

জনস্বার্থে জাতীয়করণের সীমা

ইসলাম সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করাকে অবৈধ মনে করেনা। যদি কোনো ব্যবসা অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠান জনস্বার্থে প্রয়োজন, কিন্তু কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তা চালাতে প্রস্তুত নয়, অথবা ব্যক্তিবর্গ দ্বারা বেসরকারীভাবে পরিচালিত হলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়, তাহলে তা সরকারের পরিচালনাধীনে নেয়া যেতে পারে।

এমনিভাবে যদি শিল্পকারখানা অথবা ব্যবসা কিছু লোকের দ্বারা এমনভাবে পরিচালিত হয় যে, জনস্বার্থের দিক দিয়ে তা ক্ষতিকর, তাহলে সরকার ঐ সব লোককে পারিশ্রমিক দিয়ে ব্যবসাটি নিজের তত্ত্বাবধানে নিতে পারে এবং অন্য কোনো পদ্ধতিতে তা চালাবার ব্যবস্থা নিতে পারে। এমন ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনে শরীয়ত কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না। কিন্তু ইসলাম একটা নীতি হিসেবে এ বিষয় মেনে নিতে প্রস্তুত নয় যে, পণ্য উৎপাদনের সকল উপায় উপকরণ সরকারের মালিকানাধীন হবে এবং সরকারই দেশের একমাত্র শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং জমিজমার মালিক হবে।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয়ের শর্ত

বায়তুলমাল (রাষ্ট্রীয় অর্থসম্পদ) সম্পর্কে ইসলামের অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত এই যে, তা আল্লাহ এবং মুসলমানদের সম্পদ এবং তার উপরে অন্য কোনো ব্যক্তির মালিকানা অধিকার নেই। মুসলমানদের অন্যান্য সমগ্র বিষয়াদির ন্যায় বায়তুলমালের ব্যবস্থাপনা জাতি অথবা তাদের স্বাধীন প্রতিনিধিবর্গের পরামর্শে চলবে। যার নিকট থেকেই কিছু নেয়া হবে এবং যে খাতেই সম্পদ ব্যয় করা হবে তা জায়েয পদ্ধতিতেই হতে হবে। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পূর্ণ অধিকার মুসলমানদের থাকবে।

একটি প্রশ্ন

পরিশেষে আমি প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে এ প্রশ্ন রাখতে চাই যে, সামাজিক সুবিচার যদি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সুবিচারের নাম হয়, তাহলে যে অর্থনৈতিক সুবিচার

ইসলাম কায়েম করে, তা কি আমাদের জন্যে যথেষ্ট নয়? এর পরে আর কি কোনো প্রয়োজন আছে যার জন্যে সকল মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হবে, লোকের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সমগ্র জাতিকে গুটিকয়েক লোকের গোলাম বানিয়ে দেয়া হবে? তাহলে শেষ পর্যন্ত কোন্ বস্তু এ বিষয়ের প্রতিবন্ধক যে, আমরা মুসলমান, আমাদের দেশে ইসলামী সংবিধান অনুযায়ী খাঁটি শরীয়তের শাসন কায়েম করি এবং খোদার শরীয়ত সেখানে পুরোপুরি কায়েম করে দিই। যেদিনই আমরা তা করব, সেদিন শুধু যে সমাজতন্ত্র থেকে প্রেরণা লাভের কোনো প্রয়োজন হবে না তাই নয়, বরঞ্চ সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষও আমাদের জীবন ব্যবস্থা দেখে অনুভব করবে যে, যে আলোকের অভাবে তারা অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, সে আলোক তাদের চোখের সামনেই রয়েছে।

দশম অধ্যায়

শ্রম, বীমা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ

১. শ্রম সমস্যা ও তা সমাধানের পথ[১]

বর্তমানে শিল্প শ্রমিক (Industrial labourers) এবং কৃষক সমাজ যেসব জটিলতা ও সমস্যায় নিমজ্জিত, তার মূলকারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকৃতি। আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকৃতির জন্যে দায়ী হলো সেই অধপতিত সমাজ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার একটি অংশ মাত্র। যতোদিন গোটা জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন না হবে এবং তার ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও কল্যাণমুখী হবে না, ততোদিন শ্রমজীবী মানুষের এসব সমস্যা এবং জটিলতাও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হতে পারে না।

বিকৃতির কারণ

বর্তমানে আমাদের দেশে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তা কেবল ইংরেজ শাসনের স্মারকই নয়, বরঞ্চ ইংরেজ শাসনের পূর্ব থেকেই এ ব্যবস্থায় ঘুণে ধরেছিল। শাহ্ ওলিউল্লাহ দেহলভী (র) এর রচনাবলী থেকে জানা যায়, তখনো লোকেরা অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে চিৎকার করতো, তখনো লোকেরা অর্থনৈতিক শোষণের কবলে নিষ্পেষিত হতো। ইংরেজরা এসে সে সময়কার অন্যায় ও বিকৃতির সাথে আরো অসংখ্য অন্যায় এবং বিকৃতি যোগ করে দিলো, তারা পূর্বের তুলনায় আরো নিকৃষ্টতর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিলো।

ইংরেজ আমলে অন্যায় আর বিকৃতি বৃদ্ধি পাবার একটি কারণ হলো এই যে, তারা ছিলো নিরেট বস্তুবাদী সভ্যতার পতাকাবাহী। দ্বিতীয়ত, সে সময়টা ছিলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উত্থানকাল। পুঁজিদাররা ছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীন; নিয়ন্ত্রণমুক্ত। তৃতীয় কারণটি হলো, ইংরেজরা তো এসেছিল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হাসিলের জন্যে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো এদেশের লোকদের সহায় সম্পদ লুটপাট ও শোষণ করে তাদের নিজ জাতির

---

১. এ অংশটি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের সেই বক্তৃতার অংশ, যা তিনি ১৯৫৭ সালের ১৩ মে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান লেবার ওয়েলফেয়ার কমিটির কনভেনশনে প্রদান করেছিলেন। (সংকলক)

স্বার্থ হাসিল করা। এই তিনটি কারণের সমন্বয়ে তাদের চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থা পরিণত হয় যুল্‌ম শোষণের হাতিয়ারে।

পরবর্তীকালে আমরা তাদের গোলামী থেকে মুক্তি পেয়েছি বটে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, তাদের চলে যাবার পরও তাদের রেখে যাওয়া ব্যবস্থায় কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এর কারণ হলো, এই রাজনৈতিক বিপ্লব তো কোনো প্রকার নৈতিক ও আদর্শিক চিন্তা চেতনাজাত চেষ্টা সংগ্রামের ফলে সাধিত হয়নি। বরঞ্চ এ ছিলো একটি কৃত্রিম বিপ্লব। এ বিপ্লব সাধিত হয় কেবল একটি রাজনৈতিক টানা হেঁচড়ার ফলশ্রুতিতে। স্বাধীনতা লাভের একদিন আগেও কারো কাছে ভবিষ্যতের কোনো পরিকল্পনা ছিলোনা। কোনো একটি জীবন ব্যবস্থার সুস্পষ্ট রূপ কাঠামো বর্তমান ছিলোনা। জাতির সামনে এমন পরিকল্পনা ছিলোনা, যা বাস্তবায়নের জন্যে তারা অগ্রসর হতে পারতো।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশের কোনো একটি অন্যায়, অপরাধ ও বিকৃতি কমেনি। বরং দিনদিন বেড়েই চলেছে। ইংরেজরা পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং বস্তুবাদের বুনিয়াদের উপর যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল, আজো তা-ই হুবহু প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এর পরিবর্তন করা তো দূরের কথা, বরং সেটার গোড়াতেই পানি ঢালা হচ্ছে। সেই ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্যে যেসব আইন তৈরী করা হয়েছিল, দেশ স্বাধীন হবার পর তাতে কিছুমাত্র পরিবর্তন পরিমার্জনের প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করা হয়নি। ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে মজবুত করার জন্যে যেসব আইন কানুন ও নিয়মনীতি তৈরী করেছিল, সেগুলো এখনো সেভাবেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। দেশ চালাবার সেই নীতিই কার্যকর রয়েছে, এমনকি তাদের প্রদত্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই আজও চালু রয়েছে।

আমাদের স্বাধীনতা যদি নৈতিক ও আদর্শিক চেষ্টা সংগ্রামের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে লাভ করা হতো, তাহলে পয়লা দিন থেকেই আমাদের সামনে একটি পরিকল্পনা থাকতো, যা দেশে বাস্তবায়ন করা হতো। এই পরিকল্পনা অনেক আগেই তৈরী করে রাখা হতো এবং স্বাধীনতা লাভের পর একটি দিনও নষ্ট না করে আমরা পরিকল্পিত পথে চলতে শুরু করতাম। কিন্তু তা হয়নি। তাই আজ আমাদের গোলামী যুগের অন্যায়, অনাচার কমার পরিবর্তে বেড়েই চলেছে, বরং ইংরেজ আমলের অন্যায় অনাচারের সাথে এখন আমাদের স্বাধীন দেশে আরো হাজারো অন্যায় অনাচারের সংযোজন করা হয়েছে এবং সেগুলোকে দুধকলা খাইয়ে তরক্কি দেয়া হচ্ছে।

আসল প্রয়োজন

এখন আমাদের আসল প্রয়োজন হলো, সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন। যতোক্ষণ পর্যন্ত একাজ করা না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো অসুবিধা, কোনো অভিযোগ এবং কোনো বিকৃতি পুরোপুরি দূর হওয়া অসম্ভব। যাবতীয় বিকৃতির আসল

দাওয়াই হলো, গোটা জীবন ব্যবস্থাকে তার আদর্শিক ও নৈতিক ভিত্তিমূল সহ পাল্টে দেয়া এবং তাকে অন্য এমন একটি নৈতিক ও আদর্শিক ভিত্তিমূলের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া, যা হবে সামাজিক সুবিচারের (Social justice) গ্যারান্টি। জীবন ব্যবস্থার এরূপ পরিবর্তন হলে সুবিচার এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আর তখন শ্রমজীবী মানুষের যাবতীয় সমস্যা এবং অভিযোগ অনায়াসে দূরীভূত হয়ে যাবে।

আমাদের মতে সত্যিকারভাবে সামাজিক সুবিচারের গ্যারান্টি দিতে পারে এমন জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি কেবল ইসলামই সরবরাহ করতে পারে। আর সেই জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যেই আমরা আমাদের সমস্ত চেষ্টা তৎপরতা নিয়োগ করেছি। আজকাল বহুলোক ইসলামী ইনসাফের বিভিন্ন রকম ধারণা পেশ করছে। তাদের কারো ইসলামী ইনসাফের ব্যাখ্যা এক রকম, আবার অপর কারো মতে আরেক রকম। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, ইসলামী সুবিচারের আসল ধারণা এবং রূপ কাঠামো ইসলামের আসল উৎস কুরআন এবং সুন্নাহতেই বর্তমান রয়েছে। এই সুবিচারের সেই ব্যাখ্যাই কেবল গ্রহণযোগ্য যার স্বপক্ষে কুরআন সুন্নাহয় দলীল প্রমাণ বর্তমান পাওয়া যাবে। আর মুসলিম উম্মাহ্র জনগণই ফায়সালা করবে যে, কোন্ ব্যাখ্যাটি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য আর কোন্টি গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ব্যাখ্যার বিভিন্নতা দেখে পেরেশান হবার কোনো কারণ নেই। কুরআন সুন্নাহর আদর্শিক ভিত্তি ও মূলনীতির উপর যে গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশাল্লাহ তা সুবিচারের গ্যারান্টি দেবে।

সমস্যার সমাধান

কিন্তু যতোদিন জীবন ব্যবস্থার এই আমূল ও সর্বাংগীন পরিবর্তন না হবে, ততোদিন যতোটা সম্ভব সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে, শ্রমজীবী জনগণের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্যে যা কিছু করা সম্ভব, তা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার অবহেলা করা যাবে না। শ্রমজীবী জনগণের সমস্যাকে পুঁজি করে তাদেরকে ইসলাম ছাড়া অন্য মতবাদ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না।

এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে শেষোক্তটি কিছুটা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। পৃথিবীতে বিভিন্ন মানুষের মানসিকতা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন এক ব্যক্তি রোগ যন্ত্রণায় মাটিতে পড়ে ছটফট ও আর্তনাদ করছে। আরেক ব্যক্তি তার এই অবস্থা দেখে ভাবলো, এই লোকটির কাছে যা কিছু আছে, তা লুটে নেয়া, তার রোগ যন্ত্রণার সুযোগে আমার স্বার্থ হাসিল করা এবং তার বিপদকে আমার স্বার্থোদ্ধারের কাজে ব্যবহার করার এইতো মহাসুযোগ। অপর এক ব্যক্তি লোকটির অবস্থা দেখে ভাবলো, যতোক্ষণ তার পূর্ণ চিকিৎসার ব্যবস্থা না হবে, ততোক্ষণ আমাকে তার জন্যে ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা করতে হবে এবং যতোটা সম্ভব তার যন্ত্রণা কমানোর চেষ্টা করতে হবে। শ্রমজীবী শ্রেণীর

ব্যাপারে বর্তমানে এই উভয় ধরনের মানসিকতাই কাজ করছে। শ্রমজীবী মানুষ বর্তমানে কঠিন সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাদেরকে সীমাহীন কষ্ট এবং সমস্যায় নিমজ্জিত করে রেখেছে। একদল মানুষ তাদের এ সমস্যাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। তাদের আসল উদ্দেশ্য এদের সমস্যা ও অভিযোগ দূর করা নয়; বরঞ্চ এদের সমস্যা আরো বৃদ্ধি করা এবং এদেরকে আরো অধিক দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত করা। এদের কোনো সমস্যা দূর করা সম্ভব হলেও তা দূর না করে বরং এদের দুঃখ কষ্ট আরও বৃদ্ধি করে, এবং এদেরকে উচ্ছৃংখলতার দিকে ঠেলে দিয়ে আইন শৃংখলার বিধি বন্ধন চূরমার করে দিয়ে এদেরকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করাই তাদের উদ্দেশ্য।

সমাজতন্ত্রীরা যে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে শ্রমিকদের স্বর্গ বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তা হলো শ্রমিকদের জাহান্নাম। একথা সূর্যালোকের মতো সত্য যে, শ্রমিকদের আসল দুর্ভাগ্য শুরু হবে সেদিন থেকে, যেদিন খোদা না করুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্রমিকরা আজো অবর্ণনীয় দুরবস্থায় আছেন একথা ঠিক, কিন্তু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তারা যে অবস্থায় নিমজ্জিত হবেন, তা কল্পনা করতেও শরীর শিউরে উঠে। আজ তো আপনারা আপনাদের দাবি দাওয়া পেশ করতে পারছেন। দাবি মানা না হলে ধর্মঘট করতে পারছেন। সভা সমাবেশ এবং মিছিল মিটিং করতে পারছেন। সকলের কানে আপনাদের আওয়াজ পৌছে দিতে পারছেন। প্রয়োজনে এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় কর্মসংস্থানের চেষ্টা করতে পারছেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক স্বর্গরাজ্যে এসব কিছুর দরজাই সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। কারণ সে রাজ্যে সকল কলকারখানা, জমি, সংবাদ মাধ্যম, সংবাদপত্র, যাবতীয় জীবন সামগ্রী এবং মত প্রকাশের সমগ্র উপকরণ থাকবে কেবল সেই শক্তির হাতে যার করায়ত্তে থাকবে পুলিশ, সিআইডি, সেনাবাহিনী, আইন আদালত এবং কারাগার। সে রাজ্যে শ্রমিকরা যতো কষ্ট আর যাতনাই ভোগ করুক না কেন, টু শব্দটিও করতে পারবেনা। সভা সমাবেশ, মিছিল, ধর্মঘট ইত্যাদির তো প্রশ্নই উঠেনা।

তাদের এই সমাজতান্ত্রিক স্বর্গরাজ্যে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে একাধিক দুয়ার খোলা থাকবে না। সারাদেশে জমিদার একজনই হবে। সকল চাষীকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তারই জমিতে চাষবাস করতে হবে। সারাদেশে কলকারখানার মালিক একজনই হবে। তার ওখানে শ্রম দেয়া ছাড়া শ্রমিকদের জন্যে শ্রম দেয়ার দ্বিতীয় কোনো জায়গা থাকবেনা। পারিশ্রমিক সে যা দেবে শ্রমিককে তা-ই গ্রহণ করতে হবে, তাতে তার সংসার চলুক বা না চলুক তাতে মালিকের কিছু যাবে আসবেনা। সেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যেই সমাজতন্ত্রীরা শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। এ উদ্দেশ্যেই তারা গরীব শ্রেণীর মানুষের সমস্যাকে পুঁজি হিসেবে লুফে নেয়, যাতে তাদের সমস্যার কোনো সমাধান না হয়। এভাবে তারা এদের উস্কিয়ে এবং উত্তেজিত

করে পরিবেশ পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানোর জন্যে এদেরকে ব্যবহার করতে চায়।

তারা কৃষক শ্রমিকদের এই বলে প্রতারিত করে যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে জমিদার এবং পুঁজিদারদের হাত থেকে সমস্ত জমি এবং কারখানা ছিনিয়ে এনে শ্রমিকদের মালিকানায় অর্পণ করা হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনা হবে এর উল্টো। জমি এবং কারখানা ছিনিয়ে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করা হবে। রাষ্ট্রই হবে সমস্ত জমি ও কারখানার মালিক। কৃষক শ্রমিকদের বাধ্য হয়ে রাষ্ট্রের অনুগত কৃষক এবং শ্রমিকে পরিণত হয়ে থাকতে হবে। সমাজতন্ত্রীরা সারাবিশ্বে শ্রমিকদের জন্যে ধর্মঘটের অধিকার দাবি করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু বিশ্বের যেখানেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে সর্বপ্রথম শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার হরণ করে নেয়া হয়েছে। তারা শ্রমিকদের বলে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিকদের এমন কোনো অভিযোগ আপত্তিই থাকবেনা, যার ফলে ধর্মঘট করার প্রয়োজন পড়বে। অথচ এটি একটি সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। যেখানে কোটি কোটি মানুষ গুটিকয়েক শাসক ব্যক্তির অধীনে কাজ করবে, সেখানে কর্মচারীদের কখনো অভিযোগ সৃষ্টি হবে না, তা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। প্রশ্ন হলো, তাদের মধ্যে যদি কোনো অভিযোগ সৃষ্টি হয় তাহলে তা পেশ করার জন্য তারা কি কোনো সংস্থা সমিতি গঠন করতে পারবে? তারা কি কোনো স্বাধীন সংগঠন তৈরী করতে পারবে যার মঞ্চে দাঁড়িয়ে তারা নিজেদের দাবি উত্থাপন করতে পারবে? তারা কি কোনো স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম পাবে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের দুঃখ কষ্টের কথা প্রকাশ করতে পারবে? অভিযোগ উচ্চারণের সংগে সংগেই তো তারা কারা-প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য হবে।

এসব কারণে আমরা মনে করি কৃষক এবং শ্রমিকদের সাথে পুঁজিপতি, জমিদার এবং কারখানা মালিকরা আজ যে যুল্‌ম করছে, তার চেয়েও কঠিনতর যুল্‌ম করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সমাজতন্ত্রীরা—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে।

সংস্কারের মূলনীতি

পক্ষান্তরে আমরা চাই, সামাজিক সুবিচারপূর্ণ ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে; আর তার পূর্বে যতোটা সম্ভব শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করতে। আমরা কোনো প্রকার রাজনৈতিক এজিটেশনের জন্যে তাদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবো না আর অপর কাউকেও ব্যবহার করতে দেবোনা।

আমরা শ্রেণীসংঘাত সমর্থন করিনা। আমরা বরং শ্রেণীচেতনা এবং শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠত্ব মিটিয়ে দিতে চাই। কোনো সমাজে মূলত ভ্রান্ত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কারণেই বিভিন্ন শ্রেণী সৃষ্টি হয়। নৈতিক অধঃপতন তাদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা জাগ্রত করে তোলে। আর যুল্‌ম শোষণ অন্যায় অবিচার তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে শ্রেণীসংঘাত।

আমরা সমাজকে এক দেহের বিভিন্ন অংগের মতো মনে করি। একটি দেহের বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগ থাকে এবং প্রতিটি অংগেরই অবস্থান এবং কর্মক্রিয়া পৃথক পৃথক হয়ে থাকে; কিন্তু পায়ের সাথে হাতের, হৃদপিন্ডের সাথে মস্তকের কোনো সংঘাত হয় না। বরং মানব দেহ এভাবেই জীবিত থাকে যে, তার প্রতিটি অংগ নিজ নিজ অবস্থানে থেকে স্বীয় কর্ম ও দায়িত্ব সম্পাদনের মাধ্যমে অপরাপর অংগের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে। আমরা চাই ঠিক অনুরূপভাবেই মানব সমাজের প্রতিটি অংগ (সদস্য) নিজ নিজ অবস্থানে থেকে স্বীয় যোগ্যতা, দক্ষতা ও জন্মগত শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী কার্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অপরাপর অংগের সাথী, বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করবে এবং তাদের মাঝে শ্রেণীসংঘাত তো দূরের কথা শ্রেণীচেতনা পর্যন্ত জাগ্রত হবে না।

আমরা চাই, শ্রমদাতা এবং শ্রমগ্রহীতা প্রত্যেকে নিজের অধিকারের আগে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত ও সচেতন হবে এবং তা যথার্থভাবে সম্পাদনের চিন্তা করবে। মানুষের মধ্যে যতো বেশী দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি পাবে, ততোই সংঘাত দূর হতে থাকবে এবং সমস্যার জন্ম হবে খুবই কম।

আমরা মানুষের মধ্যে নীতিবোধ এবং নৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে চাই। আমরা 'নৈতিক মানুষ'-কে সেই 'যালিম পশুর' থাবা থেকে মুক্ত করতে চাই, যে মানুষের উপর চেপে বসে আছে। মানুষের ভেতরের এই নৈতিক মানুষ যদি তার উপর জেঁকে বসা পশুত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সঠিকভাবে কাজ করতে আরম্ভ করে, তবে অন্যায় আর বিকৃতির উৎসই শুকিয়ে যাবে।

আমাদের মতে সংস্কারপন্থীদেরকে একই সাথে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের কাজও করে যেতে হবে আর সেইসাথে শ্রমগ্রহীতা এবং শ্রমদাতা উভয়কেই সঠিক পথ দেখাতে হবে।

শ্রমগ্রহীতাদের বলতে চাই, আপনারা যদি নিজেদের কল্যাণ চান এবং নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করতে না চান, তবে অধিক অধিক অর্থোপার্জনের ধান্দায় অন্ধ হয়ে যাবেন না। হারাম খাবেন না। অবৈধ পথে অর্থোপার্জন ত্যাগ করুন। অবৈধ পথে মুনাফা করা পরিত্যাগ করুন। আপনারা যাদের শ্রম গ্রহণ করছেন, তাদের বৈধ অধিকার উপলব্ধি করুন এবং তা যথাযথভাবে প্রদান করুন। দেশের উন্নতির যাবতীয় সুবিধা কেবল নিজেরাই কব্জা করে নেবেন না। বরঞ্চ তা জাতির সাধারণ মানুষের হাতেও পৌছুতে দিন, যাদের সামষ্টিক চেষ্টা সাধনা এবং সামষ্টিক উপায় উপকরণের সাহায্যে এ উন্নতি সাধিত হচ্ছে তাদেরকে ন্যায্য অংশ দান করুন। কেবল পুঁজি দিয়েই সম্পদ অর্জিত হয় না বরঞ্চ সেইসাথে যোগ্য ব্যবস্থাপনা, দক্ষ কর্মী ও কারিগর এবং কায়িক শ্রম অপরিহার্য। এসবগুলোর সমন্বয়েই মুনাফা অর্জিত হয়। আর

সেই মুনাফারই অপর নাম হলো অর্থসম্পদ। এই অর্থসম্পদ অর্জনের ব্যাপারে রাষ্ট্র নামক গোটা সমাজ ব্যবস্থাই সাহায্যকারী হয়ে থাকে। এসব মুনাফা যদি সুবিচারের সাথে সকল উৎপাদক মন্ডলীর মাঝে বন্টন করা হয় এবং ইসলাম নিষিদ্ধ যাবতীয় পন্থা পদ্ধতি যদি পরিহার করা হয়, তবে এসব ধ্বংসাত্মক আন্দোলন সৃষ্টি হবার কোনো অবকাশই সৃষ্টি হবে না, যা শেষ পর্যন্ত অপনাদেরই ধ্বংসের কারণ হয়।

শ্রমজীবীদের বলতে চাই, সুবিচারের দৃষ্টিতে আপনাদের বৈধ অধিকার কি তা আপনারা বুঝতে চেষ্টা করুন। সেই সম্পদের উপর বিনিয়োগকারীদের, ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্যিক দক্ষতা বিনিয়োগকারীদের এবং কারিগরি দক্ষতা প্রয়োগকারীদের বৈধ অংশ কতটুকু, যা তাদের ও আপনাদের শ্রমের সংমিশ্রণের ফলে অর্জিত হয়, সেটা বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনারা আপনাদের অধিকারের জন্যে যে আন্দোলনই করুন না কেন, তা যেনো অবশ্যি ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আপনারা কখনো নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে এমন অবাস্তব ও অতিশয় চিন্তা করবেন না, যা শ্রেণীসংগ্রামের প্রবক্তারা, আপনাদেরকে তাদের সংঘাতের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে, আপনাদের সামনে পেশ করছে। নিজেদের বৈধ অধিকারের জন্যে আপনারা যে চেষ্টা সংগ্রামই করুন না কেন, তা যেনো অবশ্যি বৈধ উপায়ে এবং বৈধ পন্থায় পরিচালিত হয়। আপনারা যদি তাই করেন, তাহলে প্রত্যেক সত্যপন্থী ব্যক্তির কর্তব্য হবে আপনাদের সহযোগিতা করা।

দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমরা যেসব সংস্কার কাজ করতে চাই এখন আমি সেগুলো পেশ করছি।

১। সুদ, প্রতিজ্ঞাপত্র, জুয়া ইত্যাদি হারাম ঘোষিত পন্থা পদ্ধতিকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। মানুষের জন্যে কেবল বৈধ উপার্জনের দুয়ারই খোলা রাখতে হবে। তাছাড়া অবৈধ পথে অর্থ ব্যয় করার পথও বন্ধ করে দিতে হবে। কেবল এভাবেই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার শিকড় কেটে দেয়া সম্ভব। আর সেই স্বাধীন ব্যবস্থাও কেবল এভাবেই টিকে থাকতে পারে যা গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য।

২। এযাবত অবৈধ ও হারাম পথে এবং ভ্রান্ত ব্যবস্থার কারণে সম্পদের যে অবিচারমূলক সঞ্চয় গড়ে উঠেছে তা অপনোদন করার জন্যে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সেইসব লোকদের কঠোর মুহাসাবা করতে হবে, যাদের কাছে অস্বাভাবিক অর্থসম্পদ পুঞ্জিভূত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং সেইসাথে হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ তাদের থেকে ফেরতও নিতে হবে।

৩। দীর্ঘকাল কৃষি জমির মালিকানার ব্যাপারে ভ্রান্ত ব্যবস্থা চালু থাকার কারণে যেসব অসম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো দূরীভূত করবার জন্যে ইসলামী শরীয়ার ঃ "অস্বাভাবিক অবস্থায় সংস্কারের এমন অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে যা

ইসলামী নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না"—এ নীতির ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। এই নিয়মের ভিত্তিতে ঃ

ক. এমন সকল নতুন পুরাতন জমিদারী সম্পূর্ণরূপ খতম করে দিতে হবে, যা কোনো শাসনামলে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছিল। কেননা শরয়ী দিক থেকে সেগুলোর মালিকানাই বিশুদ্ধ নয়।

খ. পুরাতন মালিকানার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত (যেমন একশ' কিংবা দুইশ' একর) মালিকানা সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। এর অধিক মালিকানা সুবিচারমূলক দামে ক্রয় করে নিতে হবে। এই সীমা নির্ধারণের কাজ কেবল সাময়িকভাবে পুরাতন অসমতা দূর করার জন্যে করা যেতে পারে; একে কোনো স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়া যাবেনা। কেননা স্বতন্ত্র সীমা নির্ধারণ ইসলামের উত্তরাধিকার আইন এবং অন্যান্য শরয়ী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।

গ. সরকারী মালিকানাধীন হোক, কিংবা উপরোল্লেখিত উভয় পন্থায় অর্জিত হোক অথবা নতুন বিরাজের মাধ্যমে চাষাবাদের উপযোগী হোক—সমস্ত জমি ভূমিহীন চাষী কিংবা স্বল্প জমির মালিকদের কাছে সহজ কিস্তিতে বিক্রয় করে দেয়ার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকার-ঘেঁষা লোক কিংবা সরকারী কর্মকর্তার কাছে জমি সস্তায় বিক্রয় করে দেয়া কিংবা দান করে দেয়ার রীতি বন্ধ করে দিতে হবে, আর যাদেরকে এভাবে জমি প্রদান করা হয়েছে, তাদের কাছ থেকে সে জমি ফেরত নিতে হবে। এছাড়া নিলামে বিক্রির পদ্ধতিও পরিত্যাগ করতে হবে।

ঘ. চাষাবাদের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে ইসলামী আইন প্রয়োগ ও অনুসরণ করতে হবে। অনৈসলামী সকল পন্থা প্রক্রিয়া আইনগতভাবে বন্ধ করে দিতে হবে। এগুলো এজন্যে করতে হবে। যেনো কোনো জমিদারী যুলুমে পরিণত হতে না পারে।

৪। পারিশ্রমিকের বেলায় বর্তমানে তাদের বেতন ক্ষেত্রে এক এবং একশতের তফাত বিরাজ করছে, এ ব্যবধান অবিলম্বে এক এবং বিশের মধ্যে নামিয়ে আনতে হবে। অতপর পর্যায়ক্রমে তা এক এবং দশের মধ্যে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক এমন পর্যায়ে নির্ধারণ করতে হবে, যা সমকালীন মূল্যমানের হিসেবে একটি পরিবারের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে অপরিহার্য।

৫। স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারীদেরকে বাসা, চিকিৎসা এবং সন্তান সন্ততির শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৬। সব ধরনের শিল্প কারখানায় শ্রমিকদেরকে নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন প্রদান ছাড়াও নগদ বোনাস দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া, বোনাস শেয়ারের মাধ্যমে

তাদেরকে শিল্প কারখানায় অংশীদার বানিয়ে নিতে হবে। যাতে সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নয়নের ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিগত আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের শ্রম যুক্ত হয়ে যে মুনাফা অর্জিত হবে তাতে তারা অংশীদার হয়।

৭। বর্তমান শ্রম আইন পরির্তন করে এমন একটি সুবিচারপূর্ণ আইন প্রণয়ন করতে হবে, যা পুঁজি এবং শ্রমের সংঘাতকে সহযোগিতায় পরিণত করে দেবে; শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে তাদের বৈধ অধিকার ফিরিয়ে দেবে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার ইনসাফপূর্ণ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করবে।

৮। রাষ্ট্রীয় আইন এবং ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক নীতিমালা (Policy) এমনভাবে সংস্কার ও সংশোধন করতে হবে, যাতে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির একচ্ছত্র দখলদারী খতম হয়ে যায় এবং সমাজের সাধারণ মানুষ অধিক থেকে অধিকতর হারে শিল্পের মালিকানা ও মুনাফায় অংশীদার হতে পারে।

তাছাড়া, আইন এবং নীতিমালার সেইসব ক্রটিও দূর করতে হবে, যেগুলোর কারণে লোকেরা অবৈধ মুনাফা করার সুযোগ পায় এবং কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে আল্লাহর সৃষ্টজীবের জন্যে জীবন যাপন কঠিন করে তোলে এবং জনগণকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে।

৯। যেসব শিল্প কারখানা মৌলিক এবং ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত হলে সমাজ ও সমষ্টির জন্যে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হবে সেগুলোকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় চালাতে হবে। তবে কোন্ কোন্ শিল্প কারখানা জাতীয় মালিকানায় পরিচালিত হবে, তা ফায়সালা করার দায়িত্ব জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদের (জাতীয় সংসদের) হাতে ন্যস্ত থাকবে। এ ধরনের ফায়সালা করার সময় জাতীয় সংসদকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, এসব শিল্প কারখানা জাতীয় মালিকানায় আনার পর যেনো বুরোক্রেসীর সেই অতিপরিচিত দুশ্চরিত্রতা ও ধ্বংসের শিকার না হয়। কারণ সে অবস্থায় কোনো শিল্প কারখানা জাতীয় মালিকানায় পরিচালনা করাটা লাভজনক হবার পরিবর্তে নির্ঘাত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

১০। বর্তমানে যে ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তা আসলে ইহুদী পুঁজিপতিদের দেমাগপ্রসূত। আমাদের দেশেও সে ব্যবস্থারই অনুকরণ করা হচ্ছে। এই ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেংগে দিয়ে ইসলামের মুশারাফা, মুদারাবা ও পারস্পরিক সহযোগিতা নীতির ভিত্তিতে এর পুনর্নির্মাণ করতে হবে। এই মৌলিক সংস্কার ছাড়া এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের বিপর্যয় কিছুতেই ঠেকানো যাবে না। এমনকি, এগুলোকে পুরোপুরি জাতীয় মালিকানায় নিলেও নয়।

১১। আজ পর্যন্ত কোনো জীবন ব্যবস্থাই যাকাতের তুলনায় উত্তম সামাজিক নিরাপত্তার কোনো স্কীম প্রদান করতে পারেনি। যাকাত আদায় ও বন্টনের ব্যবস্থা করার

মাধ্যমে জননিরাপত্তার এই ইসলামী স্কীমকে কার্যকর করতে হবে। এটা জননিরাপত্তার এমন এক নিশ্চিত ব্যবস্থা, যা কার্যকর করা হলে দেশে কোনো ব্যক্তি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না।

সর্বোপরি এ কথাটি খুব ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, কেবল অর্থনীতিই মানব জীবনের আসল এবং একমাত্র সমস্যা নয়; বরং অর্থনীতি মানব জীবনের অন্যান্য বিষয়ের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। যতোদিন ইসলামের নির্দেশনা ও বিধানের আলোকে নৈতিক চরিত্র, পারস্পরিক সম্পর্ক, শিক্ষা দীক্ষা, রাষ্ট্র-রাজনীতি, আইনকানুন ও নিয়ম নীতির সকল বিভাগে পূর্ণাংগ সংস্কার সাধিত না হবে, ততোদিন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সংস্কারের কোনো কর্মসূচীই সফল ও সুফলদায়ক হতে পারে না।

২. বীমা

প্রশ্ন : বীমার ব্যাপারে আমি সংশয়ে ভুগছি। বীমা করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ না অবৈধ তা আমি বুঝতে পারছি না। বর্তমান বীমা ব্যবসা নাজায়েয হয়ে থাকলে তাকে জায়েয বানাবার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে? বর্তমান অবস্থায় বীমা পরিহার করলে দেশের লোকেরা অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। এ ব্যবসাটি সারা দুনিয়াতে চলছে। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতি ব্যাপকভাবে ইনস্যুরেন্স সংগঠন করেছে। তারা এ থেকে লাভবান হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো এ ব্যাপারে দ্বিধা ও দোটানার ভাব রয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আপনি সঠিক পথের সন্ধান দিলে কৃতজ্ঞ হবো।

জবাব : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ইনস্যুরেন্সের ব্যাপারে তিনটি মৌলিক প্রশ্ন রয়ে গেছে, যার ভিত্তিতে তাকে বৈধ গণ্য করা যেতে পারে না।

এক. ইনস্যুরেন্স কোম্পানীগুলো প্রিমিয়াম হিসেবে যে অর্থ আদায় করে থাকে তার বিরাট অংশ তারা সুদের ব্যবসায়ে খাটিয়ে লাভ করে। যেসব লোক যে কোনো আকারেই হোক নিজেদেরকে বা নিজেদের কোনো জিনিসকে তাদের কাছে ইনসিয়োর কারায় তারা আপনাআপনিই ঐসব ব্যবসায়ে অংশীদার হয়ে যায়।

দুই. মৃত্যু, দুর্ঘটনা বা ক্ষতির বিনিময়ে এ কোম্পানীগুলো যে অর্থ পরিশোধের দায়িত্ব নেয় তার মধ্যে নীতিগতভাবে জুয়ার অস্তিত্ব বিদ্যমান।

তিন. এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর যে অর্থ প্রদান করা হয় ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে তা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পরিণত হয়, যা আসলে শরীয়ত নির্দেশিত ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন হওয়া উচিত। কিন্তু এ অর্থ মীরাস হিসেবে বন্টন করা হয় না; বরং সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এ অর্থ লাভ করে ইনসিয়োরকারী যাদেরকে এ অর্থ দান করার জন্য অসিয়ত করে যায়। অথচ ওয়ারিশের নামে অসীয়াত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়।

তবে ইনস্যুরেন্সের ব্যবসাকে কিভাবে ইসলামী নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করা যেতে পারে, এ প্রশ্নটা যতটা সহজ এর জবাব ততটা সহজ নয়। এ জন্য প্রয়োজন একটি বিশেষজ্ঞ দলের। এ দলটি যেমন একদিকে ইসলামের নীতি সম্পর্কে অবগত থাকবেন তেমনি অন্যদিকে এর থাকবে ইনস্যুরেন্স ব্যবসায়ের জ্ঞান। এ বিশেষজ্ঞ দলটি সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করে ইনস্যুরেন্স ব্যবসায়টিতে এমন সব সংস্কার সাধনের পরিকল্পনা পেশ করবেন যার ফলে এ ব্যবসাটি সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারবে

এবং সংগে সংগে শরীয়তের নীতিও লংঘিত হবে না। যতোদিন এটা হচ্ছে না ততদিন আমাদের অন্ততঃ একথা স্বীকার করা উচিত যে, আমরা একটা ভুল কাজ করে যাচ্ছি। ভুলের অনুভূতিটুকুও যদি আমাদের মধ্যে না থাকে তাহলে সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টার প্রশ্নই আসে না।

নিঃসন্দেহে বর্তমান যুগে ইনস্যুরেন্স অত্যধিক গুরুত্ববহ। সারা দুনিয়ায় এর প্রচলন। কিন্তু এ প্রযুক্তিটি কোনো হারামকে হালাল করে দিতে পারে না। অথবা কোনো ব্যক্তি দাবি করতে পারে না, দুনিয়ায় যা কিছু চলছে তা সব হালাল বা তার হালাল হওয়া উচিত। কারণ তা সারা দুনিয়ায় প্রচলিত। মুসলমান হিসেবে আমাদের অবশ্যি জায়েয নাজায়েযের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে এবং নিজেদের বিষয়গুলো জায়েয পদ্ধতিতে পরিচালনা করার উপর জোর দিতে হবে। (তরজমানুল কুরআন, জুলাই ১৯৬২)

প্রশ্ন ঃ বীমা সম্পর্কে আপনার এ ধারণা সঠিক যে, এতে মৌলিক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। তবে আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, এ জন্য অত্যন্ত দীর্ঘ ও অবিশ্রান্ত চেষ্টা সাধনা আবশ্যক। আমার বীমা কোম্পানীতে আমি এযাবত জীবন বীমা এড়িয়ে চলেছি। তবে ভেবেচিন্তে এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, জীবনবীমার দোষত্রুটিগুলো নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করে দূর করা সম্ভব।

১. জামানতের অর্থ সরকারের কাছে জমা দেয়ার সময় এরূপ নির্দেশ দেয়া যেতে পারে যে, এই অর্থকে সুদভিত্তিক কারবারে না লাগিয়ে কোনো সরকারী বা বেসরকারী কারখানার শেয়ার ক্রয় করা হোক। চেষ্টা করা হলে আশা করা যায়, সরকার এ অনুরোধ মেনে নেবেন। এভাবে সুদভিত্তিক কাজে শরীক হওয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব।

২. নিয়ম অনুযায়ী বীমা কোম্পানীর এখতিয়ার থাকে যে, ইচ্ছা করলে যে কোনো ব্যক্তির বীমা বাতিল করতে পারে কিংবা প্রথমেই অগ্রাহ্য করতে পারে। আমরা বিধিমালায় এরূপ ব্যবস্থা রাখতে পারি যে, যে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলে স্বীয় টাকা শরীয়ত মোতাবিক উত্তারাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করার নির্দেশ দিতে পারে। এরূপ শর্ত আরোপ করেও ইসলামী বিধি কঠোরভাবে পালন করা যেতে পারে যে, যারা শরীয়তবিধি মোতাবিক বন্টনে সম্মত হবেনা, তাদের পলিসি গ্রহণ করা হবে না। এতে করে আমাদের কাংখিত শরীয়তবিধি মান্যকারীরাই শুধু আমাদের কাছে বীমা করাতে পারবে।

৩. জুয়ার সংমিশ্রণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বীমাকারীদেরকে এরূপ নির্দেশ দিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে, তাদের মৃত্যু ঘটলে শুধুমাত্র প্রিমিয়ামের মাধ্যমে যত টাকা জমা দেয়া হয়েছে, তত টাকাই উত্তারাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হোক।

দৃশ্যত যদিও বর্তমান অবস্থায় এই কারবারে অন্যায়ের দিকটা খুবই প্রবল, তবে এটাকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার অবকাশও রয়েছে।

কিছুদিন আগে একবার এ কারবারের কুৎসিত দিকগুলোর প্রচন্ডতা অনুভব করে আমি নিজের বীমা কোম্পানী বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরে ভাবলাম এমন একটা পন্থা উদ্ভাবন করা যাক, যাতে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে পারে এবং ইসলামী বিধির আওতায় ইনস্যুরেন্সের কারবার চালানো যেতে পারে। একটু কষ্ট করে আমাকে পথ প্রদর্শন করুন।

জবাব : বীমা ব্যবসাকে বিশুদ্ধকরণের যে পন্থা আপনি লিখেছেন তা দ্বারা তার অবৈধতার কারণগুলো দূর হবে বলে আমি আশা করি। আমার মতে এটিকে বৈধতার গন্ডীতে আনার জন্য কমপক্ষে যে কাজগুলো করা দরকার তা নিম্নরূপ :

১. সরকারকে এ ব্যাপারে সম্মত করাতে হবে যে, কোম্পানীর কাছে সঞ্চিত জামানতের অর্থকে সে কোনো সরকারী অথবা আধা সরকারী শিল্প কিংবা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করবে এবং কোম্পানীকে নির্দিষ্ট হারে নয় বরং আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ দেবে।

২. কোম্পানী তার অন্যান্য পুঁজিকেও এরূপ লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করবে, যা থেকে সে সুদের বদলে লভ্যাংশ পাবে। কোনো সুদভিত্তিক কারবারে তার পুঁজির কোনো অংশই বিনিয়োগ করবেনা।

৩. বীমাকারীর মৃত্যুর পর তার জমাকৃত সমস্ত টাকা উত্তরাধিকারীদেরকে দেয়া হবে এবং শরীয়তের বিধি অনুযায়ী ঐ টাকা কেবল উত্তরাধিকারীর মধ্যে বন্টন করা হবে, এই দু'টো কথা যারা মেনে নেবে, কেবল তাদেরই জীবনবীমা গ্রহণ করা হবে।

৪. বীমাকারীদের মধ্যে যারা স্বীয় টাকার বাবদে লাভ চাইবে, তাদের টাকা তাদের অনুমতিক্রমে উপরের ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বাণিজ্যিক কাজে অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে।

এই চারটে সংস্কার কার্যক্রম যদি আপনি বাস্তবায়িত করতে পারেন, তাহলে আপনার কোম্পানীর কারবার তো পবিত্র হবেই, সেইসাথে যারা বীমা ব্যবসায় সংশোধন কামনা করেন, তারাও অত্যন্ত সার্থক পথনির্দেশ লাভ করবেন।

(তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬)

৩. মূল্য নিয়ন্ত্রণ[১]

প্রশ্ন ঃ এটা হচ্ছে কন্ট্রোল রেটের যুগ। কিন্তু দোকানদাররা কন্ট্রোল রেটে কোনো মাল পায় না। তারা কালোবাজারীতে (Black Market) মাল খরিদ করে গ্রাহকদের সরবরাহ করে। এ ধরনের মাল কন্ট্রোল রেটে বিক্রী করলে তার যে লোকসান হবে, তা একেবারে জানা কথা। তাই বাধ্য হয়ে তারা দর বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু কেউ কেউ এরূপ কেনা-বেচাকে বেঈমানী বলে আখ্যায়িত করেন এবং পুলিশও তাদের উপর চড়াও হয়। এ বিষয়ে শরীয়তের হুকুম কি?

জবাব ঃ নৈতিক দিক থেকে সরকার ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো মালের মূল্য নিয়ন্ত্রণের (Price control) অধিকার রাখেনা যতোক্ষণ না সে নিজের নির্ধারিত মূল্যে লোকদের মাল দেয়ার ব্যবস্থা করবে। মাল সাপ্লাই না করে কেবল মূল্য নির্ধারণ করার ফল এরূপ দাঁড়াতে বাধ্য যে, এতে মজুতদাররা মাল লুকিয়ে রেখে বিক্রী বন্ধ করে দেবে কিংবা আইনকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে বেশী দামে বিক্রী করবে। কেবল পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমেই নয়, বরঞ্চ অভিজ্ঞতার আলোকে এ পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া সত্ত্বেও সরকার যদি শুধুমাত্র মূল্য নির্ধারণের পন্থা অবলম্বন করে তবে ক্রেতা সাধারণ এবং ব্যবসায়ীদেরকে নির্ধারিত মূল্যের অনুসরণ করতে বাধ্য করার কোনো অধিকার নৈতিকভাবে সরকারের নেই।

এরূপ পরিস্থিতিতে এটাই দেখা যায় যে, ক্রেতা সাধারণ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি মজুতদার ও মহাজনদের নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে কোনো জিনিস ক্রয় করতে চায় তবে তাদেরকে বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হয়। তাদেরকে যদি কালোবাজারীতেই মাল ক্রয় করতে হয়, তবে খোলাবাজারে সরকার নির্ধারিত মূল্যে মাল বিক্রয় করা তাদের জন্যে কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এমতাবস্থায় নিজের প্রয়োজনীয় উপার্জন কিংবা জরুরত মেটানোর জন্যে কোনো ব্যক্তি কালোবাজারীতে মাল ক্রয় করলে সে কখনো নৈতিক অপরাধে অপরাধী হতে পারে না। সে যদি এ মাল সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে বিক্রী করে, তবু কোনো অবস্থাতে সে নৈতিকভাবে অপরাধী হয় না। এরূপ কোনো ব্যক্তিকে বন্দী করে যদি দন্ড প্রয়োগ করা হয়, তবে এটা হবে সরকারের অতিরিক্ত আরেকটি যুল্‌ম। প্রসংগক্রমে যেহেতু "মূল্য নিয়ন্ত্রণের" কথা আলোচিত হয়েছে, তাই এখানে আমি সংক্ষেপে এ সম্পর্কিত ইসলামের নীতি বলে দিতে চাই।

---

১. তরজুমানুল কুরআন ঃ জুলাই-অক্টোবর সংখ্যা ১৯৪৪ ইং থেকে সংকলিত।

নবীপাক (সা)-এর যামানায় একবার মদীনায় দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। লোকেরা নবীপাকের নিকট আরয করলো, আপনি মূল্য বেঁধে দিন। জবাবে তিনি বললেন ঃ

"মূল্য বৃদ্ধি এবং কমতির ব্যাপারটা আল্লাহর হাতে (অর্থাৎ খোদায়ী বিধির আধীন)। আর আমি আল্লাহর নিকট এমন অবস্থায় উপস্থিত হতে চাই যে, আমার বিরুদ্ধে যুলম এবং নাইনসাফীর কোনো অভিযোগকারী থাকবে না।

এরপর তিনি তাঁর খুতবায়, কথাবার্তায় এবং লোকের সংগে সাক্ষাতকালে ক্রমাগতভাবে একথা বলতে থাকলেন যে ঃ

اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ -

"বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহকারীরা জীবিকা ও অনুগ্রহ লাভ করে আর মজুতদাররা লাভ করে অভিশাপ।"

তিনি বলেন ঃ

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يُرِيْدُ بِهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ -

"মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে চল্লিশ দিন খাদ্যসামগ্রী মওজুদ রাখে, আল্লাহ তার সাথে এবং সে আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন।।"

بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ اِنْ اَرْخَصَ اللّٰهُ الْاَسْعَارَ حَزِنَ وَاِنْ اَغْلَاهَا فَرِحَ -

"কতইনা নিকৃষ্ট সে ব্যক্তি যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বাজারে সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এবং দাম কমলে বেজার হয় আর দাম বাড়লে খুশী হয়।"

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ -

"কোনো ব্যক্তি চল্লিশ দিন খাদ্যসামগ্রী মওজুত রাখার পর সেগুলো যদি দানও করে দেয় তবু তার এ মজুতদারীর গুনাহের কাফফারা হবে না।"

নবী পাক (সা) এভাবে মজুতদারী ও অবৈধ মুনাফাখোরীর বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচার ও প্রশিক্ষণের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এতে করে ব্যবসায়ীরা নিজেরাই পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং যেসব দ্রব্যসামগ্রী মওজুদ করা হয়েছিলো, তা সব খোলা বাজারে এসে যায়।

সর্বোত্তম নৈতিক গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের এ হচ্ছে কর্মনীতি। এরূপ সরকারের আসল শক্তি পুলিশ, আদালত, মূল্য নিয়ন্ত্রণ কিংবা অর্ডিন্যান্স নয়; বরঞ্চ সে মানব হৃদয়ের কন্দর থেকে খারাবী বের করে দেয়, মানুষের নিয়্যত তথা লক্ষ্য

উদ্দেশ্যকে পরিশুদ্ধ করে দেয়, ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতার পরিবর্তন সাধন করে দেয়, সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি পরিবর্তন করে দেয়। মানুষকে স্বেচ্ছায় সেইসব বিধানের অনুগত বানিয়ে দেয়, যা সঠিক নৈতিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর বিপরীত এসব দুনিয়ার শাসকগোষ্ঠী, যাদের নিজেদের নিয়্যাত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই ভ্রান্ত, যারা নিজেরাই নৈতিকভাবে অধপতিত, শাসন চালানোর জন্যে যাদের নিকট বল প্রয়োগ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো হাতিয়ার নেই, তারা এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হলে বল প্রয়োগ করে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে এবং নৈতিক সংশোধনের প্রক্রিয়া অবলম্বনের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের নৈতিক অধপতনের যেটুকু বাকী আছে সেটুকুও অধপতিত করে ছাড়ে।

(তরজমানুল কুরআন ঃ রযব-শাওয়াল ১৩৬৩ হিঃ, জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ ঈসায়ী)

একাদশ অধ্যায়

অর্থনৈতিক আইনের পুনর্বিন্যাস ও তার মূলনীতি[1]

আমরা স্বীকার করি, যুগের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। দুনিয়ার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় বিরাট বিপ্লব সূচিত হয়েছে। এ বিপ্লব অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের চেহারাই পাল্টে দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে হেজায, ইরাক, সিরিয়া ও মিসরে তদানীন্তন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে ইজতিহাদী আইন প্রণীত হয়েছিল মুসলমানদের বর্তমান প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। ফকীহ্ তথা ইসলামী আইনবিদগণ সে যুগে শরীয়তের বিধানসমূহের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা তাদের চারপাশের দুনিয়ার লেনদেনের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। কিন্তু বর্তমানে সেসব অবস্থার অনেকগুলোই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আবার অনেক নতুন অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে, তখন যেগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এজন্য ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্পর্কিত যেসব আইন আমাদের ফিকাহর প্রাচীন গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে বর্তমানে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে অনেক কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন। কাজেই অর্থনৈতিক লেনদের সম্পর্কিত ইসলামী বিধানের পুনর্বিন্যাস হওয়া উচিত—এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই, বরং মতানৈক্য আছে এ পুনর্বিন্যাসের ধরন সম্পর্কে।

সংস্কারের পূর্বে চিন্তার প্রয়োজন

আমাদের সংস্কারপন্থী চিন্তাবিদগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন আমরা যদি তার অনুসরণ করতে যাই এবং তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী ইসলামী আইনের পুনর্বিন্যাসের কাজ শুরু হয়ে যায়, তাহলে এর ফলে আসলে ইসলামী শরীয়তের বিধানসমূহের পুনর্বিন্যাস হবে না; বরং তার বিকৃতি সাধনই হবে। অন্যকথায় বলা যায়, এর ফলে অর্থনৈতিক জীবনে আমরা ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যাবো। কারণ এরা যে পদ্ধতির দিকে আমাদেরকে এগিয়ে নিতে চাচ্ছেন উদ্দেশ্য, আদর্শ ও মূলনীতির দিক দিয়ে তা ইসলামী পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিছক ধন উপার্জন। অন্যদিকে ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে হালাল খাদ্য আহরণ। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, বৈধ অবৈধ যে কোনো উপায়ে হোক না কেন মানুষকে লাখপতি ও কোটিপতি হতে হবে। কিন্তু

---

১. 'সুদ' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষ লাখ বা কোটিপতি নাইবা হলো, তার যাবতীয় উপার্জন বৈধ পদ্ধতিতে হতে হবে এবং এজন্য অন্যের অধিকার হরণ করাও চলবে না। যারা ধন উপার্জন করেছে, অর্থ উপার্জনের সর্বাধিক উপকরণাদি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এসবের মাধ্যমে আরাম আয়েশ, শক্তি প্রতিপত্তি, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছে তাদেরকেই তারা সফলকাম মনে করে। তাদের এ সাফল্যের মূলে যতই স্বার্থপরতা, যুল্‌ম, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা, প্রতারণা ও নির্লজ্জতা নিহিত থাক না কেন, এজন্য তারা নিজেদের স্বজাতির অধিকার যতই হরণ করুক না কেন এবং নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থের জন্য দুনিয়ায় বিশৃংখলা, বিপর্যয় ও চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টি করে মানবতাকে বস্তুগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সফলকাম হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে সততা, বিশ্বস্ততা ও সদুদ্দেশ্য সহকারে অন্যের অধিকার ও স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষণ করার সাথে সাথে ধন উপার্জনে প্রবৃত্ত হয়। এভাবে ধন উপার্জন করে যদি সে কোটিপতি হয়ে যায় তাহলে তা আল্লাহর দান হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু ধন উপার্জনের এ পথ অবলম্বন করে যদি তাকে সারা জীবন দুমুঠো অন্নের উপরই নির্ভর করতে হয়, তার পরিধানের জন্য তালি দেয়া পোশাক, বসবাসের জন্য একটি ভাঙ্গা কুড়েঘরই কেবল ভাগ্যে জোটে, তাহলেও ইসলামের দৃষ্টিতে সে ব্যর্থ নয়। দৃষ্টিভঙ্গীর এ বিভিন্নতার কারণে তারা ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী নির্ভেজাল পুঁজিবাদের পথে অগ্রসর হয়। এ পথে চলার জন্য তাদের যে ধরনের সুযোগ সুবিধা, অবকাশ ও বৈধতার প্রয়োজন ইসলামে তার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইসলামের নীতি ও বিধানসমূহকে টেনে হিঁচড়ে যতই লম্বা করা হোক না কেন, যে উদ্দেশ্যে এ নীতি ও বিধানসমূহ রচিত হয়নি তা পূর্ণ করার জন্য এ থেকে কোনো কর্মনীতি লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই যে ব্যক্তি এ পথে চলতে চায় তার নিজেকে ও দুনিয়াকে প্রতারিত করার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। তাকে ভালোভাবে একথা বুঝে নিতে হবে যে, পুঁজিবাদের পথে চলার জন্য তাকে ইসলামের পরিবর্তে কেবলমাত্র ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মূলনীতি ও বিধান অনুসরণ করতে হবে।

তবে যারা মুসলমান হিসাবে পরিচিত এবং যারা এ পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, যারা কুরআন ও রাসূলে করীম (সা)-এর পদ্ধতির উপর ঈমান রাখে এবং বাস্তব জীবনে এরই আনুগত্য ও অনুসরণ করা অপরিহার্য মনে করে তাদের একটা নতুন বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে যাতে তারা লাভবান হতে পারে অথবা ইসলামী আইনে তাদের জন্য এমন ধরনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা যার ফলে তারা কোটিপতি ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি বা কারখানা মালিক হতে পারে, এজন্য এ নতুন বিধি ব্যবস্থার প্রয়োজন নয়; বরং আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে নিজেদের কর্মপদ্ধতিকে ইসলামের সঠিক নীতির ভিত্তিতে ঢেলে

সাজানো এবং লেনদেনের যে পদ্ধতি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়, তা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য এর প্রয়োজন। যেখানে অন্যান্য জাতির সাথে লেনদেন করার ক্ষেত্রে তারা যথার্থ অক্ষমতার সম্মুখীন হয় সেখানে ইসলামী শরীয়তের গন্ডীর মধ্যে এ জন্য যেসব 'রুখসাতের' অবকাশ আছে তা থেকে লাভবান হবার জন্য এর প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে অর্থনীতি সংক্রান্ত ইসলামী আইনের পুনর্বিন্যাস নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। এ জাতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো আলেম সমাজের কর্তব্য।

ইসলামী আইনের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন

ইসলামী আইন কোনো স্থবির, অনড় ও গতিহীন আইন নয়। একটি বিশেষ যুগ ও বিশেষ অবস্থার জন্য যে কাঠামোয় এ আইন রচিত হয়েছিল তা চিরকাল অপরিবর্তিত থাকবে এবং স্থান, কাল ও অবস্থার পরিবর্তনের পরও সে কাঠামোয় কোনো প্রকার পরিবর্তন করা যাবে না, ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। যারা একথা মনে করেন তারা ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। বরং আমি বলবো, তারা ইসলামী আইনের প্রাণসত্তা উপলব্ধি করতে অক্ষম। ইসলামে মূলত 'হিকমাত' ও 'আদল' অর্থাৎ প্রজ্ঞা, গভীর বিচারবুদ্ধি, ন্যায়-নিষ্ঠা ও ভারসাম্যের উপর শরীয়তের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। আইন প্রণয়নের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেনকে এমনভাবে সংগঠিত করা যার ফলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সহযোগিতা ও সহানুভূতিপূর্ণ কর্মধারার সৃষ্টি ও বিকাশ সাধিত হয়। তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার যথাযথ ইনসাফ ও ভারসাম্য সহকারে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সমাজ জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী উন্নতি করার পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। এইসাথে সে যেনো অন্যের ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়ক হয় অথবা কমপক্ষে তার উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে, মানব প্রকৃতি ও দ্রব্যগুণ সম্পর্কিত যে জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারোর আয়ত্তাধীন নয় তারই ভিত্তিতে, আল্লাহ মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্য কতিপয় নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল তাঁরই প্রদত্ত সে জ্ঞানের ভিত্তিতে এ নির্দেশগুলো বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের সামনে একটি আদর্শ পেশ করেছেন। এ নির্দেশগুলো একটি বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ যুগে প্রদত্ত হয়েছিল এবং একটি বিশেষ সমাজে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও এগুলোর শব্দাবলী এবং এগুলো কার্যকর করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা থেকে আইনের এমন কতিপয় ব্যাপক ও সর্বব্যাপী নীতি পাওয়া যায়, যা সর্বযুগে ও সর্বাবস্থায় ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতির ভিত্তিতে মানব সমাজকে সংগঠিত করার জন্য সমভাবে কল্যাণকর ও কার্যকর। ইসলামের এ মূলনীতিগুলোই হচ্ছে স্থায়ী অপরিবর্তনীয় ও অসংশোধনযোগ্য। প্রত্যেক

যুগের মুজতাহিদগণের দায়িত্ব হচ্ছে, বাস্তব জীবনের অবস্থা ও ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে শরীয়তের এ মূলনীতি থেকে বিধান বিনির্মাণ করতে থাকা এবং পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সেগুলোকে এমনভাবে প্রবর্তিত করা যার ফলে শরীয়ত প্রণেতার আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। শরীয়তের মূলনীতি থেকে মানুষ যেসব আইন রচনা করেছে সেগুলো ঐ মূলনীতির ন্যায় অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ মূলনীতির প্রণেতা হচ্ছেন আল্লাহ স্বয়ং আর এ আইনগুলো রচনা করেছে মানুষেরা সবাই মিলে। আবার ঐ মূলনীতিগুলো হচ্ছে সর্বকালের, সর্বযুগের ও সর্বাবস্থার জন্যে আর এ আইনগুলো হচ্ছে বিশেষ কালের ও বিশেষ অবস্থার জন্যে।

পুনর্বিন্যাসের জন্য অপরিহার্য শর্তাবলী

কাজেই অবস্থার পরিবর্তন ও ঘটনাবলীর বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে শরীয়তের মূলনীতির আওতাধীনে তার বিধানসমূহের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা এবং যখনই আবশ্যক তা দেখা দেবে সে অনুযায়ী আইন রচনা করার পূর্ণ অবকাশ ইসলামে আছে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক দেশের মুজতাহিদগণকে স্থান কাল ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিধান রচনা ও জীবনক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়াদি নির্ণয় করার পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে। কোনো বিশেষ যুগের আলেমগণকে কিয়ামত অবধি সকল যুগের ও সকল জাতির জন্য আইন প্রণয়নের চার্টার দান করে অন্য সবার অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে—এমনটি ধারণা করার কোনো অবকাশই ইসলামে নেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী যে কোনো বিধান পরিবর্তন করা ও মূলনীতিগুলো ভেঙ্গে বা বিকৃত করে তার উল্টা পাল্টা ব্যাখ্যা দেয়া এবং আইনগুলোকে শরীয়ত প্রণেতার যথার্থ উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে ঠেলে দেয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। বস্তুত পক্ষে ইসলামী আইনের সংস্কার ও সংশোধনের জন্যেও কতিপয় শর্ত সম্বলিত একটি নীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

প্রথম শর্ত

খুঁটিনাটি আইন রচনার জন্য সর্বপ্রথম শরীয়তের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নবী করীম (সা) এর সীরাত সম্পর্কে নিবিষ্ট চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই এ উপলব্ধি ও গভীর জ্ঞান অর্জিত হতে পারে।[২] এ দুটি বিষয়ের উপর যে ব্যক্তির দৃষ্টি ব্যাপক, প্রসারিত ও গভীরতর হবে সে

---

২. এখানে এ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আজকের যুগে ইজতিহাদের দুয়ার বন্ধ হবার আসল কারণ হচ্ছে কুরআন ও রসূল (সা)-এর সীরাত অধ্যয়নের বিষয়সূচী আমাদের দ্বীনী শিক্ষা সিলেবাস থেকে বাদ পড়ে গেছে এবং ফিকাহর কোনো একটি মাযহাবের শিক্ষা সেই স্থানে জুড়ে বসেছে। এ শিক্ষাও এমনভাবে দেয়া হয় যার ফলে প্রথম থেকে আল্লাহ ও রসূল (সা)-এর নির্দেশিত সুস্পষ্ট

হবে শরীয়তের প্রকৃত সচেতন ব্যক্তি। বিভিন্ন সময় তার গভীর জ্ঞান ও উপলব্ধি তাকে এ কথা জানিয়ে দেবে যে, বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য থেকে কোন্ পদ্ধতিটি শরীয়তের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলে তার প্রকৃতিতে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। এ গভীর জ্ঞান সহকারে শরীয়তের বিধানের মধ্যে যে পরিবর্তন করা হবে তা কেবল সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণই হবে না, বরং শরীয়ত প্রণেতার আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তাঁর নিজের নির্দেশের অনুরূপই হবে। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমন, হযরত উমর (রা) এর নির্দেশ, যুদ্ধকালে কোনো মুসলমানের উপর শরীয়তের দন্ডবিধি জারী করা যাবে না এবং এ প্রসঙ্গে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস কর্তৃক মদ্যপান করার জন্য আবু মেহজান সাকাফীকে ক্ষমা করে দেয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। হযরত ওমর (রা)-এর এ সিদ্ধান্তও উল্লেখযোগ্য যে, দুর্ভিক্ষের সময় কোনো চোরের হাত কাটা যাবে না। এ বিষয়গুলো আপাত দৃষ্টিতে শরীয়ত প্রণেতার সুস্পষ্ট বিধানের পরিপন্থী মনে হলেও শরীয়তের প্রকৃতি সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, এসব বিশেষ অবস্থায় সাধারণ নির্দেশের কার্যকারিতা মুলতবী রাখা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের যথার্থই অনুকূল। হাতিব ইবনে আবী বাল্‌তাআর গোলামদের ঘটনাও এই একই শ্রেণীভুক্ত। মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর নিকট অভিযোগ করেন যে, হাতিবের গোলামরা তার উট চুরি করেছে। হযরত উমর (রা) প্রথমে তাদের হাত কাটার হুকুম দেন; কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন এবং বলেন, তুমি ঐ গরীবদেরকে খাটিয়ে নিয়েছো। কিন্তু তাদেরকে অনাহারে শুকিয়ে মেরেছো এবং তাদেরকে এমন অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিয়েছো যার ফলে তারা যদি কোনো হারাম বস্তু খেয়ে ফেলে তাও তাদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে। একথা বলে তিনি ঐ গোলামদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের মালিকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে উটওয়ালাকে দান করেন। অনুরূপভাবে তিনি তালাকের ব্যাপারেও হযরত উমর (রা) যে নির্দেশ দেন তাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগের কার্যধারা থেকে ভিন্ন ছিল। কিন্তু যেহেতু শরীয়তের প্রকৃতি অনুধাবন করার পর শরীয়তের বিধানের মধ্যে এসব পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল, তাই এগুলোকে কেউ অসঙ্গত বলতে পারেন না। বিপরীতপক্ষে, এই উপলব্ধি ও গভীর জ্ঞান ছাড়াই যে পরিবর্তন করা হয় তা শরীয়তের প্রকৃতিতে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে এবং এর ফলে বিপর্যয় দেখা দেয়।

বিধান ও মুজতাহিদগণের ইজতিহাদের মধ্যে যথার্থ পার্থক্য ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা হয় না। অথচ কোনো ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে কুরআনের গভীর জ্ঞান অর্জনে সক্ষম না হলে এবং রাসূলুল্লাহর (সা)-কর্মপদ্ধতি ও কর্মনীতিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন না করলে ইসলামের অন্তঃপ্রকৃতি ও ইসলামী আইনের মূলনীতি অনুধাবনে সক্ষম হতে পারে না। এটি ইজতিহাদের জন্য অপরিহার্য এবং সারা জীবন ফিকাহর কিতাব পড়লেও এ বস্তুটি অর্জিত হতে পারে না।

দ্বিতীয় শর্ত

শরীয়তের প্রকৃতি অনুধাবন করার পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, জীবনের যে বিভাগে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয় সে বিভাগ সম্পর্কিত শরীয়ত প্রণেতার যাবতীয় বিধান দৃষ্টি সমক্ষে রাখতে হবে এবং সে সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে একথা জানতে হবে যে, শরীয়ত প্রণেতা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) এ বিভাগটিকে কিভাবে সংগঠিত করতে চান, ইসলামী জীবনের ব্যাপকতর পরিকল্পনায় এ বিশেষ বিভাগটির স্থান কোথায় এবং এ স্থানের প্রেক্ষিতে শরীয়ত প্রণেতা এ বিভাগে কি কার্যকর নীতি অবলম্বন করেছেন, এ বিষয়টি অনুধাবন না করে যে আইন প্রণীত হবে অথবা পূর্ববর্তী আইনে যে পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধন করা হবে তা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিশীল হবে না এবং এর ফলে আইনের গতিধারা কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে।

ইসলামী আইনে কোনো বিধানের বাইরের আবরণের ততটা গুরুত্ব নেই যতটা গুরুত্ব আছে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের। ফকীহ ও ইসলামী আইনবিদের প্রধান কাজই হচ্ছে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য এবং তাঁর বিধানের অন্তর্নিহিত গভীর জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি রাখা, এমন অনেক বিশেষ ক্ষেত্র আছে যেখানে বিধানের বহিরঙ্গকে (সাধারণ অবস্থাকে সামনে রেখে যা প্রণীত হয়েছিল) কার্যকর করতে গেলে তার আসল উদ্দেশ্যই খতম হয়ে যায়। এহেন অবস্থায় বহিরঙ্গকে বাদ দিয়ে এমনভাবে তাকে কার্যকর করতে হবে যাতে শরীয়ত প্রণেতার আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। কুরআন মজীদে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি যালেম ও নিপীড়ক শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডা বুলন্দ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ শরীয়ত প্রণেতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপর্যয় ও বিশৃংখলাকে সংশোধন করা ও সুকৃতিতে বদলে দেয়া। যখন কোনো কাজে আরো অধিক বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হবার আশংকা থাকে এবং সংশোধনের কোনো আশাই না থাকে তখন তা থেকে সরে আসই উত্তম। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার জীবনেতিহাসে দেখা যায়, তাতারী ফিতনার যুগে তিনি একটি স্থান অতিক্রম করার সময় দেখেন তাতারীদের একটি দল মদ্যপানে মত্ত। ইমামের সাথীরা তাদেরকে মদ্যপান থেকে বিরত রাখতে চাইলেন। কিন্তু ইমাম তাদেরকে বাধা দিয়ে বললেন, ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় বিশৃংখলার পথ রোধ করার জন্য আল্লাহ মদ হারাম করেছেন; কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে মদ এ যালেমদেরকে একটি বড় ফিত্না অর্থাৎ নরহত্যা ও সম্পদ লুণ্ঠন থেকে বিরত রেখেছে। কাজেই এ অবস্থায় তাদেরকে মদ্যপানে বিরত রাখার চেষ্টা করা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এ থেকে জানা যায়, অবস্থা ও ঘটনাবলীর বিশেষত্বের কারণে শরীয়তের বিধানের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে। কিন্তু পরিবর্তন এমন হতে হবে যার ফলে শরীয়ত প্রণেতার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়ে যেন তা সফল হয়।

অনুরূপভাবে কোনো কোনো বিধান বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশেষ শব্দাবলীর মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল। অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও ঐ বিশেষ শব্দাবলীর মধ্যে আটকে থাকা কোনো ফকীহর কাজ নয়। বরং তাঁকে ঐ শব্দগুলোর মধ্যে নিহিত শরীয়ত প্রণেতার আসল উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে হবে এবং ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথোপযোগী বিধান রচনা করতে হবে। যেমন সাদকায়ে ফিত্‌র হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা) এক সা' খেজুর বা এক সা' যব অথবা এক সা' কিসমিস দেয়ার হুকুম দিয়েছিলেন। এর অর্থ এ নয় যে, সেকালে মদীনায় যে সা'-এর প্রচলন ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যে শস্যদ্রব্যগুলোর কথা বলেছেন হুবহু এগুলোই এখানে উদ্দেশ্য। শরীয়ত প্রণেতার আসল উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু যে, ঈদের দিন প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে এতখানি সাদ্‌কা দিতে হবে যার ফলে তার একজন অভাবী ভাই কমপক্ষে তার ঈদের সময়টা সানন্দে অতিবাহিত করতে পারে। শরীয়ত প্রণেতার নির্ধারিত পদ্ধতির নিকটবর্তী অন্য কোনো পদ্ধতিতেও এ উদ্দেশ্যটি পূর্ণ করা যেতে পারে।

তৃতীয় শর্ত

এইসাথে শরীয়ত প্রণেতার আইন প্রণয়ন নীতিও যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হবে। এভাবে স্থান কালের চাহিদা অনুযায়ী বিধান প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে তাঁর নির্ধারিত নীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ করা সম্ভবপর হবে। এটা ততোক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতোক্ষণ না সামগ্রিকভাবে শরীয়তের কাঠামো এবং এককভাবে তার প্রত্যেকটি বিধানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা হবে। শরীয়ত প্রণেতা কিভাবে বিধানসমূহের মধ্যে ভারসাম্য ও ন্যায়নীতি কায়েম করেছেন, কিভাবে তিনি মানব প্রকৃতির দুর্বলতার জন্য তাকে সুবিধা দান করেছেন, বিপর্যয় ও বিশৃংখলা রোধ করা এবং সুকৃতির পথ উন্মুক্ত করার জন্য তিনি কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, কিভাবে তিনি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেনের সংগঠন এবং তাদের মধ্যে সুব্যবস্থা কায়েম করতে চান, কোন্‌ পদ্ধতিতে তিনি মানুষকে তার উন্নততর উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যান এবং এইসাথে তার প্রাকৃতিক দুর্বলতাগুলো সামনে রেখে যথাযথ সুযোগ-সুবিধা দান করে তার পথকে সহজতর করেন—এসব বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এজন্য কুরআনের আয়াতের শাব্দিক ও অর্থগত প্রতিপাদ্য এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা ও কর্মের গভীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি এ ধরনের বিদ্যাবত্তা ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হন তিনি স্থান-কাল অনুযায়ী শরীয়তের বিধানসমূহের মধ্যে আংশিক পরিবর্তনও করতে পারেন এবং যেসব বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই সেসব বিষয়ে নতুন বিধানও রচনা করতে পারেন। কারণ এহেন ব্যক্তি ইজতিহাদের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করবেন তা ইসলামের আইন প্রণয়ন নীতি থেকে বিচ্যুত হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কুরআন মজীদে কেবল

আহলে কিতাবদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করার নির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু সাহাবাগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে এ নির্দেশটিকে আজমের অগ্নিপূজারী, হিন্দুস্তানের পৌত্তলিক ও আফ্রিকার বারবার অধিবাসীদের মধ্যেও বিস্তৃত করেন। অনুরূপভাবে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বিভিন্ন দেশ বিজিত হবার পর অন্যান্য জাতির সাথে এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটে যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহয় কোনো সুস্পষ্ট বিধান ছিল না। সাহাবাগণ নিজেরাই সেসব ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করেন। ইসলামী শরীয়তের প্রাণসত্তা ও তার মূলনীতির সাথে সেগুলো পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল ছিল।

চতুর্থ শর্ত

অবস্থা ও ঘটনাবলীর যে পরিবর্তন শরীয়তের বিধানের মধ্যে পরিবর্তন অথবা নতুন বিধান প্রণয়নের দাবি করে তাকে দুটো পর্যায়ে যাচাই করা প্রয়োজন। এক. ঐ ঘটনাগুলো কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাদের বৈশিষ্ট্য কি এবং তাদের মধ্যে কোন্ ধরনের শক্তি কাজ করছে। দুই. ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে কোন্ ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি পরিবর্তন শরীয়তের বিধানের মধ্যে কোন্ ধরনের পরিবর্তনের প্রত্যাশী।

দৃষ্টান্ত হিসেবে আমাদের আলোচ্য সুদের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। আধুনিক ইসলামী অর্থনৈতিক বিধান রচনার জন্যে আমাদেরকে সর্বপ্রথম বর্তমান অর্থনৈতিক জগতের পর্যালোচনা করতে হবে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আমাদেরকে অধ্যয়ন করতে হবে অর্থনীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও লেনদেনের আধুনিক পদ্ধতিগুলো। অর্থনৈতিক জীবনের অভ্যন্তরে যেসব শক্তি কর্মতৎপর সেগুলো অনুধাবন করতে হবে। তাদের আদর্শ ও মূলনীতির সাথে পরিচিত হতে হবে এবং যেসব বাস্তব আকৃতির মধ্যে ঐসব আদর্শ ও মূলনীতির প্রকাশ ঘটবে সেগুলো সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। অতঃপর আমাদেরকে দেখতে হবে পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় ঐসব ব্যাপারে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে তাদেরকে কোন্ কোন্ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর উপর শরীয়তের প্রকৃতি, তার উদ্দেশ্যাবলী ও আইন প্রণয়ন নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে কোন্ ধরনের বিধান প্রচলিত হওয়া উচিত।

খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বাদ দিয়েও এই পরিবর্তনগুলোকে আমরা নীতিগতভাবে মোটামুটি দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি।

এক ঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে যেসব পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যে পরিবর্তনগুলো আসলে মানুষের তাত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও অগ্রগতি, আল্লাহর গোপন ধনভান্ডারের ব্যাপক আবিষ্কার, বস্তুগত উপকরণাদির উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি, উৎপাদন উপকরণের পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপক বিস্তৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এ ধরনের

পরিবর্তন হচ্ছে স্বাভাবিক ও যথার্থ। এ পরিবর্তনের বিলুপ্তি সম্ভব নয় এবং এ বিলুপ্তি কাঙ্খিতও নয়। রবং এক্ষেত্রে প্রয়োজন শুধু এতটুকু যে, এ পরিবর্তনের প্রভাবে অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিষয়াবলী এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের যে নতুন নতুন চেহারা দেখা দিয়েছে তাদের জন্য শরীয়তের মূলনীতির ভিত্তিতে নবতর বিধান রচনা করা। এভাবে পরিবর্তিত অবস্থায় মুসলমানরা যথার্থ ইসলামী পদ্ধতিতে নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।

দুই ঃ এমন অনেক পরিবর্তন আছে যা আসলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির স্বাভাবিক ফল নয়, বরং বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়াবলীতে যালেম পুঁজিপতিদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ফলে উদ্ভূত। জাহেলী যুগে যে যুল্‌ম ভিত্তিক পুঁজিবাদের প্রসার ছিল[৩] এবং শত শত বছর ধরে ইসলাম যাকে মাথা তুলতে দেয়নি তাই আজ পুনর্বার অর্থনৈতিক জগতের উপরে প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নততর উপকরণাদির সহায়তায় নিজের পুরাতন মতাদর্শকে নতুন আদলে অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছে। পুঁজিবাদের এ প্রতিপত্তির কারণে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে, সেগুলো আসল ও স্বাভাবিক পরিবর্তন নয় বরং সেগুলো হচ্ছে কৃত্রিম পরিবর্তন। শক্তি প্রয়োগ করে সেগুলোকে খতম করা যেতে পারে এবং মানবজাতির কল্যাণার্থে সেগুলো খতম করা একান্ত অপরিহার্য। সেগুলো নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা এবং ইসলামী নীতির ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা মুসলমানের প্রধান কর্তব্য। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দায়িত্ব একজন কমিউনিস্টের তুলনায় মুসলমানের উপর অধিক পরিমাণে বর্তায়। কমিউনিস্টের সম্মুখে আছে নিছক রুটির প্রশ্ন। কিন্তু মুসলমানের নিকট প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে দীন—জীবন বিধান ও নৈতিকতার; কমিউনিস্ট নিছক প্রলেতারিয়েতের জন্য সংগ্রাম করতে চায়, কিন্তু মুসলমান পুঁজিপতি সহ সমগ্র মানব জাতির যথার্থ কল্যাণার্থে সংগ্রাম করে। কমিউনিস্টের সংগ্রামের ভিত্তি হচ্ছে স্বার্থ-চিন্তা। আর মুসলমানের সংগ্রাম হয় আল্লাহর জন্যে। কাজেই আধুনিক যুল্‌ম ভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে মুসলমান কোনোদিন আপোষ করতে পারে না। ইসলামের পূর্ণ অনুসারী প্রকৃত ও যথার্থ মুসলমান এই যুল্‌মপূর্ণ ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন করার জন্য হামেশা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে সম্ভাব্য সকল প্রকার

---

৩. এখানে পুঁজিবাদ শব্দটিকে আমরা সীমিত অর্থে ব্যবহার করিনি, যেমন আজকাল পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। বরং যথার্থ পুঁজিবাদের মধ্যেই যে ব্যাপক অর্থ লুকিয়ে রয়েছে সে অর্থে আমরা একে ব্যবহার করেছি। পারিভাষিক পুঁজিবাদ ইউরোপের শিল্প বিপ্লব থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আসলে পুঁজিবাদ একটি অতি প্রাচীন বস্তু। যখন থেকে মানুষ নিজের সমাজ-সভ্যতা সংস্কৃতির নেতৃত্ব শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছে তখন থেকেই এই পুঁজিবাদ বিভিন্ন আকারে প্রতিপত্তি বিস্তার করে আসছে।

ক্ষতির পূরুষোচিত মোকবিলা করবে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব। অর্থনৈতিক জীবনের এ বিভাগে ইসলাম যে আইন প্রণয়ন করবে তার উদ্দেশ্য মুসলমানের জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া নয়। তার বিভিন্ন সংস্থায় অংশগ্রহণ করা ও তার সাফল্যের উপকরণাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দেয়া নয়, বরং তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে যুল্মভিত্তিক ও অবৈধ পুঁজিবাদের পরিপোষণকারী দুর্গন্ধময় আবর্জনা থেকে মুসলমান তথা বিশ্ব মানবতাকে সংরক্ষিত রাখা।

কঠোরতা হ্রাসের সাধারণ নীতি

অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শরীয়তের বিভিন্ন বিধানের কঠোরতাকে নরম করার যথেষ্ট অবকাশ ইসলামী আইনে রাখা হয়েছে। এজন্য ফিকাহর একটি অন্যতম নীতি হচ্ছে। اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ - এবং اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ -
(অর্থাৎ 'প্রয়োজন অনেক অবৈধ বস্তুকে বৈধ বানিয়ে দেয়' এবং 'যেখানে শরীয়তের কোনো নির্দেশ কার্যকর করা কঠিন হয় সেখানে কঠোরতা হ্রাস করা হয়'।) কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে শরীয়তের এই নীতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا - (البقرة : ٢٨٦)

আল্লাহ কাউকে তার শক্তি-সামর্থ্যের বেশী কষ্ট দেন না। [আল বাকারা ঃ ২৮৬]

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ - (البقرة : ١٨٥)

আল্লাহ তোমাদের কাজকে সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না।

[আল বাকারা ঃ ১৮৫]

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۔ (الحج : ٧٨)

তিনি তোমাদের উপর দীনের ব্যাপারে কোনো কড়াকড়ি করেননি। -আল-হাজ্জ ঃ ৭৮

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى الْحَنِفِيَّةُ السَّمْحَةُ وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِى الْاِسْلَامِ -

'সাদাসিধে ও নরম দীনই হচ্ছে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়; ইসলামে কোনো ক্ষতি ও ক্ষতিকারক নেই।'

কাজেই ইসলামে এ নীতি স্বীকৃতি লাভ করেছে যে শরীয়তের বিধানে কোথাও কষ্ট ও ক্ষতি দেখা গেলে সেখানে বিধানটি নরম ও সহজ করে দিতে হবে। এর অর্থ

প্রত্যেকটি কল্পিত প্রয়োজনে শরীয়তের বিধান ও খোদার নির্দেশিত সীমানাকে শিকেয় তুলে রাখা নয়, শরীয়তের কঠোরতা হ্রাসের নীতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে সহজেই বুঝা যায় যে, এজন্য কতিপয় নীতি-নিয়ম রয়েছে।

এক ঃ দেখতে হবে কষ্টটি কোন্ পর্যায়ের। প্রতিটি সাধারণ কষ্টের জন্যে শরীয়ত আরোপিত দায়িত্ব খতম করা যেতে পারে না। এভাবে চলতে থাকলে আর কোনো আইনই বাকী থাকবে না। শীতে অযু করার কষ্ট, গরমে রোযা রাখার কষ্ট, সফরে হজ্জ ও জিহাদ করার কষ্ট। এ সমস্ত কষ্ট নিঃসন্দেহে কষ্টের শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু এগুলো এমন কোনো কষ্ট নয় যার জন্যে শরীয়ত আরোপিত দায়িত্বগুলো খতম করে দিতে হবে। আইনের কঠোরতা হ্রাস বা আইনটির প্রয়োগ রহিত হবার জন্যে অন্তত কষ্টটি ক্ষতিকারক পর্যায়ের হতে হবে। যেমন সফরের অনিবার্য সংকট, রোগের কষ্টকর অবস্থা, কোনো যালেমের নির্যাতন ও নিষ্পেষণ, চরম অভাব-অনটন, কোনো অস্বাভাবিক বিপদ, সাধারণ বিপর্যয় অথবা কোনো শারীরিক ত্রুটি। এ ধরনের বিশেষ অবস্থায় শরীয়ত তার বহুতর বিধানের কঠোরতা হ্রাস করেছে এবং এগুলোর উপর অন্যান্য কঠোরতা হ্রাসের বিষয়গুলোও কিয়াস করা যেতে পারে।

দুই ঃ কষ্ট ও অক্ষমতা যে পর্যায়ভুক্ত হয় কঠোরতা হ্রাসও ঐ একই পর্যায়ভুক্ত হতে হবে। যেমন, যে ব্যক্তি রুগ্নাবস্থায় বসে নামায পড়তে পারে তার জন্য শুয়ে শুয়ে নামায পড়া জায়েয নয়। যে রোগের কারণে রমযানের দশটি রোযা কাযা করা যথেষ্ট তার জন্য সারা রমযান মাস রোযা না রেখে খেয়ে দেয়ে কাটিয়ে দেয়া নাজায়েয। এক ঢোক মদ্যপান বা এক-দুই লোকমা হারাম খেয়ে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হলে এই যথার্থ প্রয়োজনের চেয়ে বেশী পান বা আহার করার অধিকার নেই। অনুরূপভাবে শরীরের গুপ্ত অংশের মধ্য থেকে যতটুকু ডাক্তারের নিকট উন্মুক্ত করা একান্ত অপরিহার্য তার অধিক উন্মুক্ত করার অধিকার কোনো ব্যক্তির নেই। এ নীতির ভিত্তিতে কষ্ট ও প্রয়োজনের পরিমাণ অনুযায়ী সকল প্রকার কঠোরতা হ্রাসের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।

তিন ঃ কোনো ক্ষতিকারক বস্তু বা বিষয় দূর করার জন্যে এমন কোনো উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে না যা সম পরিমাণ বা অধিক ক্ষতিকারক। বরং এক্ষেত্রে কেবল এমনসব উপায় অবলম্বনের অনুমতি দেয়া যেতে পারে যেগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। এর কাছাকাছি আর একটা নীতি হচ্ছে এই যে, কোনো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয় থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তার চেয়ে বড় একটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়ে জড়িয়ে পড়া জায়েয নয়। তবে দুটো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়ের মুখোমুখি হয়ে যখন কোনো একটির সাথে জড়িয়ে পড়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে, এক্ষেত্রে বড় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়টিকে খতম করার জন্যে ছোট বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়টি গ্রহণ করা জায়েয।

চার ঃ সৎকাজ করার চেয়ে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ নির্মূল করে দেয়া অগ্রাধিকার

লাভ করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে সৎকাজের নীতি মেনে চলা এবং ফরয ও ওয়াজিব কাজসমূহ সম্পাদন করার তুলনায় অসৎ বৃত্তিসমূহ দূর করা এবং হারাম থেকে আত্মরক্ষা করা ও বিপর্যয় বিশৃংখলা দূর করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য কষ্টের সময় শরীয়ত যে পরিমাণ ঔদার্য সহকারে ফরযগুলোর কঠোরতা হ্রাস করে অনুরূপ ঔদার্য সহকারে নিষিদ্ধ কাজগুলোর অনুমতি দেয় না। সফর ও পীড়িত অবস্থায় নামায, রোযা ও অন্যান্য ওয়াজিব কাজ সমূহের কঠোরতা যে পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছে, নাপাক ও হারাম বস্তুগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুরূপ কঠোরতা হ্রাস করা হয়নি।

কষ্ট ও ক্ষতির আপনোদনের সাথে সাথেই কঠোরতা হ্রাসের নীতিও রহিত হয়ে যায়। যেমন, রোগ নিরাময়ের পর তায়াম্মুমের অনুমতি খতম হয়ে যায়।

সুদের ক্ষেত্রে কঠোরতা হ্রাসের কতিপয় অবস্থা

উপরে বর্ণিত নীতিগুলো সামনে রেখে চিন্তা করুন, বর্তমান অবস্থায় সুদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধানসমূহের মধ্যে কি পরিমাণ কঠোরতা হ্রাস করা যেতে পারে।

এক ঃ সুদ দেয়া ও সুদ নেয়া দুটো একই ধরনের অবস্থা বা কাজ নয়। অনেক সময় মানুষ সুদী ঋণ নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সুদ খেতে বাধ্য হওয়ার কোনো যথার্থ কারণ থাকতে পারে না। ধনী ব্যক্তিই সুদ নিয়ে থাকে, অথচ সে এমন কি অক্ষমতার সম্মুখীন হয় যার ফলে তার জন্য হারাম হালালে পরিণত হয়?

দুই ঃ সুদীঋণ নেয়ার জন্য প্রত্যেকটি প্রয়োজনকেই অক্ষমতার অওতাভুক্ত করা যায় না। বিয়ে-শাদী ও সুখ-দুঃখের অনুষ্ঠানে অযথা অর্থ ব্যয় করা কোনো যথার্থ প্রয়োজনের তাকীদ নয়। গাড়ী কেনা বা পাকা বাড়ী তৈরী করা কোনো যথার্থ অক্ষমতার অবস্থা সৃষ্টি করে না। বিলাসদ্রব্য সংগ্রহ করা বা ব্যবসায়িক উন্নতির জন্য অর্থ সংগ্রহ করা কোনো প্রয়োজনীয় কাজ নয়। এসব কাজ এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন কাজকে 'প্রয়োজন' ও 'অক্ষমতা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এসব কাজের জন্যে পুঁজিপতিদের নিকট থেকে হাজার হাজার লাখো লাখো টাকা ঋণ নেয়া হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ প্রয়োজন ও অক্ষমতাগুলোর কানাকড়িও গুরুত্ব নেই এবং এসব উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যে যারা সুদ দেয় তারা মারাত্মক গুনাহগার। যে ধরনের অক্ষমতায় হারামও হালালে পরিণত হয়, একমাত্র সে ধরনের অক্ষমতার ক্ষেত্রে শরীয়ত সুদী ঋণ নেয়ার অনুমতি দিতে পারে। অর্থাৎ এমন কোনো কঠিন বিপদ, যেক্ষেত্রে সুদীঋণ নেয়া ছাড়া উপায় নেই। যেমন, প্রাণ ও মান-সম্মান বিপদের সম্মুখীন হওয়া অথবা কোনো অসহনীয় কষ্ট বা ক্ষতির যথার্থ আশংকা দেখা দেয়া। এ অবস্থায় একজন অক্ষম ও নাচার মুসলমানের জন্য সুদীঋণ নেয়া জায়েয বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এ অবস্থায় যেসব সচ্ছল ও সামর্থবান মুসলমান তাদের এক ভাইয়ের এহেন বিপদের দিন সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি এবং এর ফলে সে একটি হারাম কাজ করতে বাধ্য হয়েছে, তারা সবাই গুনাহগার

হবে। বরং আমি বলবো, এক্ষেত্রে সমগ্র মুসলমান সমাজই গুনাহগার হবে। কারণ এ সমাজ যাকাত, সাদ্কা ও আওকাফের সম্পত্তির যথার্থ সংগঠন করার ক্ষেত্রে অবহেলা ও গাফলতি দেখিয়েছে, যার ফলে তার সদস্যবর্গ অসহায় হয়ে পড়েছে এবং নিজেদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের কাছে হাতপাতা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকেনি।

তিন ঃ চরম অপারগ অবস্থায় কেবল প্রয়োজন অনুযায়ী সুদীঋণ নেয়া যেতে পারে এবং তাও সামর্থ্য ও সক্ষমতা ফিরে আসার সাথে সাথেই প্রথম সুযোগেই তা পরিশোধ করে দিতে হবে। কারণ প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে সক্ষমতা ফিরে আসার পর এক পয়সা সুদ আদায় করাও হারাম। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রয়োজন অপরিহার্য কিনা আর অপরিহার্য হলে তা কোন্ পর্যায়ভুক্ত এবং কখন সক্ষমতা ফিরে এসেছে—এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব অক্ষম অবস্থায় নিপতিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বুদ্ধি-জ্ঞান ও দীনী অনুভূতির উপর ছেড়ে দেয়া হবে। সে যতোবেশী দীনদার ও খোদাভীরু হবে এবং তার ঈমান যতোবেশী শক্তিশালী হবে ততোবেশী সে এ ব্যাপারে সতর্ক ও সংযমী হবে।

চার ঃ যারা ব্যবসায়িক অক্ষমতা বা নিজের সম্পদ সংরক্ষণ অথবা বর্তমান জাতীয় নৈরাজ্যের কারণে নিজের ভবিষ্যত নিশ্চিন্ততা ও নিশ্চয়তার জন্যে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখে বা ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে বীমা করায় অথবা কোনো নিয়মের আওতাধীনে প্রভিডেন্ড ফান্ডে অংশগ্রহণ করে, তাদের অবশ্যি কেবলমাত্র নিজের আসল পুঁজি বা মূলধনকেই নিজের সম্পদ মনে করতে হবে এবং এ মূলধন থেকে বছরে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। কারণ এভাবে যাকাত না দিলে সঞ্চিত অর্থ তাদের জন্যে অপবিত্র হয়ে যাবে; তবে এজন্য শর্ত হচ্ছে, তাদের খোদাপরস্ত হতে হবে, অর্থ-পূজারী হলে চলবে না।

পাঁচ ঃ ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স কোম্পানী বা প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে তাদের খাতে যে সুদ জমা হয় তা পুঁজিপতিদের হাতে তুল দেয়া জায়েয নয়। কারণ এগুলো ঐ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের হাতকে আরো শক্তিশালী করবে। এজন্য এক্ষেত্রে সঠিক পথ হচ্ছে, যেসব দারিদ্রপীড়িত ও অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিদের দুরবস্থা তাদের জন্যে হারাম খাওয়া জায়েয করে দিয়েছে, সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থগুলো তাদের মধ্যে বন্টন করা উচিত।[৪]

ছয় ঃ অর্থনৈতিক লেনদেন ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেসব মুনাফা সুদের আওতাভুক্ত হয় অথবা যেগুলোর সুদ হবার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, সেগুলোকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলা সম্ভব না হলে এক্ষেত্রে আমাদের পাঁচ নম্বরে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। এসব ব্যাপারে একজন ঈমানদার মুসলমানের দৃষ্টি থাকতে হবে মুনাফা অর্জনের পরিবর্তে

---

৪. আমার এ প্রস্তাবটির যথার্থতা বিচারের আর একটি মাপকাঠি হচ্ছে এই যে, মূলত সুদ আসে গরীবদের পকেট থেকে। সরকারী ট্রেজারী, ব্যাংক বা ইনস্যুরেন্স কোম্পানী সবখানেই সুদের মূল উৎস হচ্ছে গরীবের পকেট।

ক্ষতি ও বিপর্যয় দূরীকরণের প্রতি। যদি সে আল্লাহকে ভয় করে ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তাহলে ব্যবসায়ে উন্নতি ও আর্থিক মুনাফা অর্জনের চেয়ে হারাম থেকে দূরে থাকা ও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি থেকে নিষ্কৃতি লাভের চিন্তাই তার নিকট অধিকতর প্রিয় হওয়া উচিত।

কেবলমাত্র ব্যক্তির জন্যে এ কঠোরতা হ্রাসের অবকাশ রয়েছে। তবে এ নিয়ম জাতির জন্যেও প্রযোজ্য হতে পারে, যদি সমগ্র জাতি অন্যের অধীনতা শৃংখলে আবদ্ধ থাকার দরুন নিজের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষমতা না রাখে। কিন্তু কোনো স্বাধীন-স্বতন্ত্র মুসলমান গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা জাতি, নিজের সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা যার করতলগত, সে সুদের ব্যাপারে নিজের জন্যে এ কঠোরতা হ্রাসের দাবি করতে পারে না, যতোক্ষণ না একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, সুদ ছাড়া অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ব্যবসা, শিল্প কোনো কিছুই চলতে পারে না এবং এর কোনো বিকল্পও নেই। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যদি একথার ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়ে থাকে এবং বাস্তবে একটি সুদবিহীন অর্থ-ব্যবস্থা সাফল্যের সাথে রচনা ও পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে এরপরও পশ্চিমী পুঁজিবাদের নিকট ঘনিষ্ঠ আত্মনিবেদন এবং তাকে কার্যকর করার জন্যে নিজেদের সকল শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করতে থাকা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমাপ্ত